প্রাকৃতিক

প্রভাস ভদ্র

প্রাকৃতিক

প্রভাস ভদ্র

সুবর্ণরেখা
৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

শুভার্থী

সদানন্দ পালকে

সূচি

লেখকের আরও অসংখ্য গল্প

যে সকল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে

গল্প

গল্পদশক

সমকালের গল্প

সময়ের কণ্ঠস্বর

স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

সিম্ফনী

নীল নীলা

অন্তত একজন

প্রভাস ভদ্র-র গল্প-চল্লিশ

প্রকৃতি পরিচয়

সামনে ভরা-যৌবন দামোদর নদী। পিছনে অরণ্যময় পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ছোট আঁচিলের মত বাংলোটা। যতদূর দৃষ্টি যায়, সাজানো দাবার ঘুঁটির মত ছোট ছোট অরণ্য দ্বীপ ইতস্তত। দামোদরের লালচে জল। এখান থেকে পাকা সড়ক অনেক দূরে। দিনে তিন চারখানা দূরপাল্লার বাস যাতায়াত করে। স্টপেজ নেই; কিন্তু হাত তুললে দাঁড়ায়। বেশ খানিকটা পথ চড়াই উতরাই করে তবে এখানে পৌঁছানো যায়। ধারে কাছে জনবসতি নেই। জনমানবহীন নির্জন নিস্তব্ধতা সর্বক্ষণ ছেয়ে থাকে।

হঠাৎ দোলার চিঠি পেয়ে স্টেশনে গিয়েছিল রাজীব। এখানে আসতে গেলে রেলপথই কাছে। দোলাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছে। ফরেস্ট বিভাগের গাড়ির ব্যবস্থা করে। গাড়ি থেকে নেমেই রাজীব জিগ্যেস করল, 'কেমন লাগছে দোলা—জায়গাটা?'

'দারুণ'। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল দোলা, 'স্বপ্নের মত সুন্দর। কিন্তু, কেমন যেন গা ছমছম করছে। তোমার ভয় করে না রাজু?'

'কীসের ভয়। কাছেই নিচে পাহাড়ের ঢালে কুঠিতে চারজন ফরেস্ট গার্ড থাকে। মালী আছে একজন। তাছাড়া পিওন রঘুনন্দন তো ছায়ার মত সর্বক্ষণ সঙ্গেই আছে। ঘরণীর মত ঘরের সব কাজকর্ম করে দেয় আমাকে।'

'তবু নিশ্চয়ই তোমার কষ্ট হয়।'

'কষ্ট বলতে একটাই।'

'কী সেটা?'

'তোমাকে ছেড়ে একা এভাবে এতদূরে থাকা। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগে। প্রকৃতি পরিবেশই বোধহয় দায়ী সেজন্যে।'

'তাইতো হঠাৎ চলে এলাম তোমার কাছে। কষ্টটা বুঝতে পারি বলে। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, বেশি বাড়াবাড়ি চলবে না কোনমতে।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে?'

'অবিশ্বাস করলে একা আসতাম এভাবে?'

কোন উত্তর খুঁজে পেল না রাজীব। সত্যিই তো তাই। ভালবাসায় কীই না হয়। ভীষণ বেপরোয়া সাহসী করে তোলে।

'কী বলে বেরিয়েছো হস্টেল থেকে?' রাজীব জিগ্যেস করল।

'বাড়ি যাচ্ছি।'

'তুমি আমার চেয়েও সাহসী। বেশি ভালবাসো বলে।'

দোলাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলোর দিকে পা বাড়ালো। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলো ওপরে। পেলমেট পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল। বেডরুম বৈঠকখানা অফিস ঘর দেখাল। উঁকি দিয়ে বাথরুম ব্যবস্থা দেখল দোলা। জলের ব্যবস্থা পরখ করল সবার আগে। রঘুনন্দন ছোট ভি আই পি অ্যাটাচিটা এনে রাখল। কাচের জানলাগুলো খুলে দিল। ভারি পর্দাগুলো সরিয়ে দিল একে একে। জিগ্যেস করল,

'দুপুরে কী খাবেন দিদিমণি?'

'তোমার যা মন চায় রেঁধে খাওয়াও।' জানলা দিয়ে নরম আলো বাতাস আসছিল। বুক

ভরে বাতাস নিয়ে এক ঝলক হাসি ছড়ালো দোলা। বলল, 'দারুণ এক কাপ চা খাওয়াও তো আগে। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।'
রঘুনন্দন চলে যেতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল দোলা। শিয়রের কাছে খোলা জানলা দিয়ে পিছনের পাহাড়ের দিকে তাকাল। বলল, 'পাহাড়ের ওই টিলাটায় ওঠা যায়?'
'হ্যাঁ। বাংলোর সীমানায় ঢুকতে যে গেট দেখলে ওর পাশ দিয়ে রাস্তা আছে। সোজা ওপরে উঠে গেছে রাস্তাটা। যাবে তুমি?'
'যাব'।
সকাল থেকেই আকাশটা আলো আঁধারি। টুকরো টুকরো উদ্‌ভ্রান্ত মেঘ। উদ্দেশ্যহীন উড়ছে। সূর্য ঢাকা মেঘছায়া নদীর জলে বিন্দু বিন্দু রেখা এঁকে তরতরিয়ে যাচ্ছে। দুধের সরের মত পাতলা আস্তরণ রচনা করছে। আবার থমকে দাঁড়াচ্ছে। চায়ের পাট চুকিয়ে পোশাক পালটালো দোলা। ঝুল বারান্দায় বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। এলোমেলো হাওয়ায় কপালের ওপর কয়েকটা চুল এসে পড়েছে। ফিকে নীল ব্লাউজ শাড়ি পরেছে দোলা। উজ্জ্বল দু'চোখে প্রশান্ত বিস্ময়। উন্মুখ চোখ চেয়ে দূর দূরান্তে তাকাল।

চারদিক নিস্তব্ধ নিথর। নির্জন নিশ্চুপ। কিছু অজানা পাখির কিচিরমিচির শব্দ। একটানা ঘুঘুর ডাক। মাঝেমধ্যে টিয়া পাখির ট্যা ট্যা শব্দ। ধান ক্ষেত থেকে উড়ে যাচ্ছে পাখিগুলি। আল বেঁধে বৃষ্টি জমানো ধান ক্ষেত। নবীন গাছে বাদলা হাওয়ার হিল্লোল। আকাশের গা ঘেঁষে সারিবদ্ধ এক ঝাঁক সাদা বক দূরান্তে মিলিয়ে গেল।
'এখন যাবে দোলা?' রাজীব জিগ্যেস করল।
'কোথায়?'
'পিছনে ওই পাহাড়ের টিলায়।'
'যাব।' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দোলা। বলল,'দাঁড়াও একটু ভেতর থেকেআসছি'।
বাংলোর সামনে ছোট লন। লনের শেষ প্রান্তে পাহাড়টা ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। সেই প্রান্ত সীমায় টেকোমা গুড়ি গুড়ি গাছের বেড়া। বাংলোর চারদিকে হাজার রকমের গাছ গাছালি। পাতাবাহার, ঝাউ, পাথরকুচি, ইরাকথিমাম ক্যাকটাস—আরও কত কী যে! বারান্দায় টবে সাজানো একোয়াচাইকোটিস, স্কালডিয়াম,ঘৃতকুমারী এবং লজ্জাবতী গাছ। নুড়ি বিছানো রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ ফুটন্ত নাইন-ও-ক্লক ফুল। সবুজ ঘাসের কার্পেটে বিশল্যকরণী গাছের আলপনা আঁকা। ছাদ বরাবর একটা বোগনভেলিয়া গাছ। উজ্জ্বল বর্ণ বাবড়ি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে। দোল খাচ্ছে। বকুল গাছে ফুল ফুটেছে অজস্র। টুপটুপ ঝরে পড়ছে। জবা করবী এবং কাঠগোলাপের ছড়াছড়ি।
ওরা দুজনে লন পেরিয়ে নুড়ি পথ এবং নুড়িপথ থেকে গেটের বাইরে হাঁটুরে পাথুরে পথ ধরল। আঁকাবাঁকা খাড়াই পথ ঘন ঝোপ জঙ্গল গাছের সারির আঁচলে মুখ লুকনো। রাজীব হাঁটছিল কিছুটা দ্রুত। দোলা পিছিয়ে পড়তে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল ওর জন্য। হাত ধরে ওপরে উঠতে সাহায্য করল দোলাকে। তারপর কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটতে থাকল।
পাহাড়ের দেহময় জিওল, বনশিরীষ, শাল, পিয়ালের সারি। বকুল, আমলকি, হরিতকি বহড়া বন। কার্কট, নারাঙ্গা, কেন্দু গাছের গলা জড়াজড়ি। আতমোড়া ভেলা সেঁওকুল।— আরও কত কী যে গাছ। অনেক অচেনা নাম না-জানা গাছ। নানা লতাপাতা গাছ গাছালিতে ভরা ঘন ঝোপ জঙ্গল। ডালে ডালে কাঠবিড়ালী। বনমুরগি উড়ে গেল একটা।

'ভয় করছে দোলা?' রাজীব জিগ্যেস করল।
দোলা হাত ধরল। রাজীবের অন্য হাত দোলার কোমরে। রাজীবের শরীরের সঙ্গে লেপটে থেকে দোলা বলল, 'যদি বাঘ বেরোয়?'
'ধ্যেৎ। এসব বনে বাঘ থাকে কখনও?'
'তবু ভয় করছে । চলো ফিরে যাই। অনেকটা উঠে এসেছি কষ্ট হচ্ছে ভীষণ।'
দৃষ্টি বুলিয়ে রাজীব দেখল, কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে দোলার। মুক্তো বিন্দুর মত ঘাম। রীতিমত হাঁপাচ্ছে দোলা। বুকের কাপড়ে তরঙ্গ উঠছে । পাথরের একটা বড় চাঁই দেখিয়ে বলল, 'চলো বসা যাক। একটু জিরিয়ে নাও। তারপর নামা যাবে।'
পাশাপাশি বসল দু'জনে। রাজীবের ডান হাত দোলার মসৃণ কাঁধে। মৃদু চাপ দিল। বাম হাতের মুঠোয় দোলার সরু আঙুলগুলো নিয়ে খেলছিল। কিছুটা ঝুঁকে রাজীবের বুকে মাথা রাখল দোলা। তৃপ্তির শ্বাস ফেলল ঘন ঘন। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। একে অপরের প্রাণস্পন্দন অনুভব করছিল। একসময় রোমকূপ ত্বকে চমক লাগল। দুলন্ত ডালপাতার ফাঁকে ছলকে পড়া রোদ্দুর। ছোট্ট পাখিদের চঞ্চল পাখনা ওড়া শব্দ। কিচির মিচির ডাক।
'দোলা'—রাজীব প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল।
'উঃ।'
'কি ভাবছ?'
'কিচ্ছু না।'
'ভয় করছে?'
'হ্যাঁ।'
'কিসের ভয়?'
'জানি না।'
আবার দু'জনে চুপচাপ দীর্ঘক্ষণ। হঠাৎ অরণ্যে সাড়া জাগিয়ে বৃষ্টি এলো। হরিণ-ছাঁট বৃষ্টি। অল্পবিস্তর ভিজল দুজনে। কপাল গড়িয়ে জলের ফোঁটা ঝরছিল। পাতায় পাতায় শব্দ তোলা বৃষ্টি।
'কী মিষ্টি শব্দ।' রাজীব বলল।
'বৃষ্টি তোমার ভাল লাগে?' অস্ফুটস্বরে জিগ্যেস করল দোলা।
'হ্যাঁ। তোমার ভাল লাগে না?'
'জানি না।'
'জানো, বলবে না। আচ্ছা দোলা, এই যে নিরিবিলি নির্জনতায় শুধু আমরা দু'জনে। বৃষ্টিতে ভিজছি। তোমার শরীর মনে বিশেষ কোন অনুভূতির সাড়া পাও না? আমি কিন্তু পাচ্ছি।'
দোলা কোন জবাব দিলনা। হঠাৎই উঠে দাঁড়াল। বৃষ্টি থেমে গেছে। ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল, 'চলো ফিরে যাই। ভীষণ ভয় করছে আমার।'
'কীসের ভয়?' কথাটা জিগ্যেস করতে গিয়ে চমকে থমকে গেল রাজীব।
সামনে ঝোপ জঙ্গলের ফাঁকে জুলজুল জ্বলন্ত দু'টো চোখ। এদিকেই তাকিয়ে। পাকা জাম-রঙা একজন আদিবাসী লোক দাঁড়িয়ে। শক্ত খাটো চেহারা। মাথাভরা কুচকুচে কালো বাবড়ি চুল। কাঁধে একগুচ্ছ জ্বালানি কাঠ। কালো বিড়ালের মত তীক্ষ্ণ চোখ দু'টোয় দুর্বোধ্য ভাষা।

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল রাজীব। দোলার হাত ধরে দ্রুত নিচে নেমে গেল।

দুপুরে খাওয়ার পর রাজীব জিগ্যেস করল, 'কী করবে দোলা—বেরুবে না ঘুমোবে?'

'কোথায় যাবার কথা বলছো?'

'সামনে ওই নদীর উপত্যকায়।'

'যাব। তবে একটু গড়িয়ে নিয়ে তারপর।'

বিছানায় গড়িয়ে নিতে দোলা সত্যিই ভেতরে চলে গেল। ঝুল বারান্দায় বসল রাজীব। সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল ঘন ঘন। মেঘের ফাঁকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে মাঝে মধ্যে। রোদ্দুর ছড়াচ্ছে বন বনান্তরে। রৌদ্রছায়া কখনও বা ছায়ারৌদ্র খেলা। অরণ্য আকাশে গাছ গাছালি এবং সামনে নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশি হাসছে খেলছে। আবার ম্লান বিষণ্ণতায় ডুবে যাচ্ছে। আবার হাসছে। সামনের লনে ফুল বাগিচায় বর্ণময় হরেকরকম ফুল। নকশা কাটা ঘাস-ফড়িং প্রজাপতি। দলছুট বন মৌমাছি। চঞ্চল উচ্ছল উড়ে বেড়াচ্ছে। চারদিক মৌ মৌ গন্ধে ভরপুর। যেন কোন উৎসব।

দোলার শরীরের গন্ধে চোখ ফেরাল রাজীব। কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে দোলা। চোখে অতল সমুদ্রের আহ্বান। ফড়িং প্রজাপতি বন মৌমাছির উচ্ছলতা। মৌ মৌ ফুলের গন্ধ। নিটোল গড়ন দোলার দেহের। অবিন্যস্ত চুলের অরণ্য। আগোছালো আঁচল। গালে গোলাপী রক্ত স্বপ্নালু। কী লুকনো আছে দোলার মনে! গভীর অরণ্যে কী লুকনো থাকে? দোলাকে অরণ্যের মত ভাবতে ভাল লাগল। দু'হাতে বাধাগুলো সরিয়ে সরিয়ে অনেক গভীরে চলে গেলে কেমন হয়। কী অপরূপ সৌন্দর্য লুকনো আছে সেখানে। মোহময় গন্ধবর্ণ রূপরসের ভাণ্ডার? রাজীবের জানতে ইচ্ছে করল। প্রকৃতি নগ্নতায় বিশ্বাসী বোধহয়।

'কী দেখছো অমন করে?' দোলার ঠোঁটে চাপা হাসি। অর্থবহ।

'তোমার ভেতরটা ভাবতে ভাল লাগছে। দেখতে ইচ্ছে করছে ডুব দিয়ে।'

'অসভ্য'। লাজুক চোখে ফিক করে হাসল দোলা। দুষ্টুমিতে ভরা। যেন সোনা ঝরা উজ্জ্বল রোদ্দুর। দোলার শরীরের প্রতিটি স্তর এখন অপার সৌন্দর্যময়। এত মিষ্টি শান্ত সুন্দর সৌন্দর্য রাজীব দেখেনি কখনও আগে। 'অসভ্য' কথাটার মধ্যে কীযে গভীর ভালবাসা। শব্দটাতে কাছে টানার দুর্বার ক্ষমতা। রাজীব বলল, 'আমি নির্ঘাৎ মরে যাব দোলা। আমার বুকে হাত রেখে দেখ—কী দ্রুত স্পন্দন।'

'ওরকম হয়। বিশেষ করে নিরিবিলিতে।' দোলা বলল কপট তাচ্ছিল্য দেখিয়ে।

অর্থাৎ দোলারও নিশ্চয়ই হয়। রাজীব ভাবল। ইচ্ছে হল গাঢ় আলিঙ্গনে দু'জনের স্পন্দন মিলিয়ে দেখতে। এক আর এক মিলে তো দুই সব ক্ষেত্রেই নয়। কখনও সখনও একও হয়। সেই সময়টা কখন? দোলার সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার সময়টা।

'যাবে না?' জিগ্যেস করল দোলা।

'কোথায়?'

'নদীর উপত্যকায়।'

বন থেকে বনান্তরে নিয়ে যাবার আহ্বান শুনল রাজীব। ঝটিতি উঠে দাঁড়াল।

পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে পা ফেলছিল দু'জনে। ক্রমশ নিচে নেমে প্রায় জলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। সোনালি বালির বেলাভূমি। নরম বালিতে সারিবদ্ধ দু'জোড়া পদচিহ্ন আঁকা হয়ে যাচ্ছে। কখনও নদীর কিনারে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাশাপাশি হাঁটছিল দু'জনে। বিস্তীর্ণ উপত্যকা। সবুজ জোতজমি। সাদা বকের সারি। শাল বনে হাওয়ায় একটানা শিরশির

শব্দ। আকাশে মেঘ সরে গিয়ে নীল চাঁদোয়া ভেসে উঠেছে। চিকন হলুদ রোদ্দুর গায়ে মেখে প্রাণমন চঞ্চল হল। ঘাসপাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জলে চকমকি মুক্তো বিন্দু। নদীর জলে পা ডুবিয়ে দ'টো গাছ দাঁড়িয়ে। দিগন্তব্যাপী শীতল নিস্তব্ধতা। এলোমেলো হাওয়ায় দোলার আঁচল খসে পড়ল। ভরাট যৌবন কোনও শাসন মানতে চাইছে না। বকেদের উড়াল দেখতে দেখতে শিশুদের মত ছুটতে পাখিদের মত উড়তে ইচ্ছে হল দোলার।
নদীর কিনারে জল ছুঁয়ে বিরাট বড় একটা পাথরের চাঁই। পাথরটায় পা দুলিয়ে বসল দ'জনে। জল ছুঁই ছুঁই পা। দোলা পা তুলে বসল। হাঁটুতে চিবুক পেতে। দোলার নরম দেহের আকর্ষণীয় স্থানসমুহ ছুঁই ছুঁই করেও স্পর্শ করল না রাজীব।
নদীর ওপারে দুগ্ধ ধবল একপাল গরুবাছুর। ছোট একটা ছেলে কঞ্চি হাতে শিমুল গাছের নিচে বসে আছে। কিশোর বাছুরটা মনের সুখে লাফাচ্ছে। গলার ছোট্ট ঘন্টিটায় টুং টুং শব্দ। নিস্তব্ধতা আর নৈঃশব্দ্যের চরাচর। কোচড়ে জমানো নুড়িগুলো টুকটাক জলে ছুঁড়ে ফেলছে দোলা। শব্দ হচ্ছে টুপটুপ। ভারি মিষ্টি শব্দ।
দোলার মাথায় চুলে নাক ডোবাল রাজীব। হাতের মুঠোয় হাত। অব্যক্ত অনুভূতি। শরীরময় অনুরণন। রমণীয় রক্তপ্রবাহ। দ্রুত হৃদস্পন্দন। দুরন্ত বেগে সময় বয়ে যাচ্ছিল। সূর্য কখন পশ্চিমে অস্তাচলে। সূর্য ডুবল। রক্ত রেশ মিলিয়ে গেল। পাতলা অন্ধকার নামল। কুয়াশার মত সন্ধ্যায় ম্লান আস্তরণ ছড়িয়ে পড়ল। অরণ্যের বর্ণ বদলাচ্ছে। গাঢ় সবুজ থেকে ফিকে সবুজ। আবার গাঢ় সবুজ প্রকট হয়ে উঠল। তারপর অন্ধকারের গভীরে পাহাড় অরণ্য নদী উপত্যকা যেন ঘুমন্ত। চারদিক গভীর রোমাঞ্চকর রমণীয়।
রাজীব দোলার মুখ জুড়ে জলকালি মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত। 'তোমার ভয় করছে না রাজু?' এবার দোলা জিগ্যেস করল।
'কীসের ভয়?'
'এই নিরিবিলি নির্জন অন্ধকারে—'
কথাটা শেষ করতে পারল না দোলা। ভয়ে চমকে উঠল। আর্ত চিৎকার করে বলল, 'ওই দেখ সকালের সেই লোকটা।'
ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আদিবাসী লোকটা। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভয়ঙ্কর কুৎসিত লাগছে। শিকারী জন্তুর মত চাহনি। অব্যক্ত দুর্বোধ্য ভাষা ঠোঁটে। তীর ধনুক হাতে। কাঁধে ঝোলানো ঝুলি। হয়তো খরগোস বনমুরগী শিকার করে ফিরছে। রাজীবের চোখে চোখ পড়তে লোকটা অপ্রস্তুত। নিমেষে আকন্দ কাঁটালতা ঝোপঝাড়ের আড়ালে উধাও। চকিতে অরণ্য উপত্যকা পেরিয়ে হরিণীর মত ছুটল দোলা। অতি দ্রুত উর্ধ্বশ্বাসে। পিছনে দৌড়ে গেল রাজীব। কিছুতেই ধরতে পারল না।
বাংলোয় ফিরে নিশ্চিন্ত আরামে বিছানায় আছড়ে পড়ল দোলা। পা নাচালো। কাচের চুড়ির শব্দ ছড়ালো। ঢেউ তোলা হাসি ওড়ালো মুঠো মুঠো। বুকের কাপড় অবিন্যস্ত। মাথার চুল এলোমেলো। থরথর কাঁপন ঠোঁটের পাপড়িতে। ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে রাজীব জিগ্যেস করল, 'ভয় করছে দোলা? এখানে আবার কীসের ভয়!'
কোন জবাব দিল না দোলা। চোখের মণিতে স্থির বিস্ময়। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ নদী পাহাড় অরণ্য উপত্যকা—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে প্রকৃতিকে ঠিকঠাক চেনা যায় না। চার দেয়ালের ভেতর বুকের ওপর রাজীবকেও নয়। এখন দরজার অর্গল বন্ধ। সিঁড়ি বারান্দায় গ্রিল আঁটা। দোলা জানে, সেই লোকটা কিছুতেই আসতে পারবে না এখানে। অথচ, তার চোখ দু'টো রাজীবের চোখে স্পষ্টত।

অমৃতায়নে অনুভব

প্রতিদিন ঠিক তিনটে তিরিশের সময় ঘন্টাটা বেজে ওঠে। এই শব্দ শোনার প্রতীক্ষায় অনেকেই উৎকর্ণ থাকে। তেমনি একজন অনুভব যথারীতি আজও ঘর ছেড়ে বের হল।
করিডোরের শেষ প্রান্তে ঝুল বারান্দা নয়ত যেন হলঘর। এক ঝাঁক শ্বেত কপোতের মত চেয়ারগুলি ফাইভারের। টেবিলগুলি চন্দন বর্ণের। প্রতিটি টেবিলের ফ্লাওয়ার ভাসে নরম-রঙা ফুলের গুচ্ছ। এখানেই সকলের জন্য বিকেলের চা বিস্কুট খাওয়ার ব্যবস্থা।
সুমুখে ঝাঁপখোলা কাউন্টারে সাজানো অজস্র চায়ের পেয়ালা। স্টিল-পাত্রের কল খুলে একজন মহিলা চা বিতরণ করেন। সেইসঙ্গে বিস্কুটও। কোন দাম দরকার হয় না।
অনুভব আজও একা সর্বশেষ সারিতে। সুমুখের শূন্য চেয়ারগুলিতে একে একে চা-পিয়াসীরা এসে বসছে। কিন্তু কেউই মুখোমুখি না। ক'দিন ধরে অনুভব এরকমই দেখছে। তবে কি এখানে কারও মুখ দেখতে নেই? কোন মহিলাই আসে না?
অনুভব আজই প্রথম একটি মেয়েকে দেখতে পেল। বয়স বিশ থেকে চব্বিশের মধ্যে হবে হয়ত। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি । এই পোশাকটির প্রতি অনুভবের দারুণ দুর্বলতা।
মেয়েটিই একমাত্র অনুভবমুখি। চায়ের পেয়ালায় আলতো ঠোঁট ছুঁইয়ে চা পান করছে। মাঝে মাঝে কপালের ওপর ঝুলে পড়ছে রেশমি চুল। চুল সরানোর ফাঁকে মেয়েটি একঝলক অনুভবের দিকে তাকাচ্ছে।
অনুভব মেয়েটির কমলা-কোয়া ঠোঁটের কোণে একবার এক চিলতে হাসি দেখতে পেল। কিন্তু মনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হলনা। সে এখানে অতীতকে ভুলে অন্যমুখী মানুষ হতে চাইছে।
নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা অনুভবের আবাল্য বিলাস। সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে বটে, কিন্তু ওরা বিরোধী-মানসিকতায় এক একটি নির্জন দ্বীপের মত। স্বচ্ছলতা ভোগ-বিলাসে থাকা সত্ত্বেও কেউই সুখ-শান্তিতে নেই। সুরা আর অন্য নারী অনুভবকে যথার্থ পরিতৃপ্তি দিতে পারেনি। তাই, ইদানীং একাধিক ভিন্নধর্মী বই পড়ে ধারণা জন্মেছে, ভোগ, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা আর নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সঠিক পথ হল, আত্মসংযম। মনকে ঈশ্বরমুখী কল্যাণমুখী করে তোলার প্রয়াসে চাই, নির্জন অজ্ঞাতবাস।
জটিল কুটিল কুশ্রী সংসার জীবন থেকে অনুভব একরকম পালিয়েই এখানে এসেছে। এসে অব্দি দেখছে, এখানকার নিঃসঙ্গতা বিষণ্ণতা-বিহীন শান্তিময়।
আশ্রমটি সমুদ্র-তীরে। অনুভব এখানে এক ঘরে আছে। ছোট্ট ঘরটি ছিমছাম সাজানো। আশ্রমের অতিথি আবাসের দুর্লভ এই ঘরটি সে আশ্রমিক একটি মেয়ের বিশেষ সহানুভূতিতে পেয়েছে। মেয়েটির হাসি আর চাহনি ছিল স্নিগ্ধ নিষ্পাপ মধুর। জ্যোৎস্নার মতো পবিত্র। নির্মেঘ আকাশ আর শান্ত সমুদ্র দেখার মত ভাল লেগেছিল বলেই না কোথাও ঠাঁই না পেয়ে

সাহায্যের জন্য দ্বিধাহীন অনুরোধ জানাতে সাহস পেয়েছিল। ব্যস্ ওই পর্যন্তই। তারপর আর এতটুকু ভাব জমাবার বাসনা জাগেনি।

এখানে নীল আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভাসে। সফেন সমুদ্র-ঢেউ শব্দ তোলে। আছে মনোরম উদ্যান কুঞ্জবন। দোকান বাজার মানুষজন। অথচ, কটু কোলাহল শব্দ বিরল। আশ্রম এলাকার বাইরে নিকটেই ছোট্ট শহর। শহরে যা যা থাকে সব আছে। সেখানে অন্য শহরের তুলনায় অর্ধ-কম মূল্যে তরল মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়। অথচ আশ্চর্য, প্রকাশ্যে বেহেড মাতাল দেখা পাওয়া দায়। বর্ণ থাকলেও উগ্রতা নেই । আবেগ আছে, উচ্ছলতা নেই। গতিতে নেই কোনও উন্মত্ততা । জীবন নয়, দুরন্ত উড়ন্ত ভাসন্ত।

ইদানীং অনুভব এরকম একটি পরিবেশে আসার স্বপ্নই দেখছিল। উদ্দেশ্য, বেশ কিছুদিন একা আত্মস্থ হয়ে থাকা। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি চিন্তাভাবনা। নির্বাক থেকে অভ্যন্তরীণ শক্তি সঞ্চয় করা। এখানে অনেক কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হচ্ছে। বজায় রাখতে হচ্ছে, অধিক নির্বাক-নীরবতা। বর্জনীয়, আমিষ ভোজন। মাদকদ্রব্যতো বটেই, ধূমপানও নিষিদ্ধ । চেন স্মোকার অনুভবের কষ্ট হলেও ভাল লাগছে। মনকে বোঝাচ্ছে, দুঃখকষ্টের পরিণামই তো অনন্ত আনন্দময়। নিজের ওপর কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য কৃচ্ছতা সদিচ্ছাও তো এক ধরনের তপস্যা।

এহেন তপস্বীর সঙ্গে এই ক'দিনে আশ্রমিক সেই মেয়েটির বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। মেয়েটি সাইকেল-চড়ে এদিক সেদিক যাতায়াত করে। কাঁধে ঝোলে কাপড়ের ঝোলা। চোখাচোখি হলে শুধু নিষ্পাপ হেসেছে। অনুভব কোনও কথা বলার সুযোগ পায়নি।

মেয়েটি আজ নীল সুতোয় নকশা কাটা সালোয়ার কামিজ পরেছে। ডাকঘর থেকে বেরিয়ে সাইকেলে উঠতে যাবে অনুভব সুমুখে দাঁড়িয়ে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে বলল, আপনার জন্যই আশ্রমের অতিথি ভবনে ঠাঁই পেয়েছি। সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে দেরি হয়ে গেল।

মেয়েটি বিনম্র বলল, আশ্রমিকের কাছে সকলেই সমান। আপনাকে অন্যায় কোন সুযোগ তো দেইনি। তাহলে কৃতজ্ঞতা কেন?

তবে যে প্রথমে বলেছিলেন, কোন ঘর খালি নেই।

সে শুধু যাচাই করে নিতে, প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছেন নাকি আশ্রম সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ উৎসাহে এসেছেন। যাক, কেমন লাগছে এখানে?

খুউব ভাল। অনুভব সঙ্কোচমুক্ত বলল, আরাম সুখ ভোগ বর্জিত এই আশ্রমে আমি যদি বাকি জীবন থাকতে চাই আপনি কোনরকম সাহায্য করতে পারেন কী?

এই আশ্রমটি আদতে একটি কর্মশালা। এখানে স্কুল কলেজ চাষবাস কুটির শিল্প মুদ্রণব্যবস্থা সবকিছু আছে। আবাসিকরা সকলেই শ্রমের বিনিময়ে থাকেন। আশ্রম-অধ্যক্ষর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবেন। ঠিক আছে? নমস্তে।

প্যাডেলে চাপ দিয়ে মেয়েটি ব্যস্ততায় উধাও হয়ে গেল।

এখানে সকলেই যেন সদা কাজে ব্যস্ত। কেউ কোন বাড়তি কথা বলে না। আশ্রমের সর্বত্র লেখা দেখা যায়, 'নীরবতা বজায় রাখুন।' নির্বাক নীরবতায় নাকি মনের বিশ্রাম হয়। শরীর

মনে শক্তি বাড়ে। নিস্তব্ধতায় পূর্ণ প্রশান্তি আসে। একাগ্রতা, অনুশীলন, চিন্তা নিয়ন্ত্রণে মানসিক নিস্তব্ধতা নাকি খুবই প্রয়োজন। সেজন্য কথার ওপর চাই কর্তৃত্ব শাসন।
নির্বাক অনুভব প্রতিদিন সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখে। সন্ধ্যায় চোখের সামনে নীল সমুদ্র তরল শিসা রঙ হয়ে যায়। রাতের আকাশে রুপালি থালার মত চাঁদ ওঠে। সেই থালা থেকে অবিরাম দুধসাদা জ্যোৎস্না ঝরে।
আজ অনেকক্ষণ হল একা সমুদ্রতীরে বসে থেকে অনুভবের চা কফি কিছু একটা খেতে ইচ্ছে হল। পায়ে পায়ে গান্ধীঘাটের পাশে কাফেতে গিয়ে ঢুকল। সুসজ্জিত দোতলায় এখন একাধিক গোল টেবিল ঘিরে টুরিস্টদের ভিড়। সুশ্রী নারী-পুরুষদের সংখ্যাই বেশি। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা চঞ্চল উচ্ছল।
হঠাৎই কোন এক ভিড়ের টেবিল ছেড়ে কমলা-কোয়া ঠোঁটের সেই তরুণীটি উঠে এল। নিঃসঙ্গ অনুভবের টেবিলের অপর প্রান্তের চেয়ারে বসল। ভুরু নাচিয়ে জিগ্যেস করল, আপনি একা?
হ্যাঁ। অনুভব প্রাণবন্ত হয়ে উঠল, সম্ভবত আপনিও।
অবশ্যই। তরুণীটি নির্বাক উদাসী গম্ভীর হয়ে পড়ল।।
অনুভবের মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি তরুণীটিও ভোগে বীতশ্রদ্ধ? মোহমুক্তি আর নৈরাশ্য বুকে ধরে এখানে এসেছে?
কফির পেয়ালায় চিনির চামচ নেড়ে তরুণীটি নিস্তব্ধতা ভাঙল, আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষীর মুখে শোনা কথা, উন্নত মানুষ অর্থে ধনসম্পদ আর পুঁথিগত বিদ্যা বোঝায় না। কর্মযোগে নির্মল মন সুস্বাস্থ্য আর উন্নততর চিন্তাভাবনার অধিকারীরাই প্রকৃত অর্থে যথার্থ মানুষ। এখানে নাকি সেই উন্নতমানে পৌঁছে দেওয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা আছে?
ভুল শোনেননি। এখানকার শিক্ষাটা আধ্যাত্মিক ভাবনা নির্ভর। সেই শিক্ষা নিতে হলে সবকিছু ছেড়েছুড়ে এখানে এসে থাকতে হবে। থাকবেন নাকি?
আপনি থাকছেন বুঝি? উত্তর এড়িয়ে তরুণীটি পাল্টা প্রশ্ন করল।
ভাবছি।
ভাবতে থাকুন। ঝটিতি বিল মিটিয়ে তরুণীটি চেয়ার ছাড়ল।
লাইট হাউসের নিচে বাঁধানো চাতালের ওপর অনুভব বসেছিল। সস্ত্রীক দক্ষিণ ভারত বেড়াতে বেরিয়ে আচমকা আশ্চর্য আবিষ্কারের উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল অর্ণব। দীর্ঘকাল পর দুই বন্ধুতে দেখা-সাক্ষাৎ। স্বভাবতই একরকম জোর করে অনুভবকে ওদের হোটেলে নিয়ে গেল। হাজার গল্পগাছা শোনাল। প্রবল আপত্তি অনীহা উপেক্ষা করে হোটেলের আমিষ খাবার খাওয়াল। অনুভব মদ্যপান যদিবা এড়াতে পারল, পান সিগারেট থেকে ছাড় পেল না।
অর্ণব-পত্নী পর্ণা বলল, আপনাকে পেয়ে সময়টা বেশ সুন্দর কেটে গেল। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই চলে আসুন। তিনজনে মিলে সারাদিন আনন্দফুর্তি করা যাবে।
অর্ণব সরাসরি প্রশ্ন করল, কোন দুঃখে একা আশ্রমে এসে উঠেছিস? একা থাকতে কষ্ট হচ্ছে না?
অনুভবের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল, আমার কষ্ট চিন্তা করেই বুঝি তোরা এত বেশি আদর আপ্যায়ন করলি?

হোটেলে কতটুকু আর সম্ভব। পর্ণার প্রশংসায় অর্ণব উচ্ছল হল, একদিন আমাদের ফ্লাটে এলে দেখবি ওর অতিথি আপ্যায়ন। দারুণ রান্না জানে। ড্রিঙ্কস স্ন্যাকস্ ফুড এমন ফ্যানটাসটিক ডেকরেশন করে দেবে যে দেখেই তোর নেশা ধরে যাবে।

অর্ণব-বর্ণিত জগতটা অনুভবের অচেনা অজানা নয়। ধনার্জন পর্ব পার হয়ে এসে সে বুঝতে শিখেছে, ভোগ বিলাসের পরিণাম দুঃখময়। ধন অপেক্ষা বদান্যতা, স্বজনের চাইতে সুকৃত ঢের ভাল।

এমন কিছু মানুষ আছে যারা অল্পতেই সংসারধর্মে বড় বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। নৈরাশ্য পীড়িত হয়ে অশান্তি থেকে মুক্তি খোঁজে। কল্পিত সুন্দর পরিবেশে আশ্রমিক জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখে। সুখপাখির অসুখ বুকে ধরে পরলোকে সুখার্জন কামনায় হঠাৎই নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। অনুভব ঠিক ঠিক তেমনটি নাহলেও জবাব দিল, আমি কিন্তু এখানে আনন্দফুর্তি করে বেড়াতে আসিনি। বরং একান্তে নিঃসঙ্গ থাকতেই এসেছি।

রাতে মন উচাটনে অনুভবের ঘুম আসছিল না। পেছন দরজা খুললে সমুদ্র-মুখী ছোট্ট এক ফালি বারান্দা। সাজানো কয়েকটি বাহারি পাতা আর ফুলের টব। সাদা রঙ মাখানো বেতের চেয়ার দু'খানা। তার একটিতে বসে আত্মমগ্ন হল। মনে প্রশ্ন জাগল, লোভকে কেন জয় করা গেল না? এরপর যদি লোভ থেকে আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ লালসা আসে? আশঙ্কা হল, লজ্জা উবে যাবে। ভয় ভেঙে দেবে। অতএব স্থির সিদ্ধান্তে এল, আরও কঠিন সংযম কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য চাই, আয়াসহীন নির্জনতা। বাহুল্যবর্জিত জনমানবহীন অজ্ঞাতবাস। বনবাসেই সম্ভব, স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দতা মুক্তি উদারতা শান্তি আর সন্তোষ। বনই অমৃতায়ন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে অনুভব লক্ষ্যহীন যাত্রা শুরু করল। সমুদ্রতীরের বালিয়াড়িতে অজস্র পদচিহ্ন ফেলে দীর্ঘপথ পার হয়ে গেল। একসময় অপার সৌন্দর্যময় এক বনভূমি দেখতে পেল। শস্যক্ষেত গোচারণ ভূমি অতিক্রম করে বনপথ ধরল। বর্ণালি ফুলফল গাছ গাছালি লতায় ভরা এক জায়গায় পৌঁছে পথ হারিয়ে ফেলল। কিন্তু গা ছম ছম ভয়ে থমকে থাকল না। অনেক অন্বেষণের পর ঝোপের আড়ালে একটি কুটিরের সন্ধান পেল।

কুটিরটির মাটির দেয়াল মসৃণ চিত্রিত। সুমুখে গোবর ছড়ানো পরিচ্ছন্ন উঠান। এক কোণে নিভন্ত কাঠের উনানের ওপর মাটির ম্যাজলা। পাশে স্তূপীকৃত শুকনো পাতা আর জ্বালানি-কাঠ। খুঁটিতে বাঁধা গাইবাছুর।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তিতে কাতর অনুভব আশ্বস্ত হল। কুটিরের দাওয়ায় বসে উন্মোক্ত দরমা-দরজার দিকে মানুষজনের আশায় তাকাল।

এখানে বাতাসে ভাসছে , পাকা মহুয়ার সুবাস। বন পাতার আড়াল থেকে নাম না জানা পাখিরা শিস দিচ্ছে। গাছের ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে বনবিড়ালি কাঠবিড়ালি। শুকনো পাতা ঝরছে, ঝুর ঝুর টুপ টুপ। গাইবাছুরের গলায় টুংটাং ঘন্টি বাজছে। ফড়িং প্রজাপতি মৌমাছি উড়ছে। ফর্ ফর্ পত্ পত্ বন্ বন্। যেন এক স্বপ্নের জগত।

আলস্য নেমে আসা চোখে অনুভব লাঠিতে দেহের ভারসাম্য রেখে এক বৃদ্ধাকে এগিয়ে আসতে দেখল। বৃদ্ধটির পরনে মলিন আলখাল্লা। মুখের চামড়া শুকনো হরিতকীর মত। একদঙ্গল চুল গোঁফ দাড়ি যেন সাদা শন।

রক্তশূন্য জরাগ্রস্ত দীর্ঘদেহী ঝুঁকে ক্ষীণ দৃষ্টিতে পরখ করে জিগ্যেস করল, কে বটে। কৌন্?
অনুভব সসঙ্কোচে গৃহসংসার ত্যাগের কারণ সমূহ জানিয়ে বলল, শুনেছি বনেতেই সন্তোষ শান্তি। বনবাসে আমি আপনার আশ্রয়প্রার্থী।
বঙ্গালী-বাবু। স্বগত উচ্চারণ করে বৃদ্ধটি হাঁক দিল, মঙ্গলা বেটিয়া দেখ্ কৌন্ আয়া। আলুথালু কেশি স্বল্পবসনা জামরঙা একটি যুবতী অনুভবের সুমুখে এসে দাঁড়াল। অতুলনীয় ওর নাভি বিপুল নিতম্ব সুগঠিত স্তনযুগল। হরিণীর মত লাজুক চোখ দুটি বিস্ময়ে নিশ্চল। ঠোঁটে আঁটা চটুল চপল হাসি।
অতিথি আপায়নের নির্দেশ দেওয়ার আগে বৃদ্ধটি জানাতে চাইল, হামি সাধুসন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত না আছি। হরিজনের সেবা লিলে আপনার জাতধর্ম বরবাদ হবে নাতো?
আরে না না। অনুভব সহজ আপন হতে বলল, ওসব আমি মানি না। আমার বিশ্বাস, সব মানুষই এক ঈশ্বরের সন্তান।
দুধের সর দই খই ক্ষীর খাইয়ে অনুভবকে আপ্যায়িত করা হল। বৃদ্ধটি ওর দুঃখকষ্টের জীবন বৃত্তান্তে বহুকাল পূর্বে জাতপাতের দাঙ্গায় কিভাবে গাঁওয়ের হরিজন নিধন হয়েছিল সেই ইতিহাস বর্ণনা করল। আত্মীয়স্বজন হারিয়ে কত অসহায় অবস্থায় পরিবারের প্রাণ বাঁচাতে কিভাবে এখানে পালিয়ে এসেছে সেসব শোনাল। সবশেষে বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে প্রশ্ন রাখল, শান্তি সন্তোষকে লিয়ে ক্ষেতি মকান দেহাত ছাড় কর এখানে কি দেখলম্?
কি?
জঙ্গলমে ভি ভুখ লাগে। রোটি কাপড়া দাওয়াই দরকার হোয়। হিংসা লালস আছে। আগ লাগে, খুন নিকলে।
দিনের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে এল। বনাঞ্চলে কুটির প্রাঙ্গণে ধূসর সন্ধ্যা নামল। মঙ্গলা টিমটিম কেরোসিন-কুপি রেখে গেল। রুগ্ন আলোয় বৃদ্ধটিকে করুণ বিষণ্ণ উদাসী লাগছিল। বৃদ্ধটি ফের জানাল, কেমন করে ওর দু'টি জোয়ান লেড়কা গভীর অরণ্যে কাঠ মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ক্ষুধার্ত শেরের খাদ্য হয়ে গেছে। জরুকে বহুত্ কৌশিস করেও দাবানলের আগ থেকে বাঁচানো যায়নি। এক লেড়কি গেছে সমুন্দরের পেটে। দোশরা বিমারে পড়ে বিনা ইলাজে মরেছে।
এ্যাখুন মঙ্গলা বেটিয়া একা জিন্দা আছে। বৃদ্ধটি পিঁচুটি ভরা চোখের জল মুছে আর্দ্রগলায় বলল, সব কুছ সোচ্ সমঝকে আপ হি বলিয়ে শান্তি সন্তোষ হ্যায় কাঁহা?
শান্তি একমাত্র শ্মশানে। যুতসই জবাবটা অনুভবের ঠোঁট অব্দি এসে থমকে গেল। নিরুত্তর থেকে ভাবল, বনেও যে হিংসা লোভ ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক থেকে নিস্তার নেই তা আগেই জানা উচিত ছিল। মনের গহীনে তির তির প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল।
অল্প ক'দিনেই অনুভব নিকট দূরের জেলেদের ঝুপড়ি আদিবাসীদের আস্তানা সরকারি নজরদারি অফিস আর দাওয়াখানা চিনে ফেলল। নিরাপদ সহজ সোজা পথে সমুদ্রতীরের হাটে যেতে শিখল। বাপবেটিয়ার আন্তরিকতায় বেশ ভালই লাগছে এখন। ওরাও নতুন একজন সঙ্গী পেয়ে যথেষ্ট সতেজ প্রাণবন্ত।
আজ দুপুরে ভরপেট ভোজন অন্তে অনুভব অরণ্যপ্রকৃতি দেখতে বেরিয়েছিল। রৌদ্রছায়ায়

সজ্জিত সৌন্দর্য নয়নসুখকর লেগেছে। অজানা অচেনা গাছপাতা ফুল ফলের সুবাসে মাতোয়ারা হয়ে গুনগুনিয়ে উঠেছে। সবশেষে বালুকাবেলা থেকে সমুদ্রজলে সূর্যাস্তের বর্ণবৈচিত্র্য দেখে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে হয়েছে। পরক্ষণেই আনমনা হয়ে গেছে। গৃহমুখি হাঁটিতে হাঁটতে এখন মনে প্রশ্ন জাগছে, ভোগান্তে সংযম আর ভোজন অন্তে উপবাসের বাসনা হয়ত জাগে। কিন্তু সংযম উপবাসের পর? বাস্তব উপলব্ধি হল, হিংস্র জন্তুকে দমন করা যদিবা সম্ভব, বিষয়-সুখাভিমুখ মনকে বনে এনেও দমন করা দুঃসাধ্য।

বর্ষার পাহাড়ি নদীর মতো রক্তপ্রবাহ নিয়ে অনুভব কুটিরে ফিরল। দুর্বার সায়ন্তনী সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। ছড়ানো খইয়ের মতো তারায় ভরা রাতের আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ উজ্জ্বলতর হল। সমুদ্র জলাশয় বালুচর অরণ্য প্রকৃতিময় দুধলি আদুরে জ্যোৎস্না নামল। প্রকৃতি নগ্নতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠল।

রাত এখন গভীরতর। বৃদ্ধটি কুকুরকুণ্ডলী ঘুমিয়ে আছে শিশুর মত। কিন্তু, কাঁচা বৈরাগ্যে ঘর সংসার ছেড়ে আসা অনুভবের চোখে ঘুম নেই। উপোসী বুকে নির্বাক উদাসী ওর ঠোঁটতালু শুকিয়ে কাঠ। নির্জন দ্বীপের নিঃসঙ্গতায় হৃদয় বিদীর্ণ হতে চাইছে। সুদুর থেকে শব্দ ভেসে আসছে, দ্রিম দ্রিম। চারদিক জুড়ে অবিরাম ঝিঁঝির ঝিনঝিনানি। কখনও সখনও রাতপখি ডেকে উঠছে। নারকেল অশ্বত্থ ঝাউপাতার শিরশিরানি। বাতাসে চাঁপাফুলের সুবাস ভাসছে। ঝিকমিক করছে, শিশির ভেজা পাতা। উঠান জুড়ে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ ভালবাসা। এমন রমণীয় সৌন্দর্য সঙ্গীত-সময় অনুভবের মনে হল, ধর্মের চেয়ে সত্য শ্রেষ্ঠ। মুহূর্তে সংযমের সমস্ত অর্গলগুলি শিথিল হয়ে পড়ল। প্রকৃতি-তাড়িত অনুভব চুপিসারে চোরের মত মঙ্গলার অতি কাছে গেল। আলতো স্পর্শতেই বুঝতে পারল, সম্ভাব্য প্রত্যাশী প্রতীক্ষায় মঙ্গলাও জেগে আছে।

পাপ তাপ

ঘরগুলি কাঠের। অজস্র ফাঁকফোকর দিয়ে হিল হিল হাওয়া ঢুকছে। খড় বিচালি বিছানো মেঝের ওপর পাতা গাদ্দাগুলি তেল চিটচিটে। বাতাসের আর্দ্রতায় ভেজা স্যাঁতসেঁতে। এর ওপর নিজস্ব বিছানা পাততে হবে। তারপর কম্বল জড়ানো ঘুম। বাথরুম প্রয়োজন হলে রাস্তার ওপারে সরকারি লজটাই একমাত্র ভরসা। নয়তো, পাহাড়ি জঙ্গলে ইতস্তত ছড়ানো বড় বড় পাথরের চাঁইগুলির আড়ালে যাওয়া যেতে পারে।

এর নাম তীর্থপথের চটি। স্রেফ একটি রাতের জন্য ঘর প্রতি ভাড়া একশো টাকা।

বিস্ময়কর বড় বড় চোখ করে অনঘ বলে,'বড্ডবেশি চাইছ না?'

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন জবাব ছুড়ে দেয়,'সালমে মওকা মিলতা এক দো দফে।'

মওকাটা এনে দিয়েছে হঠাৎ দু'এক পশলা জোরালো বৃষ্টি। মরা আলোয় পিচ্ছিল পাহাড়ি পথে গাড়ি চালানো ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। এরই মধ্যে দু'টি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই কোনও গাড়ির ড্রাইভারই আর ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ঘরের জন্য অপ্রত্যাশিত চাহিদাটা সেজন্য। নয়তো, এখানে সচরাচর তীর্থযাত্রীরা রাত কাটাতে গাড়ি থামায় না।

এখান থেকে গৌরীকুণ্ড এমন কিছু দূর না। তীর্থযাত্রীরা সাধারণত সেখানেই রাত কাটায়। পরের দিন উষ্ণ কুণ্ডে স্নান সেরে কেদারনাথের পথে পদযাত্রা শুরু করে।

অনঘদেরও সেখানে থাকার জন্য আগাম ব্যবস্থা পাকা করা ছিল।

এখন অনঘের সঙ্গে অহেতুক উৎসাহে চৈত্রীও ঘর খুঁজতে বেরিয়েছে। বিত্তেশ চাটার্ড বাসের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে বসে আছে।

হরিদ্বার থেকেই বিত্তেশ লক্ষ করছে, বাঙালি চরিত্রের স্বাভাবিক নিয়মে গোটা দলটার মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। ব্যক্তি বিশেষের নামে নানারকম মুখরোচক কেচ্ছা কুৎসা টিপ্পনি শুরু হয়ে গেছে। ওদের তিনজনের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়েও একটা জটিল ধাঁধার কৌতূহল দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু অপ্রিয় শ্রুতিকটু চাপা গুঞ্জন, মন্তব্যও কানে আসছে। বিত্তেশ সেজন্য অনঘ-থেকে নিজেদের নিরাপদ নিস্পৃহ দূরত্বে রাখা সঙ্গত মনে করে চৈত্রীকে সমঝাতে চেয়েছে। চৈত্রী কিন্তু সহযাত্রীদের ফালতু কথায় কোনওরকম গুরুত্ব দিতেই নারাজ। চলছে আপন মর্জিমত।

অনঘের সঙ্গে চৈত্রী ঘর খুঁজতে যাওয়ায় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত বিত্তেশ ফুঁসছিল। বাইরের মনোরম দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে উদাসী হয়ে যাচ্ছিল। চৈত্রীর ডাক শুনে সংবিৎ ফিরে পেল।

চৈত্রীর নাছোড় আবদারে বাস থেকে নেমে ঘর দেখতে যায় বিত্তেশ।

অনঘ আগেভাগে চৈত্রীকে আকস্মিক অনিবার্য ব্যবস্থা দেখিয়ে বলে রেখেছিল, 'বিত্তেশকে একটু বুঝিয়ে বলো যাতে রাতটুকু কোনওমতে মানিয়ে নেয়।'

চৈত্রী যথেষ্ট বুঝিয়েই এনেছে তবু ঘর দেখেশুনে বিত্তেশের অপছন্দ। রাগে, ক্রোধে চিৎকার করে ওঠে,'ইমপসিবল। এখানে এভাবে কোনও মানুষ থাকতে পারে!'

ভয়ে চুপসে যায় চৈত্রী। কাকে কী বোঝাবে? কেদারবদ্রীর নাম শুনেই যে আঁতকে উঠে বলেছিল, 'সে তো ভীষণ কষ্টের ব্যাপার স্যাপার। কাজ নেই গিয়ে।'

প্রাণের বন্ধু মার্তিক তখন কাছেই বসেছিল। সুযোগ বুঝে সহজ টোপ ফেলেছিল, 'তার চেয়ে চলো দার্জিলিং যাই। হাতে ভাল বাংলো আছে। আরামে খাবদাব মৌজ করব। দারুণ ফুর্তি করা যাবে। একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না ওকে।' বিত্তেশের লোভ হলেও চৈত্রী রাজি হয়নি। সিমলার ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। দারুণ শীতে মার্তিকের প্রস্তাবে আপত্তি জানাতে রীত বুঝিয়েছিল, 'দোষ কী, খা না। বাইরের কেউ তো দেখছেনা। শীতের জায়গায় এসব খেলে শরীর মন চনমনে থাকে।'
সরল বিশ্বাসে হাড় কাঁপানো শীতের হাত থেকে বাঁচতে অনেকটা মদ খেয়েছিল চৈত্রী। পরের ঘটনাটা গা ঘিনঘিন কুৎসিত। বিত্তেশের মাতাল-ঘুমের সুযোগ নিয়ে জড়িয়ে ধরে নির্লজ্জ গাঢ় চুমু খেয়েছিল মার্তিক। ঠোঁটের জ্বালাটা দীর্ঘদিন ভুলতে পারেনি চৈত্রী।
দার্জিলিং যাবার প্রস্তাবে চৈত্রী পাল্টা প্রস্তাব দিয়েছিল, 'সারদা মায়ে'র কথায় আছে, সাধন ভজন তীর্থদর্শন করতে হয় প্রথম বয়সে। বেশি বয়সতো শ্লেষ্মা আর কফের। তাই আপনারাও বরং আমাদের সঙ্গে চলুন। বয়স থাকতে বড় রকমের পুণ্যের কাজ হয়ে যাবে।'
বিত্তেশের ওপর রীতের এক ধরনের দুর্বোধ্য দুর্বলতা আছে। ওর কাছে এলেই আঙুলের গাঁট আর ঘাড়ের ব্যথাটা চাগাড় দিয়ে ওঠে। বিত্তেশকে আঙুল ফুটিয়ে ঘাড় টিপে দিতে বলে। রীত তাই আসতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু অনঘ সঙ্গে থাকবে বলে নিশ্চিত সে জাতীয় ফুর্তিটুর্তি জমবে না। তাই 'ফালতু' অজুহাত দেখিয়ে মার্তিক প্রস্তাবটা এড়িয়ে গেছে।
চৈত্রী বোঝাতে চেষ্টা করে,'ভুল করছ বিত্ত। এখানে কেউ প্রমোদ ভ্রমণে আসে না। তেমন বিলাসঘর পাবে কেমন করে। বাইরে বের হলে অনেক কিছুই মানিয়ে নিতে হয়।'
'নিচ্ছি না কি?' বিত্তেশ রাগত বলে, 'ট্রেনে ওঠার পর থেকেই তো ত্রুটি আর ত্রুটি। এজন্যই ভুঁইফোড় ট্রাভেলস্‌এ আসতে নেই।'
রাগটা যে অনঘের ওপর চৈত্রী তা বুঝতে পারে। ভাবে, দোষটা অনঘের নয়। সে তো প্রফেশনাল নয়। বেড়াতে ভালোবাসে। কিছু লোকজন জোগাড় করে পরিচিত ট্রাভেলস-এ জুড়ে দেয়। নিজের বেড়ানোর খরচটা বাঁচে।
ত্রুটি বলতে বিত্তেশ যা বলতে চাইছে চৈত্রী তা বুঝতে পারে। রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টে হাজারো বেআইনি যাত্রীর ভীড়ভাট্টা। জলের অভাব। ট্রেন লেটের জন্য সময়মত হাতের কাছে খাবার না-পাওয়া। ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষুদ্র তুচ্ছ দোষত্রুটি।
চৈত্রী বোঝাতে চাইল,'আজকাল সারা দেশেই ট্রেনে এরকম অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা। বাইরে না-বের হলে জানবে কেমন করে।'
'জেনে কাজ নেই । জানতো, কষ্ট অমি একদম সহ্য করতে পারি না। আমার জীবনদর্শন বিখ্যাত সেই বিজ্ঞাপন,'বাঁচবেন তো একবারই। কেতায় বাঁচুন।' আমি কেতায় বাঁচতে চাই।'
চৈত্রীর ভাবতে কষ্ট হয়, কত দ্রুত আশ্চর্যরকম পাল্টে যাচ্ছে বিত্তেশ। আজকাল আর সেই শান্ত অহিংস স্মিতভাষী বিত্তেশকে এক মুহূর্তের জন্য খুঁজে পাওয়া যায় না। মার্তিকের আগ্রাসী প্রভাব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। খবর আছে, মার্তিকের বৈঠকখানাটা মাঝে মাঝে শুঁড়িখানা হয়ে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে খানাপিনা নাচ গান বেলেল্লাপনা চলে।

মাতাল অবস্থায় কে কার স্ত্রীকে জড়ায় চুমু খায় তার কোনও ঠিক ঠিকানা থাকে না। বিত্তেশের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ এখন একমাত্র নারী সম্ভোগে। সে এখন ঐশ্বর্য গর্বে একজন মোহান্ধ কামান্ধ পুরুষমাত্র। তাই কারণে অকারণে অস্বাভাবিক মাথা গরম করে বিশ্রী রকম কাণ্ড কারখানা করে বসে।

'তোমাকে তো এভাবে চাইনি বিত্ত।' উদ্ধত বিত্তেশের শেষ কথার ইঙ্গিতে চৈত্রী বলে, 'ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখ, মার্তিকদা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।'

'প্রশ্নটা আমারও, অনঘ তোমাকে প্রতিনিয়ত কী মন্ত্রণা দিচ্ছে? স্বামীকে অশ্রদ্ধা করা, অপ্রিয় কটু কথা বলা— এসব কার প্রভাবে? আমার সংসারের ভালমন্দ বিচারে সে কেন নাক গলাবে? নিজের ছেলেকে শাসন করব, তাতেও শালা বাগড়া দেয়। বলে কিনা, ওরকম রাফ ব্যবহার কোরো না। এযুগের ছেলেরা অনেক অ্যাডভান্স। মাঝে মধ্যে ওর পছন্দ অপছন্দের গুরুত্বটা দিও।'

'অন্যায়টা কী বলেছে? কতদিন তো আমিও বলি, ছেলেটা বড় হচ্ছে। সব কিছু বুঝতে শিখছে। এবার থেকে একটু বুঝেশুনে চলো।'

'কেন বল? ছেলেটা যে মুখরা হয়ে উঠছে সেসব কার প্রভাবে তা আমি বুঝি। কার কাছ থেকে আস্কারা পেয়ে অনঘ এত জলদি বড় বেশি বেড়ে উঠেছে তাও জানি।'

'তোমাকে হঠাৎ এত বুঝতে জানতে কে সাহায্য করছে তা আমার অজানা নয়। তা না হলে কতদিন তো তোমাকেও বলতে শুনেছি, অনঘ সম্পূর্ণ অন্য জাতের। সে নাকি নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সত্যিকার মঙ্গল চায়। ওর মতো বন্ধুই নাকি আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বলনি? অস্বীকার করতে পারবে?'

'মনে নেই।'

'মনে থাকবে কেমন করে। নেশা আর নেশামুক্তিতে তুমি দু'রকম মানুষ যে। মার্তিকদা সবসময় অনঘদার নামে শাপশাপান্ত গালমন্দ করে তোমার দু' চোখের বিষ করে তুলেছে।'

মেয়েদের চোখের জলের দারুণ শক্তি। চৈত্রীর চোখ ছলছল করে ওঠে। জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে বিত্তেশ আশঙ্কিত হয়। সব কিছু ভুলে নরম হয়ে পড়ে। নিজেকে মানিয়ে নেয়।

এ ধরনের বিনা খরচের ভ্রমণে ট্রাভেলস কোম্পানির হয়ে অনেক কিছু কাজ করে দিতে হয়। তাছাড়া, নিজের জোগাড় করা যাত্রীদের প্রতি বাড়তি আলাদা দায়িত্ব কর্তব্য তো থাকেই। সেসব দিকে সামাল দিয়ে অনঘ কাছে এসে দাঁড়াতে বিত্তেশ বলে, 'রাত্রের খাবারের কী ব্যবস্থা হল তা কে জানে।'

সরাসরি জিগ্যেস না করায় অনঘ মনে মনে হাসে। ট্যুর পার্টিতে নানা মানসিকতার লোকজন জড় হয়। তাদের কাছ থেকে হরেকরকম ঝক্কি ঝামেলা গালমন্দ পাওনা থাকে। এসবে অনঘ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে সহজভাবে জবাব দেয়, 'সকলের পছন্দ বলে গরম খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাছেই পাঞ্জাবি-খানার হোটেলও আছে। কেউ চাইলে সে ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।'

বিত্তেশের কাছে খিচুড়ি খুবই প্রিয়। পাহাড়ি বাদলা শীতে খিচুড়ির খবর শুনে তাই খুব খুশি।

এতক্ষণ জমে থাকা রাগ ক্ষোভ নিমেষে উধাও। সানন্দে বলে, 'খিচুড়িই ভাল। আমরা তিনজনে একসঙ্গে বসে খাব।'
চৈত্রী জানত,চাহিদামত সকলের জন্যে পর্যাপ্ত ঘর পাওয়া যায়নি। তাই রাতের খাওয়া শেষ করে অনঘকে জিগ্যেস করে, 'আপনি কোথায় শোবেন?'
'যে কোনও জায়গায় শুলেই আমার ভাল ঘুম হয়। নো প্রবলেম অ্যাট অল। প্রয়োজনে স্টাফদের সঙ্গে কিচেনে কাটিয়ে দেব।'
'কিচেনে কেন? আমাদের ঘরেই থাকবেন।'
'তা কখনও হয়! তোমরা এখন কাস্টমার। সেইমতে ট্রিটমেন্ট প্রাপ্য।'
'হয় বন্ধু হয়।' অনঘকে জড়িয়ে ধরে বিত্তেশ চুমু খেয়ে বলে, 'এখানেই থাকবে তুমি। একসঙ্গে শোব তিনজনে।'
এখন যে অন্য বিত্তেশ তা বুঝতে পারে অনঘ। এত আন্তরিকতার কারণটা গন্ধতেই ধরা পড়ছে।
দীর্ঘদিন আগেই অনঘ আবিষ্কার করেছে, বিত্তেশের সংসারে অশান্তির নাভিমূলে আছে মদ। মদের নেশায় যখন অন্য বিত্তেশ তখনই বন্ধুবেশে সংসারে যত বেনোজল ঢোকে। বন্ধু নয়তো যেন সব সুখের পায়রা। অথবা, বসন্তের কোকিল যত। হিসেবের মেলামেশা; হিসেবে গরমিল ঘটলেই বিচ্ছেদ। অনঘ কতবার যে বলেছে, 'অনেক তো ভাসলে বিত্তেশ। বয়সও তো বাড়ছে, এবার ডুব দাও জীবন সত্যের গভীরে।' কিছুই কাজ হয়নি তাতে। বরং অযাচিত পরামর্শটাকে অনধিকার 'জ্ঞানদান' মনে করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।
এই মুহূর্তে অনঘের ভয় করছে। একটা অপ্রিয় ঘটনা মনে পড়ে যায়। ঘটনাটা শুরু হয়েছিল চৈত্রী আর বিত্তেশের মধ্যে খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি দিয়ে। তারপর তুমুল তাণ্ডব ভাঙচুর ফাটাফাটির একশেষ। এসব ঘটেছিল মার্তিকের সামনেই। অনঘ পৌঁছেছিল অনেক পরে। নিস্পৃহ উদাসীন মার্তিককে মিটিমিটি হাসতে দেখে অভিযুক্ত করেছিল, 'চোখের সামনে এত কাণ্ড ঘটে গেল! তুমি কী করছিলে?'
'দেখছিলাম, কতদূর গড়ায়।' নেশায় ভরপুর ঢুলুনি চোখে মার্তিক জবাব দিয়েছিল।
'ওরা দু'জনে জ্বলছিল, আর তুমি নির্লজ্জর মতো দেখছিলে আগুনটা কতদূর গড়ায়!'
'ঠিক তাই। তবেই না মজা। উত্তাপের আঁচ আমার দারুণ ভাল লাগে।'
সেইরকম একটা ঘটনার আশঙ্কা করে অনঘ। বিত্তেশের অসংযমী আচরণে চৈত্রীর চাহনিতে লজ্জা লক্ষ করে। এক্ষুনি অশান্তি শুরু হয়ে যেতে পারে ভেবে আগাম সামাল দিতে বলে,'পাহাড়ি শীতে এসব এক আধটু দরকার হয়ে থাকে। তুমি অযথা রাগ করছ চৈত্রী।'
শুনে বিত্তেশ খুব খুশি হয়। আনন্দ কৃতজ্ঞতায় অনঘকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'এই না হলে বন্ধু! একটু আগে খামোকা চৈত্রী আমাকে বকছিল। আমি যে মদ খেয়েছি তা নাকি তুমি টের পেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আসলে চৈত্রী এখনও তোমাকে ঠিকঠাক চিনে উঠতে পারেনি। ও জানে না যে, ইউ আর মাই রিয়েল ওয়েল উইশার। এ ট্রু ফ্রেন্ড। অন্য বন্ধুরা তো সব ধান্দাবাজ।'
'মার্তিকও?' সুযোগ বুঝে অনঘ প্রশ্ন করে বসে।
'অফকোর্স।' শালা মোদো মার্তিক এক নম্বরের ক্যারেকটারলেস। শালার নজরটাই খারাপ।

ও যে বাজে মতলবে বন্ধু সেজে আমাদের জন্যে দু'হাতে টাকা ওড়ায় তা আমি বেশ বুঝতে পারি।'
'ওসব কথা থাক বিত্তেশ।' কী বলতে আরও কী সব বেফাঁস কথা বলে ফেলবে সেই ভয়ে থামিয়ে দিতে অনঘ বলে,.'তোমাদের গভীর বন্ধুত্বের মাঝে আমি আসামি হয়ে দাঁড়াতে চাই না।'
'বলি, এত ভয় কীসের? সে আমার প্রেয় হতে পারে। তুমি বন্ধু শ্রেয়ঃ। নিঃস্বার্থের বন্ধু তুমি। মাঝে মাঝে তাই তো ভাবি, কেন যে আরও বহু আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।'
'কী হত তাহলে?'
'জীবনটা আমাদের সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যেত। সুখকর কল্যাণময় জীবন পেতাম।' বিছানায় আধশোয়া বিত্তেশ যেন ঘোরের মধ্যে বলে যায়,'উপনিষদ পড়েছ? পড়ে দেখো স্পষ্ট লেখা আছে, 'ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ভোগের জন্য প্রেয়, আর তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য শ্রেয়কে দরকার হয়। শ্রেয়কে গ্রহণ করলে কল্যাণ হয়।' তুমি আমার মুক্তিদাতা অনঘ। তোমাকে শত কোটি প্রণাম।'
নেশায় বেসামাল বিত্তেশ সত্যিই করজোড়ে প্রণাম করে। অস্পষ্ট আলোতেও ওর চোখে জল দেখা যায়। শেষের কথাগুলিতে অস্পষ্ট জড়তা দেখা দেয়। চৈত্রীর কোলের ওপর মাথা ঢলে পড়ে। বিড়বিড় করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লে চৈত্রী সযত্নে শুইয়ে দেয়। তারপর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। চৈত্রীর দু'চোখ চিকচিক করছে। বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে, 'এ আমি কাকে নিয়ে তীর্থে এসেছি অনঘদা?'
অনঘ প্রকৃতি পরিবেশ আর দেবস্থানের অপার মাহাত্ম্য বোঝাতে সচেষ্ট হয়ে বলে, 'ভোগ ঐশ্বর্য অনিত্য; এবং শোক দুঃখের কারণ স্বরূপ। তীর্থক্ষেত্র নিত্যানন্দময়। সেখানে পৌঁছাতে পারলে দেখে নিও, সব দুঃখ শোক দূর হয়ে যাবে। জাগতিক ভোগ বিলাসে বিত্তেশের নিশ্চিত অনীহা এসে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হবে। ভগবত সেবায় আকর্ষিত না হলেও হয়তো জীবন সত্য উপলব্ধি করতে পারবে।'
কিন্তু পরেরদিন সকালে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে বিত্তেশ আবার গোল বাধাল। গৌরীকুণ্ড পর্যন্তই বাসে আসা যায়। এখান থেকে কেদারনাথ মন্দিরের দূরত্ব পনেরো কিলোমিটার। চড়াই উতরাই অমসৃণ পার্বত্যপথ। নানা দাবিতে ধর্মঘট চলায় ডাণ্ডি কাণ্ডি কুলি ঘোড়া চলছে না। অগত্যা ভরসা বলতে দুটি পা আর একটি ছড়ি।
সব কিছু শুনে বিত্তেশ বিগড়ে গিয়ে বেঁকে বসে। মেজাজ তুঙ্গে তুলে বলে, 'কথা ছিল, ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পায়ে হেঁটে এত পথ? আমার পক্ষে অসম্ভব। পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারী মালপত্র, অধিকাংশ ঠাকুর চাকর গৌরীকুণ্ডে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা শুনে প্রস্তাব দেয়,'তীর্থে গিয়ে আমার কাজ নেই। চৈত্রীর পুণ্যতেই আমার হবে। আমাকেও রেখে যাও এখানে। আরামে খাব দাব মৌজ করব। ফিরতি পথে আবার সবার সঙ্গী হব।'
হাঁটাপথে বেলা বাড়লে কষ্ট বাড়ে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে জল ঝড়ের মধ্যেও পড়তে হয়।

সেক্ষেত্রে সন্ধ্যার আগে গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে কারণে, ছড়িদারের তাগাদায় দলের সকলেই ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে। বিত্তেশের বেখাপ্পা ব্যবহারে ক্ষুব্ধ বীতশ্রদ্ধ চৈত্রী ধৈর্য হারিয়ে বলে, 'জীবনে শুধু ভোগ আর ফুর্তিটাই চিনেছ। এর বাইরেও যে অন্য জগৎ আছে তা কিছুতেই জানতে চাও না। ভুল করেছি , তোমাকে নিয়ে তীর্থে এসে।'
চৈত্রীর চোখের জল বিত্তেশের কাছে একমাত্র দুর্বলতা, চৈত্রী তা বেশ ভাল করেই জানে। ওর বুক ভাসানো চোখের জল মহৌষধের সঞ্জীবনী কাজ করে। বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে বিত্তেশ যথেষ্ট উদ্যম নিয়ে তীব্রগতিতে হাঁটতে থাকে।
পাহাড়ের গা ঘেঁষে সর্পিল আঁকাবাঁকা চওড়া সরু পথ। কখনও মসৃণ, কখনও বন্ধুর। বেশিরভাগই চড়াই। ডানদিকে খাদের দিকে তাকালে ভয়ে বুক কাঁপে।
পুরো দলটা অনেক আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। সবার আগে ট্রাভেলস কোম্পানির তরফে পথ চেনাবার ছড়িদার। বিত্তেশ অনেকটা এগিয়ে আছে। দলের সবশেষে চৈত্রীর কাছাকাছি একমাত্র অনঘ। সামনে পিছনে পিঁপড়ের সারির মতো নারীপুরুষ যাত্রীজনের মিছিল।
ক্রমশ ক্লান্তি বাড়ছে। নরম রোদ্দুর আর বরফশীতল হাওয়াতেও ঘাম ঝরে। ইতিমধ্যেই হাঁপাতে শুরু করেছে অনেকে। দু'একজনকে পথ চলায় ক্ষান্ত দিয়ে কাঁদতেও দেখা যাচ্ছে। পথের দু'ধারে নানা গাছের অরণ্য। বিচিত্র বর্ণের ফুল পাখি লতা গুল্ম। নীল আকাশ সাদা মেঘ। পাহাড়ি ঝর্ণা, ঝোরা, নদী, উপতাকা, শস্যক্ষেত। কখনও সখনও কুটির, বসতি, মানুযজন।
অনঘ নিচু স্বরে আবৃত্তি শুরু করে, 'কে সে জানি না কে। চিনি নাই তারে—। শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তরের পানে.....।'
'রাত্রির অন্ধকার এখন কোথায় ?' চৈত্রী বলে, 'অন্য কিছু আবৃত্তি করুন।'
'অন্ধকার অর্থে অজ্ঞতা অজ্ঞানতা বোঝাচ্ছে'। অনঘ বলে, 'এসবের পর্দা সরাতে পারলে তবেই উত্তরণ এবং তাঁর দর্শন সম্ভব। বুঝলে ?'
চৈত্রী অজ্ঞের মতো নির্বাক হয়ে যায়।
অনঘ এখন তার দায়িত্ব কর্তব্যটা যেন একমাত্র চৈত্রীতেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। বিত্তেশ একা এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ছে। দূর থেকে অনঘ চৈত্রীকে লক্ষ করছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। ওরা দু'জনে কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাবার আগেই জোর কদমে হেঁটে ব্যবধান বজায় রাখছে।
এ ধরনের আকস্মিক অনিবার্য পদযাত্রায় ট্রেকিং-এর সাজ সরঞ্জাম সঙ্গে থাকার কথা নয়। স্বভাবতই অনঘের দু'বগলে দুটি পেল্লাই সাইজের ডাকব্যাকের ব্যাগ ঝুলছে। একটি বিত্তেশের। সেটা বেজায় ভারি । সে কারণে পায়ে পায়ে পাহাড়ি পথ চলায় অভ্যস্ত হয়েও অনঘ দারুণ ক্লান্তিবোধ করছে।
রামওয়াড়ায় জলপানের বিশ্রাম বিরতিতে বিত্তেশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নিজের প্রয়োজনে কাছে এগিয়ে আসে বিত্তেশ। অনঘের কাছ থেকে বর্ষাতিটা চেয়ে নিয়ে বলে, 'প্লিজ হ্যাণ্ডেল লাগেজ উইথ কেয়ার -মাই ফ্রেন্ড।'

'কেন? কী এত মহামূল্য ধনরত্ন আছে?' অনঘ কৌতূহলী প্রশ্ন করে।
'সে জিনিস রত্নের চেয়ে দামি। জীবন—আমার জীবন রাখা আছে।'
'ক'টি?'
'ছোট সাইজের ছ'টি। বাকিগুলি হৃষিকেশে রাখা আছে।'
'তাতেই এত ভারী!'
'টেপ রেকর্ডার আর ইয়াসিকা ক্যামেরাটাও যে আছে।'
'ক্যামেরা ভেতরে কেন? ফটো তুলবে না?'
'এখন আমার হাত কেঁপে যাবে। চৈত্রীর ফটো তোলার খুব সখ। পারলে তুমি তুলে দিও।'
অনঘ জল খাবে ভাবছিল, তা আর হল না। তার আগেই ওয়াটার বটলটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে বলে, 'ঘন ঘন তেষ্টা পাচ্ছে। এটা আমার কাছেই থাক।' তারপর দ্রুত পায় নিমেষে উধাও হয়ে যায়।
'দিলেন কেন?' চৈত্রী রাগ দেখায়, 'হাঁদারাম কোথাকার। তেষ্টা যেন শুধু ওর একার।'
'চটছ কেন?' অনঘ বোঝাতে চাইল, 'হয়তো ওর দরকারটাই বেশি। তবু তো আমি নিশ্চিন্ত ওর পা কাঁপবার কোনও আশঙ্কাই নেই। সুযোগটা আমার বগলের ব্যাগে বন্দি।
শীতের দাপট ক্রমশ অত্যাচারীর ভূমিকা নিচ্ছে। অনঘের গলায় মাফলার। মাথায় হনুমান টুপি। লং কোটে ঢাকা দীর্ঘ শরীর। চোখে রোদ চশমা। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে ক্যামেরাটা এখন গলায় ঝুলছে। দারুণ স্মার্ট লাগছে। চোর চোখে দেখতে দেখতে চৈত্রী একসময় বলেই ফেলে,'এই পোশাকে আপনাকে দারুণ সুন্দর লাগছে অনঘদা।'
অনঘের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হিসেবি হাসি ফুটে ওঠে। চৈত্রীর দিকে ফিরে তাকায়। চৈত্রীর মেদহীন শরীরে ভারী নিতম্ব, অনম্র বুক। ধারালো চোখ মুখ কমলা কোয়া ঠোঁট। গায়ে কোনও গয়না নেই। সুন্দর নকশা ছাপ চুড়িদার পরেছে। মানানসই আলোয়ানটা মাথা ঢেকে ঘুরিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর ফেলা। গলার কাছে কিছু খাটো চুল উঁকি দিচ্ছে। ভেতরে গরম পোশাক কতটা কী পরেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। মানানসই সাজতে জানে বলে যে কোনও পোশাকেই চৈত্রীকে দেখতে সুন্দর লাগে। এখনও লাগছে।
'আর তোমাকে কেমন লাগছে?' অনঘ প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস করে।
'সে তো আপনি জানবেন। নিজেকে দেখব কেমন করে?'
অনঘের মতে, রূপের অহংকার যে কোনও নারীর মহাসর্বনাশা বিপদ ডেকে আনে। নারীর সৌন্দর্য সে তো হরিণীর শিং-এর মতো। তাই যদিচ এই মুহূর্তে চৈত্রীকে দেখতে খুব সুরত বাদশাহী বেগমের মতো লাগছে অনঘ কিন্তু অন্য কথা বলে, 'আমার দেখাটা হয়তো তোমার মনের মতো না-হতেও পারে। ' তারপর বিভিন্ন দৃশ্যপটে অগুণতি ফটো তুলে দিয়ে বলে, 'পরে দেখে নিও নিজেকে নিজে।'
'অপনার চোখ দিয়েই তো প্রথম নিজেকে সত্যিকার দেখতে শিখেছি অনঘদা। তার আগে বুঝতাম না কী যে কুশ্রীতায় ডুবে ছিলাম। সেসব রঙ বেরঙের দিনগুলির কথা ভাবলে এখনও গা ঘিনঘিন করে ওঠে।'
'ভাব কেন তাহলে। অতীতকে ভুলে যাওয়াই তো ভাল।'

'ইচ্ছে করলেই কী ভোলা যায়? আবার এমন অনেক মন ছুঁয়ে যাওয়া কথা আছে যা কোনওদিন ভুলে যাওয়া উচিতই নয়। আপনার বলা তেমন কত কথাই তো আমার মনে গেঁথে আছে। বলব একটা?'
'কষ্ট দেয়া কথা নয়তো?'
'না। এই যেমন কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, 'যদি কোনও দিন রুগ্ন শীর্ণ শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাক—দেখে নিও চৈত্রী, সেদিন হয়তো একা এই অনঘদাকেই কাছে দেখতে পাবে। এমন কী বিত্তেশকে পর্যন্ত না-দেখতে পার।
'কবেকার কথাটা ঠিক হুবহু মনে আছে দেখছি!' অনঘ খুশিতে তৃপ্তির শ্বাস ছাড়ে।
'মনে থাকবে না আবার?' কৃতজ্ঞ চিত্তে চৈত্রী বলে, 'সেদিন থেকেই তো বুঝতে শিখেছি, ওর বন্ধুরা কেন যে এত বেশি ভালবাসে আমাকে।'
অনঘ দূর থেকে চিৎকার করে বিত্তেশকে ডাকে। ইশারায় ফটো তোলার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়তে বলে। প্রত্যুত্তরে বিত্তেশ ইশারাতেই বোঝায়, সে ফটো তোলাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। সে যথারীতি এগিয়ে চলে।
'দেখলেন তো আপনার বন্ধুকে?' চৈত্রী অনুযোগ দেয়, 'কেমন স্বার্থপরের মতো লাগেজটার সঙ্গে আমাকেও গছিয়ে দিয়ে একা আরামসে যাচ্ছে। আপনার এত কষ্ট দেখে ভীষণ খারাপ লাগছে।'
'কষ্ট হলেও পুণ্য তো আমারই হচ্ছে।'
'আপনি পাপ পুণ্য মানেন?'
'কঠিন প্রশ্ন। কতটুকু আর মানতে পারি। কত সময় তো পুণ্য করতে গিয়ে পাপী হয়ে যাই। তুমি মানো না?'
'কতটুকু আর বুঝি যে মানব? পাপের প্রসঙ্গ তুললে শ্রীরামকৃষ্ণ রেগে গিয়ে বলতেন, 'ঈশ্বরের নাম করলে পাপ আবার কী?' সেই বিশ্বাসে ঈশ্বরের নাম করি মাত্র।'
'আর বিত্তেশ?'
'ওসবে ওর বিশ্বাস নেই। সে জন্যই তো ওকে নিয়ে যত ভয়।'
'কীসের ভয়? শুদ্ধাভক্তিতে পুজো দিও। দেখবে, সব কিছু কেমন পালটে যাবে।'
মূল পথ ছেড়ে হঠাৎ ডানদিক বাঁক নেয় অনঘ। পায়ে পায়ে তৈরি হওয়া একফালি পথ ওপরের দিকে উঠে গেছে। তারপর বাঁয়ে বাঁক নিয়ে মূল পথের সঙ্গে মিশেছে। ঠিক মাথার ওপর উঁচুতে সেই মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে আছে বিত্তেশ। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অবাঙালি একজন লোকের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলছে। পিছন থেকে চুপিসাড়ে জাপটে ধরে অনঘ।
পথে অনঘের সঙ্গে যুগলবন্দি ফটো তুলতে চেয়েছিল চৈত্রী। অনঘ রাজি হয়নি। এখন তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। চৈত্রীর দু'পাশে অনঘ আর বিত্তেশ। অবাঙালি লোকটির নির্দেশমত দু'জনেই চৈত্রীর কাঁধে হাত রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। পিছনে ধূপছায়া স্বপ্নালি পাহাড়। শঙ্খশুভ্র বরফস্তূপের কিছুটা অংশে রোদ্দুর পড়ে স্বচ্ছ কাচের মতো লাগছে। নীলাভ সবুজের সমারোহ তো আছেই। দৃশ্যটা রমণীয়।
অবাঙালি লোকটি দক্ষ আলোকচিত্র শিল্পীর মতো পোজ নিয়ে সার্টার টিপে বললেন, 'ইট

উইল বি এ রিমার্কেবল শট। ইফ সো, প্লিজ মাইন্ড মি ফ্রেন্ডস। আই অ্যাম সুখলাল জয়সওয়াল ফ্রম ক্যালকাটা। সদর স্ট্রিটের বারটা আমার আছে।'

কলকাতায় ব্যবসা করতে গিয়ে সুখলালের ধারণা জন্মেছে, বাংলায় কথা বললে সহজেই বাঙালিদের কাছে আসা যায়। তাই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে শেষের কথাগুলি ইচ্ছাকৃত বাংলায় বললেন। চতুর চোখ চেয়ে চৈত্রীর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসলেন। চৈত্রীর চোখ মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ না করায় তাঁর স্মার্টনেসে ভাটা পড়ে। ক্যামেরাটা অনঘের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নিরুৎসাহে বললেন, 'ও কে সি ইউ। আবার দেখা হোবে।'

সুখলালের সঙ্গিনীটিকে দেখে বাঙালিই মনে হচ্ছিল। পরনে হাই নেক পুলওভার। জিনসের প্যান্ট স্কার্ফ। পায়ে বাটার নর্থ স্টার। লাস্যময়ী অঙ্গভঙ্গি। জিভ ঠোঁট চাহনিতে চটকদার মাদকতা। দেখেই মালুম হয়, ভীষণ কামুক প্রকৃতির রমণী। সব কিছু মিলেজুলে পতঙ্গ পাগল করা দুর্বার আকর্ষণ আছে।

অতি অল্প সময়ে সহজেই যে কোনও পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বিত্তেশ তাদের কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুখলালদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। বিত্তেশের 'কন্যা' রাশি বলেই চৈত্রী ভাবনায় পড়ে যায়। শোনা যায়, 'কন্যা' রাশির পুরুষদের নাকি রমণীভাগ্য ভাল। দেখছেও তাই, বন্ধুদের চেয়ে তাদের স্ত্রীদের কাছেই বিত্তেশ বেশি প্রিয়। কত অল্পতেই যে কোন মহিলাও ওকে ভালবেসে ফেলে।

ওরা তিনজনেই সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে অনেকটা দূরে এগিয়ে গেছে। একটা পাথরের চাঁই-এর ওপর বসে থেকে সেদিকে তাকিয়ে চৈত্রী বলে, 'আপনার বন্ধুটির কাণ্ডটা দেখলেন তো? জেনে রাখুন, আবার নতুন একটি বন্ধু জুটি জোটাল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে নির্ঘাৎ একদিন নেমন্তন্ন করে বসবে। আসর বসিয়ে ছাড়বে।'

'তাতে দোষের কী আছে?' অনঘের চোখে বিস্ময়।

'ওর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে কতজন যে এল গেল তার কী কোনও হিসেব আছে! কেউই শেষ পর্যন্ত সত্যিকার বন্ধু হয়ে টিকে থাকে না যে। তাই আর ভাল্লাগে না।'

'সুখলালদের নিয়ে সেরকম ভাবনার কোনও অর্থ আছে কী?'

'লোকটিকে আমার ভাল ঠেকল না। সঙ্গের মেয়েমানুষটি তো কোনও মতেই ওর বউ নয়। এ আমি হলপ করে বলতে পারি। দেখলেন তো বিত্তর গায়ে কেমন টোকা মেরে ন্যাকা ন্যাকা কথা বলছিল।'

'ফুর্তির জন্য কষ্টের জায়গায় আসতে যাবে কেন? বিত্তেশ সম্পর্কেও তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। বেড়াতে বেরিয়ে কত আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতাই তো দেখলাম। সে সব উচ্ছ্বাস ইমোশন রোমান্টিকতা পথেই পড়ে থাকে, ফিরে গিয়ে যে যার বৃত্তে হারিয়ে যায়। কেউ কোনও দিন যোগাযোগ রাখে না।'

অনঘের কথায় বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ দ্বীপ দেখতে পায় চৈত্রী। মাঝে মাঝেই বড় দুর্বোধ্য লাগে অনঘদাকে। নতুন কোনও বন্ধু জুটলেই বিত্তেশ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, এমন ভালমানুষ নাকি জগতে দ্বিতীয়টি আর হয় না। সেভাবেই অনঘদার

সঙ্গে পরিচয়। হ্যান্ডলুমের কুর্তা আর চুস্ত পাজামা পরা। চোখে ভারী কালো ফ্রেমের চশমা। বিলাস বিহীন ব্যক্তিত্বময় চেহারা। প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল। অনঘদা কেন যে অকৃতদার তা জানার জন্যে প্রবল কৌতূহল হলেও আজ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি। ফলে, ব্যাপারটা আজও রহস্যময় থেকে গেছে।

চৈত্রীর হাত ধরে টেনে তুলে অনঘ বলে, 'এভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকলে পা ভারী হয়ে যাবে। হাঁটতে আরও বেশি কষ্ট হবে যে।'

নিজের পায়ে শরীরের ভারসাম্য রাখতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে চৈত্রীর। অনঘের দিকে হাত বাড়িয়ে কাঁধে ভারসাম্য রেখে বলে, 'পা দুটো কেমন ঝিনঝিন করছে।'

কিছুক্ষণ ম্যাসেজ করে দিয়ে অনঘ বলে, 'এবার কিছুটা হাঁটলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আপনি আমার পায়ে হাত দিয়েছেন ভাবতে খারাপ লাগছে অনঘদা।'

'সে কী।' অনঘ ঠাট্টা রসিকতা করে, 'কারও ওপর রেগে গেলে তোমাকে বলতে শুনি যে,'আমার নাম চৈত্রী চক্রবর্তী। এই আমার পায়ে এসে পড়তেই হবে।' আমি না-হয় আগাম পায়ে পড়লুম।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'না, হালকা হাসি। হেসে দেখ, কত সহজে বাকি পথ ফুরিয়ে যাবে।'

'ফটোগুলো ভাল উঠবে অনঘদা?'

'মনে তো হচ্ছে।'

'মোটকা লোকটার কথামত তিনজনের ফটোটা যদি সত্যিই ফ্যানটাসটিক হয় তাহলে বড় করে বাঁধিয়ে রাখব। স্মৃতিচিত্র হয়ে থাকবে।'

'নীচে ক্যাপশন জুড়ে দিও—
যেতে তো হবেই একদিন
পূর্ব অথবা পরে, সকলেই যাব চলে
স্মৃতি নিয়ে শেষের সে জন সুখি রবে,
দুঃখ যখন যাবে ভুলে।'

'শেষের সে জন যেন কোনমতেই আমি না হই।'

'কেন?'

'দুঃখ পেতে চাই না বলে। আপনিও নিশ্চয়ই দুঃখ দিতে চাইবেন না।'

'আমি তো সব সময়েই চাই, 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু। সব্বে সত্তা পমুঞ্চন্তু।' সর্বজীব সুখি হোক। সর্বজীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক।'

'কাকে কোট করলেন?'

'বৌদ্ধ পালিমন্ত্রে আছে।'

'আজকাল কবিতা টবিতা লিখছেন?'

'ক্যাপশনটা শুনে বলছ তো? মনে মনে ওরকম ছক আমি অনেক কাটি। তাহলে শোনো আরেকটা,
পুত্র মরলে বড় দুঃখ
মদ খেল সে

ছাদে শুয়ে দেখল আকাশ।
বাড়িতে পূর্ণিমার পুজো
মদ খেল সে
বউটার নিরম্বু উপবাস।'
'এ তো তনুদা আর বিত্তকে নিয়ে লেখা।'
'ঠিক ধরেছ। তবে লেখা নয়, ভাবা কথা। অনেক সময় ছোটখাটো ঘটনা অনেক গভীরে নাড়া দেয়। তখন নানা রকম ভাবি। লিখিনি কোনওদিন।'
হঠাৎ বৃষ্টি আসে। প্রথম তুষারকণা ছড়ায়। তারপর ঝিরঝির টিপটিপ পাহাড়ি বৃষ্টি নামে। শিরশির বাতাসে কাঁপন ধরে।
দু'দুটি ভারী ব্যাগ আর ক্যামেরা সামলাতে গিয়ে অনঘের লং কোটটা ভিজে ভারী হয়ে ওঠে। চৈত্রীর পায়ের ফোস্কা ফেটেছে অনেক আগেই। জুতো ভিজে জলের ছোঁয়ায় যন্ত্রণাটা চিড়বিড়িয়ে ওঠে। নাক কান যেন অসাড় হয়ে আসছে।
পিচ্ছিল পথে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে অনঘের গায়ে ঝুঁকে পড়ে চৈত্রী। ওর হাত কাঁধ কোমরে হাত রাখে অনঘ। নানা হাসি ঠাট্টাচ্ছলে চাঙ্গা রেখে পথ চলতে সাহায্য করে।
অনেক আগে গরুড় চটিতে পৌঁছে মৌজ করে চা খাচ্ছে বিত্তেশ। সুখলালরা বৃষ্টির ভয়ে একটা ঝুপড়িতে ঢুকেছে। এখানেই রাত কাটাবে। ঝুপড়ির দাওয়ায় বসে আঁকাবাঁকা খাড়াই পথের দিকে তাকায় বিত্তেশ। চটিটা অনেক উঁচুতে টিলার ওপর। তাই অনঘ চৈত্রীকে ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। যেন স্বপ্নময় দূরত্ব থেকে দুটি সিক্ত আলিঙ্গনাবদ্ধ নারী পুরুষ ক্রমশ ক্লোজ আপে কাছে এসে দাঁড়ায়।
'খু-উ-ব কষ্ট হচ্ছে বন্ধু? এসো, বসো। গরম চা খাও সব ঠিক হয়ে যাবে।' ক্লান্ত অবসন্ন বিধ্বস্ত অনঘকে উদ্দেশ্য করে বিত্তেশ বলে।
'ঠাট্টা করছ বিত্ত!' মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে চৈত্রী বলে, 'দু'দুটো বোঝা মানুষটার কাঁধে। আর তুমি কিনা বলছ কষ্ট হচ্ছে?'
'দু'টো নয়, বলো তিনটে।' বিত্তেশ হালকা রসিকতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, 'সাধে কী আর তিনি বলেছিলেন, 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নইলে খরচ বাড়ে।' বুঝলে অনঘ, পথে মেয়েরাও একটি বোঝা বিশেষ।'
'তাই বুঝি সেই বোঝাটাকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ?' চৈত্রীর কণ্ঠ আরও রুক্ষ হয়, 'লজ্জাও করছে না বলতে। ইনহিউম্যান। অন্যের কষ্টটা কোনওদিনই তুমি বুঝতে শিখলে না। নিশ্চিন্ত আরামে বেশ মজাতেই আছ।'
'দোষটা আমার কীসে?' গভীরে যাওয়া অভ্যাস নেই বিত্তেশের। বিন্দুমাত্র রাগ না করে হালকা মেজাজেই জবাব দেয়, 'ওরাই তো লিখেছে,'ভ্রমণসুখ নিশ্চিন্ত আরামে। ভ্রমণের সঙ্গী, প্রিয়সঙ্গী ট্রাভেলস।' সুতরাং তোমার যা কিছু অভাব অভিযোগ অভিমান তা জানাতে হবে প্রিয় সঙ্গীটিকেই।'
বিত্তেশের কাছ থেকে আশ্চর্যরকম নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞ ব্যবহারে চৈত্রী ভাবনায় পড়ে যায়। কোথায় যেন পড়েছিল, দুষ্টবুদ্ধি পুরুষ অন্যের কষ্টের কথা চিন্তা করে না। অপরকে কষ্ট দিয়ে

পাপকেই নাকি পাথেয় করে নেয়। নানা অশুভ আশঙ্কায় অনুযোগ দেয় চৈত্রী, 'প্রিয় না হলেও অনঘদা তোমার বন্ধু-সঙ্গী তো বটে। ওঁর কষ্টটা তুমি ছাড়া আর কে বুঝবে?'

'এত কষ্ট হচ্ছে কেন ওর? কই আমার তো হচ্ছে না। নিশ্চিত কোনও পাপ করেছে। পাপের বোঝা ওর সাজা। বুঝুক এখন কেমন মজা।'

অনঘ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। বিত্তেশের কথায় বিমর্ষ বোধ করে। ভাবে, কী বোঝাতে চাইছে বিত্তেশ? নাকি নিছকই রসিকতা কে জানে। বুঝতে পারলে একটা জুতসই জবাব দেয়া যেত, কে বইছে কার বোঝা?

চৈত্রী অপ্রস্তুত। অনঘের মুখের দিকে তাকিয়ে বিত্তেশের ওপর রাগ হয়। বিত্তেশকে বলবে বলে কুশ্রী কথাও মনে আসে। কিন্তু, নিজেকে সংযত রাখে।

গরুড় চটি থেকে কেদারনাথ মন্দিরের দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার; অথচ চৈত্রীর মনে হচ্ছে, বোধহয় তিরিশ কিলোমিটার হবে। তা না হলে কিছুতেই শেষ হচ্ছে না কেন। শেষ পথটুকু যদিও তিনজনে একসঙ্গে হাঁটছে কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছে না। অনঘ হাঁটছে চৈত্রীর সঙ্গে ফারাক রেখে। বিষণ্ণতায় ভরা ওর চোখ। মুখে একরাশ মেঘ।

চৈত্রীর চোখেও জলভরা মেঘ জমাট বেঁধে উঠেছে। দেখে মনে হচ্ছে, যে কোনও সময় বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি নেমে পড়তে পারে। রেগে গেলে চৈত্রীর শরীরের সব রক্ত যেন মাথায় উঠে আসে। তখন বেসামাল হয়ে লাগামছুট যাচ্ছেতাই কথা বলে ফেলে। স্থান কাল পাত্র কিছু মনে রাখে না। সেই প্রলয়ঙ্কর মুহূর্তের আশঙ্কায় ভীত বিত্তেশ তড়িঘড়ি অনঘের কাছ থেকে নিজের ব্যাগটা ফেরত চায়।

অসম্ভব গম্ভীর অনঘ ম্লান হাসে। তারপর শৈত্যপ্রবাহের স্পর্শকাতর কথায় জবাব দেয়, 'পাপ পুণ্য কতটুকু করেছি তা জানি না। তাই বলে বাড়তি পুণ্যের সুযোগটুকু শেষ মুহূর্তে হাতছাড়া করতে চাই না।'

বিত্তেশ নতুন করে কথা বাড়ায় না।

কেদারনাথে থাকার আগাম ব্যবস্থা দেখে বিত্তেশ খুব খুশি। পাকা ঘর। অ্যাটাচ বাথ। দু'জনের মোটামুটি চলে যাওয়ার মতো একখানা চৌকি। ছোট্ট টুল টেবিল। পর্দাঢাকা কাচের জানলা। দেয়ালে সাঁটা একখানা আয়না। মেঝেয় পাতা ভারী কার্পেট। পর্যাপ্ত গাদ্দার ব্যবস্থা। মাথাপিছু দু'খানা করে কম্বল বরাদ্দ।

আকাশে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। রুপোলি জ্যোৎস্নার বন্যা বইছে। চারিদিকে দুধসাদা তুষার ঢাকা পাহাড়। মাঝে অভ্র-ঝিকমিক আলোকিত উপত্যকা, ঘরবাড়ি। কেদারনাথের মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্ট।

বাইরে বারান্দায় নিষ্পলক বিস্ময়ের চোখ চেয়ে চৈত্রী দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতির অপার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দেখছে। যেন প্রেম ভালবাসা পবিত্রতার গন্ধময় বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছে। পরম কিছু প্রাপ্তির অব্যক্ত আনন্দে চোখের কোণে জল চিকচিক করে ওঠে। আজ পূর্ণিমার উপবাস। অনভ্যস্ত এতটা পথ পায়ে হেঁটে আসায় ভীষণ ক্লান্ত অবসন্ন লাগছে। হিমেল হাওয়ায় দাঁত

ঠকঠক কাঁপন আসে। ব্যথা অবসাদ তো ছিলই। এখন মনে হচ্ছে, বোধহয় জ্বর আসছে। তাই বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত মনে করে না।
পছন্দমতো ঘর পাওয়াতে বিত্তেশ দারুণ উৎফুল্ল উচ্ছ্বসিত। সে এখন টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফুর্তিতে চটুল গান গাইছে। হাতের মুঠিতে শূন্য বোতল। গোটা একটা বোতলের মেজাজে সে শ্রীচৈতন্যের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে নাচছে। টেবিলের ওপর রেখে যাওয়া রাতের খাবার। কখন যে কে রেখে গেছে টের পায়নি।
এই মুহূর্তে বিত্তেশের শরীরে মত্ততার চূড়ান্ত। ভয়ঙ্কর হিংস্র ক্ষুধার্ত চোখে যেন লকলক লালসার আগুন জ্বলছে। বীভৎস কুৎসিত লাগছে দেখতে।
বয়সের স্তরভেদে মেয়েরা যথাক্রমে পুরুষের রূপ অর্থ গুণ দেখে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কিশোরী চৈত্রী সেই স্বাভাবিক নিয়মে বিত্তেশের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। বাড়তি মেদহীন দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর স্বাস্থ্য। আকর্ষণীয় নাক চোখ ঠোঁট চুল গোঁফ। দুধে আলতা গায়ের রং। যেন সিনেমা নাটকের রোমান্টিক নায়কের মতো সুশ্রী সুন্দর বিত্তেশ। বিয়ের আসরে কতজনেই তো বলেছিল, 'সাক্ষাৎ কার্তিক যেন।' জুটি দেখে অনেকেরই মন্তব্য, 'মেড ফর ইচ আদার। এক দুজে কে লিয়ে।' শুনে এই যেন সেদিনও চৈত্রীর বুক ভরে যেত। ইদানিং সেই বুকে কেমন যেন শূন্যতার চোরাবালি সৃষ্টি হয়েছে মনে হয়।
চৈত্রী কখন যে ঘরে ঢুকেছে তা এতক্ষণ টের পায়নি বিত্তেশ। এবার দেখতে পেয়ে দু'হাত বাড়ায়। কাছে টেনে বুকে নিতে চায়।
'ন্না ন্না ন্না।' বাধা দিয়ে চৈত্রী বলে, 'এ কী ছেলেমানুষী করছ বিত্ত। দেবস্থানে এসেছি। আজ আমার পূর্ণিমার উপোস। এসব সুযোগের জন্যই বোধহয় ছেলেকে রেখে এসেছ?'
'এতে অন্যায় কী আছে?' বিত্তেশ অবাক হয়ে বলে, 'আমি তো তোমার জেনুইন স্বামী। দেবতাও বলতে পার।'
বিত্তেশ কোনও বাধা মানে না। জোর করে টেনে চৈত্রীর বুকের উপত্যকায় ঠোঁটের পাপড়িতে দংশন করে। লজ্জা ঘৃণা অপরাধবোধে পরাস্ত হতে হতে চৈত্রী দেখে, এই সেই অন্য বিত্তেশ। বাইশ বছর ধরে যে তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে। কখনও বা জোর করে ধরে মদ খাইয়ে দিয়ে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। তারপর পতিতাদের সঙ্গে যথেচ্ছ অশালীন ব্যবহারের মতো আরাম আনন্দ পেতে চায়। বাধা দিয়ে আপত্তি জানালে বলে, 'স্বামী স্ত্রীর দেহ-সম্পর্ক কোনও পূজার্চনা নয়। খেটে খাই, ষোলো আনা তৃপ্তি চাই।'
সাঁড়াশির মতো বজ্র আঁটুনির মধ্যে নখের আঁচড় দাঁতের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত চৈত্রী। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, 'ইতর জানোয়ার, আমি ঘেন্না করি তোমাকে।'
মত্ততায় দরজার ছিটকিনি বন্ধ করতে ভুলে গেছে বিত্তেশ। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে খবর নিতে এসে অনঘ অনর্থ বাধায়। কাম চরিতার্থের সময় বাধা পেলে কোনও তফাৎ থাকে না মানুষ আর পশুতে। উভয়েই ভয়ঙ্কর হিংস্র জিঘাংসু হয়ে ওঠে।
রাগ ক্ষোভ অসন্তোষে বিত্তেশ রূঢ় ভর্ৎসনা করে ওঠে, 'এত রাত্রে তুমি শালা আবার কোন মতলবে?'
করুণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে অনঘ। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। চৈত্রী যেন সম্মুখে ত্রাতা ভাগবানকে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়।

'দোহাই অনঘদা, আজকের রাতটুকু এখানেই থাকুন। নয়তো কিছু একটা অঘটন ঘটিয়েই ছাড়বে।' চৈত্রী প্রার্থনা জানায়।
'না থাকবে না।' চৈত্রীর গালে তীব্র চড় বসিয়ে বিত্তেশ বলে, 'শুধু আমরা দু'জনে থাকব। প্রাইভেটলি। থার্ড পার্টি নট অ্যালাউড।'
'এ কী নোংরা মাতলামি করছ বিত্তেশ।' শান্ত সংযত করতে অনঘ বলে, 'লোকজানাজানি হবে যে।'
'চোপ শালা।' অনঘের চুলের মুঠি ধরে বিত্তেশ রাগ ক্ষোভ জ্বালা প্রকাশ করে, 'রাত্রে থাকতে চাও কোন মতলবে—অন্যের বউ-এর সঙ্গে ফুর্তি মারতে? শালা ছুপা রুস্তম। পাপ, পুণ্য বোঝাতে তীর্থে নিয়ে এসেছ? মনে করছ, তোমার নষ্টামি আমি কিছু বুঝি না, তাই না?'
নেশা উত্তেজনায় পা টলতে টলতে মেঝেয় পড়ে যায় বিত্তেশ। উবু হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে খিস্তি দেয়। তারপর কণ্ঠস্বর পোড়া সলতের মতো স্তিমিত নিস্তেজ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।
এরকম অপমানজনক কুশ্রী পরিস্থিতির জন্য অনঘ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। এত প্ররোচনা সত্ত্বেও নির্বোধ শিশুর মতো ঘুমন্ত বিত্তেশকে দেখে দুর্বল হয়ে পড়ে। যত্ন করে ওর মাথার নীচে বালিশ গুঁজে দেয়। স্বাভাবিকভাবে শুইয়ে কম্বল ঢাকা দেয়।
চৈত্রীকে এখন বেহুঁশ ধর্ষিতার মতো লাগছে। শীতে কুঁকড়ে থাকা দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। রক্তঝরা ঠোঁট মুছে দিতে গিয়ে জ্বরের স্পর্শ পায় অনঘ। পায়ের নীচে হাত রেখে পরখ করে দেখে। হিম শীতল ঠাণ্ডা অনুভব করে বুঝতে পারে, নিশ্চিত জ্বর বাড়বে।
নিজের গায়ের চাদর দিয়ে চৈত্রীর পা দুটো জড়িয়ে রাখে অনঘ। ঠিকঠাক শুইয়ে দিয়ে নিজের জন্য বরাদ্দ কম্বল দু'খানাও ওর দেহে চাপিয়ে দেয়। নাক কাঁধ ঠোঁটের ক্ষতে ওষুধের স্পর্শ পেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে চৈত্রী। মুখের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ ভেসে আসে। হাতের চেটো দিয়ে পায়ের পাতায় হাত ঘষে অনঘ। আরামদায়ক স্পর্শ পেয়ে চৈত্রী উঠে বসে। অনঘকে জড়িয়ে ধরে। সুখ, কৃতজ্ঞতা, ভালবাসায় বলে, 'এত লাঞ্ছনা অপমান সত্ত্বেও লম্পট শয়তানটাকে তুমি কেন যে ছেড়ে যাচ্ছ না তা বুঝি না অনঘদা।'
অনঘকে এই প্রথম 'তুমি' বলে ফেলল চৈত্রী। চোখের জলের উষ্ণ স্পর্শ পায় অনঘ। সেই উষ্ণতা দাবানলের মতো সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে চায়। অনঘ বলে, 'আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি চৈত্রী। কাঁদে না লক্ষ্মীসোনা।' তারপর চিবুক তুলে ধরে বোঝায়, 'আর কখনও স্বামী সম্পর্কে ওসব অশ্রদ্ধার কথা বোলো না।'
'চরিত্রহীন পুরুষকেও পুজো করতে বলছ অনঘদা? এ কেমন ধর্মকথা?'
'কীসের ভিত্তিতে এসব কথা বলছ তা জানি না।' অনঘ সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করে, 'জগতে আমিষ ভোজন, সুরাপান আর নারী সম্ভোগ প্রাণীমাত্রেরই চির ঈপ্সিত। এসব ব্যাপারে শাস্ত্রের কোনও অনুশাসন নেই। কথাটা আমার মনগড়া নয়, শাস্ত্রতেই আছে। আসলে তিনভূমিতে আসক্ত বিত্তেশ এতকাল সংসার সীমায় আবদ্ধ ছিল; তাই বাইরে এসে

হাঁপিয়ে উঠেছে। ভোগবিলাসী মানুষেরা মাঝে মাঝে স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করে বসে। তাই বলে আসল মানুষটাকে চিনতে ভুল করলে চলবে কেন। সৎসঙ্গ আর ভালবাসার বড় অভাব ওর। একটু টেন্ডারলি হ্যান্ডেল করে দেখো, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

'অনেক চেষ্টা করে দেখেছি। আমার চেয়ে কোনও ভাল সঙ্গী যে ওর জীবনে কেউ হতে পারে না—এই সহজ সত্যটা কিছুতেই ওকে বোঝানো গেল না। আজকাল কেন জানি না আমাকে আর আগের মতো ভালবাসে না। কী কারণ থাকতে পারে অনঘদা?'

'ভালবাসলে যে বিয়ে করতে নেই তা অনেকেই জানে না। তাছাড়া, দাম্পত্য জীবনে দেহটা মুখ্য হয়ে দাঁড়ালে সত্যিকার ভালবাসা হারিয়ে যেতে থাকবে—এ আর বিচিত্র কী! তাই বলে কী বিক্তেশ তোমাকে ভালবাসে না? ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেছ বলেই সব কিছু ঠিকঠাক বুঝতে পার না।'

'আমাকে তুমি ভালবাস অনঘদা?'

ঘরের ভেতর হঠাৎ যেন একঝলক বিদ্যুৎ চমকায়। হলকা হাওয়ার স্পর্শ পায় অনঘ। কিন্তু আচমকা প্রশ্নটায় তেমন কোনও ভাবান্তর ফুটে ওঠে না। প্রতিক্রিয়াটা মাটির গভীরে শুষে নেয়া জলের মতো।

'বুঝতে পার না?' অনঘ পাল্টা প্রশ্ন করে।

'বুঝি তো। কিন্তু সেই ভালবাসাটা যে কী জাতের কোন স্তরের তা কিছুতেই ধরতে পারি না?'

অনঘের ঠোঁটের কোণে মৃদু স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে। চৈত্রীকে সযত্নে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে। তারপর চুলের অরণ্যে হাত বুলিয়ে কপালে ঠোঁট ছোঁয়ায়। বলে, 'বুঝে নাও কেমন ভালবাসি?'

এতক্ষণ চৈত্রীর নাকের পাটা ফুলছিল। ফুটন্ত ঠোঁটের পাপড়ি কাঁপছিল। এবার বন্ধ কপাট চোখের কোণ বেয়ে জলের ঢল নামে। গভীর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে বলে, 'বুকে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে অনঘদা।'

সারারাত শিয়রের কাছে বসে থেকে চৈত্রীর কপালে হাত বোলায় অনঘ। কিন্তু তার ইন্দ্রিয়গুলি বিস্ময়কর শান্ত, সমাধিস্থ। প্রশান্ত, প্রসন্ন সে যেন কোনও এক গভীর রহস্যময় সৌন্দর্যের জগতে পৌঁছে যেতে থাকে। সেখানে কাম ক্রোধ লজ্জা লোভ বলে কিছু নেই। শুধু শান্তি আর শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্রতা। গভীর রাত্রির বরফজমা শীতে যদিচ তার শীতবস্ত্রের প্রায় সবগুলিই এখন চৈত্রীর শরীর জুড়ে রয়েছে, তবু এতটুকু শীতের স্পর্শ পায় না। বরং অনির্বচনীয় স্বর্গীয় সুখের উত্তাপ পেতে থাকে। ভীষণ উত্তাপ।

গীতিময়

বাস থেকে নেমে অনেকটা পথ। না হাঁটলে রিকশা ভ্যানই ভরসা। তা পা ঝুলিয়ে বসে মন্দ লাগল না। চলতি পথের দু'ধারে শাল, শিমূল, মহুয়া, সেগুন গাছের জঙ্গল। পাইন দেবদারু ঘেরা একটি টিলা। তারপর নির্জন রাস্তা। সকালের নরম রোদ্দুর। মাথার ওপর উদার আকাশ। খোলা জলাজমি, শস্যক্ষেত, সবুজের সমারোহ, সামুদ্রিক বাতাসে দূরে অলক্ষ্যে ঝাউবনে ঝিরঝির শির শির শব্দ।

বিস্তর এলাকা জুড়ে পাঁচিল ঘেরা জমির মাঝে দোতলা বাড়িটা পুরনো আমলের। ফটকের স্তম্ভে শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা, শান্তিময়। অপর স্তম্ভে ছোট্ট বোর্ড ঝোলানো। তাতে লেখা, ঘর ভাড়া পাওয়া যায়।

গীতা ঠিক এমনটিই শুনেছে। মিলে যেতে নিশ্চিন্ত মনে রিকশা ভ্যানের ভাড়া মেটাল। শক্ত রাবারাইজড প্লাস্টিকে ঝোলানো স্কাইব্যাগটা কাঁধে ফেলল। তারপর ফটকের প্রহরীকে জিজ্ঞাসাবাদে ভেতরে ঢুকল।

এখন পথের দু'ধারে ইউক্যালিপটাস আর নারকেল গাছের সারি। ইতস্তত রূপময় ঝাউ আর সুপারি, খিরিশ ইত্যাদি গাছ। ফুলের বাগান। গোলাকার ফোয়ারা। পাখনাঅলা পরীর মর্মর মূর্তি। কিছুটা জায়গা জুড়ে সব্জি ক্ষেত। পাশেই পুকুর। সীমানার এককোণে ঘন জঙ্গল। তারপর কাঁটালতা কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা সরকারি জঙ্গল অরণ্যভূমি।

ফুল বাগানের কাজ থেকে উঠে এসে সম্মুখে দাঁড়ানো উদোম গায়ের পুরুষটিকে প্রথম দর্শনেই গীতি সবিশেষ মুগ্ধ। অনুমান করল, পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বয়স। মেদহীন দীর্ঘদেহী। উন্নত স্কন্ধ নাসা পেটানো শরীর। সবকিছু মিলে এখনও তরুণ হিম্যান চেহারা।

আমি মিস্টার মণিময় চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে গীতি সহজ হেসে বলল।

যথার্থ ব্যক্তির সঙ্গেই কথা বলছ। মণিময় ভুরু কুঁচকে বললেন, থানা থেকে অনুমতি পত্র আনা হয়েছে তো? ইদানীং নিয়ম হয়েছে, হোটেল হলিডে হোম যে কোনও জায়গায় একা থাকতে হলে এই অনুমতিটা জরুরী।

সেভাবে থাকতে আসিনি। গীতি ঝটিতি মণিময়কে প্রণাম করে ঠোঁট টিপে হাসল, আমি সাগ্নিকের কলেজ-বন্ধু গীতালি। ডাক নাম গীতি।

সাগ্নিক কোথায়? বাঁকা দৃষ্টিতে মণিময় জিজ্ঞেস করলেন।

এখানে আসেনি বুঝি! গীতি কিছুটা নিরাশ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, সুকীয়া স্ট্রীটে ফোন করেছিলাম। শুনলাম, হি ইজ আউট অব স্টেশন। ওখানে না-থাকলে নাকি এখানেই আসে। সেই বিশ্বাসে রাতের বাস ধরে চলে এসেছি।

নিজের বাড়িতে কি বলে এসেছ? সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে মণিময় প্রশ্ন জুড়লেন।

সে সব প্রব্লেম নেই। গীতি নিষ্পাপ খিলখিল হেসে জবাব দিল, সাগ্নিকের সঙ্গে কলেজে পড়েছি সেই কবে। এখন আমি নিউ আলিপুরে এক ভদ্রমহিলার পেয়িং গেস্ট। হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ছি।

নাইট জার্নি করে এসেছ, আগে ফ্রেস হবে চল। মণিময় স্নিগ্ধ স্নেহ বিশ্বাসে গীতিকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পেয়িং গেস্ট থাকছ কেন?
উপায় কি! গীতি অকপটে জানাল, বাবা ঘাটশিলায় চাকরি করতেন। রিটায়ারমেন্টের আগে গালুডিতে বাড়ি করেছেন। আমাদের কোনও ভাইটাই নেই। দু'বোন। দিদির বিয়ে কলকাতায় হলেও বাবার ইচ্ছেতে হোস্টেলে থেকেই কলেজে পড়েছি।
সাগ্নিক সুকীয়া স্ট্রীটে না-থাকলে একমাত্র এখানেই আসে, এমন কথা তোমাকে কি ও নিজে বলেছে? মণিময়ের প্রশ্নে বিস্ময়।
তা নাহলে আমিই বা এভাবে আসতে যাব কেন? গীতি কপট বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, আমি নিজেও রীতিমতো সঙ্কোচ বোধ করছি।
তাই নাকি? কোনওরকম লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করবে না। মণিময় দৃঢ়তার সঙ্গে বোঝালেন, আসলে আমি কিন্তু সাগ্নিক তোমাকে সত্যি কথা বলেনি বলেই ক্ষুব্ধ। সে এখানে ক্বচিৎ কদাচিৎ আসে। এক দু'দিনের বেশি থাকে না। কলকাতার কোলাহল ধুলো গন্ধ নোংরা যান্ত্রিকতা ইত্যাদিই ওর বেশি পছন্দ।
হয়ত এখানে একা বোর ফিল করে, তাই—
বুঝেছি। সাগ্নিকের পক্ষ নিয়ে গীতির জবাবে মণিময় স্মিত হেসে বললেন, ওকে যে তুমি কতটা ভালবাস তা অনুমান করতে পারছি।
গীতির নীরব চোখে হরিণীর লাজুকতা।
চকচকে উজ্জ্বল রঙা স্কার্ট পরেছে গীতি। কলারে সাদা লেসের কাজ করা। কাঁধ অব্দি ছাঁট রুখুসুখু চুল। দীঘল মেদহীন শরীরে কোনও অলংকার নেই। কপালে টিপ। মণিবন্ধে ঘড়ি। থুতনিতে তিল। নিটোল বুক। আকর্ষণীয় ঠোঁট, নিতম্ব, নাক। মুক্তোর মতো দাঁত। খঞ্জন পাখির মতো চোখ। গায়ের রং চাপা ফর্সা।
মণিময় মনে মনে সাগ্নিকের পছন্দের তারিফ করলেন। গীতিকে যথার্থ আন্তরিকতায় বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। ওর থাকার ঘর দেখালেন।
দোতলায় ডবল বেডেড ঘরটা বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সবই আছে। দেয়ালে বিশাল আয়নাঅলা ওয়াড্রব আলমারি। আছে, চেয়ার, টেবিল, টিভি। ফুলছাপ পর্দা বেডকভার বালিশের ঢাকনা। আছে, কম্বল মশারী। সংলগ্ন বাথরুম।
গীতি পর্দা সরিয়ে একে একে সব জানলা খুলল। আলো বাতাস ঢুকে খেলা শুরু করল। এখন গীতির সুমুখ দিকে অশান্ত সমুদ্র। ডাইনে স্থির অরণ্য। বাঁয়ে দূরে গড়ে ওঠা জনপথ। হোটেল রেস্তোরাঁ, দোকান বাজার। পার্ক বাসগুমটি ব্যবসাকেন্দ্রিক অফিস আর আবাস। সব কিছুই চোখ ধাঁধানো।
গীতি পরিচ্ছন্ন হয়ে স্নান সেরে শিফনের স্লিভলেস সালোয়ার পরেছে। গোড়ালি অব্দি কামিজের ঝুল। ম্যাচিং ওড়না। তেল সাবান পারফিউমে শরীরের সুবাস যেন মৃগনাভি। দু'কাপ কফি হাতে মণিময় হাজির।
আমি তো যাচ্ছিলামই। সঙ্কোচের সঙ্গে নিজের কাপ নিয়ে গীতি বলল।
নাইট জার্নি করে এসেছ তাই বানালাম। নিরহঙ্কারী মণিময় বললেন,তা নাহলে এখন আমার বাদামের সরবত খাওয়ার সময়।

দারুণ হয়েছে। কফিতে চুমুক দিয়ে গীতি জিগ্যেস করল, রান্নাবান্না কে করে?
ভোজন রসিক আমি নিজেই করি। ট্যুরিস্ট লোকজন চাইলে চন্দ্রা ওদের সঙ্গে আমার রান্নাও করে।
চন্দ্রা থাকে কোথায়?
কাছেই, ঝুপড়িতে। চায়ের দোকানও চালায়। খাবার টাবারও করে। এখনকার মতো ওখান থেকেই তোমার সকালের খাবার আসবে।
ওর স্বামী আছে?
আছে একজন। মণিময় প্রতিক্রিয়াহীন সপ্রতিভ জবাব দিলেন, স্বামী কিনা জানি না।
কি করে সে?
দালালি। মণিময় বিরক্তিবিহীন শোনালেন, দূরপালার বাসে ট্যুরিস্ট এলে বিভিন্ন হোটেল লজে নিয়ে যেতে পারলে কমিশন পায়। অনেক সময় আমাকেও খদ্দের এনে দেয়। সেই সূত্রে রোজ একবার চন্দ্রার আসা অভ্যেস হয়ে গেছে। আমি না চাইলেও অনেক কিছু কাজ করে দেয়। আজকাল আবার অনেক ব্যাপারে খবরদারি শুরু করেছে।
আজ আমি রান্না করব। গীতি উচ্ছ্বসিত উৎসাহ দেখাল।
তুমি! অবাক মণিময় মন্তব্য করলেন, একালের শিক্ষিতা মেয়েরা রাঁধতে উৎসাহী ভাবতে ভাল লাগছে।
আমি যে একটু অন্যরকম। আবেগের ছটা ছড়িয়ে গীতি বলল, এখানে আসার সেটাও একটা কারণ। আমার পছন্দ অনেকটা তোমার মতন।
কম বয়সীরা অনেক সময় 'তুমি' বললে শ্রুতিমধুর লাগে। অনেক কাছের স্নেহের আপনজন মনে হয়। মণিময়েরও তেমনি অনুভূত হচ্ছিল।
আমার পছন্দ তুমি জান? মণিময় মুগ্ধ চোখে তাকালেন।
খুব বেশি না। অনেকটাই অনুমান নির্ভর। কিছুটা সোনালি কল্পনা।
আর একটু খোলসা করে বল। মণিময়ের চোখে অবাক কৌতূহল।
এখানে ভাল লাইব্রেরী আছে। গ্রামোফোন ডিসক থেকে হালের সি ডি ক্যাসেট মিউজিয়াম। পেইন্টিং ফটোগ্রাফির স্টুডিও। সেইসঙ্গে বাগান করার নেশা আছে তোমার। অর্থাৎ কিনা সদা আনন্দময় থাকার সব উপকরণ ঠাসা।
কোথায় যেন পড়েছিলাম। মণিময় অনুপ্রাণিত হয়ে বললেন, যদি একদিনের জন্য আনন্দ পেতে চাও তাহলে অপেরায় যাও। এক বছরের জন্য আনন্দ চাইলে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। সবশেষে লেখা ছিল, সারা জীবন আনন্দে থাকার ইচ্ছে হলে বাগান কর।
সেইসঙ্গে সঙ্গী চাই বই গান আর কিছু সৃষ্টির প্রচেষ্টা। এসবই তোমার আছে।
বুঝতে পারছি, আমার সম্পর্কে সাগ্নিক তোমাকে অনেক কিছুই বলেছে। মণিময় কপট অসন্তোষ দেখালেন, এই অভ্যাসটা খুবই খারাপ।
কেন? বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে গীতি বলল, ছেলে বাবার গুণগান করলে অন্যায় অপরাধের কি থাকতে পারে?
কেন বলছি জান? মণিময় মূল প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে বোঝালেন, ওরা বোঝে না যে এইসব প্রচারের মধ্যে দিয়ে নিজেদের দৈন্য ধরা পড়ে।

ঠিক বুঝলাম না। গীতির চোখে অবাক জিজ্ঞাসা।
মনে কর, যদি প্রশ্ন করা হয়। মণিময় সহজ করে বললেন, যার সম্পর্কে গর্ব করা হচ্ছে তেমন গুণী বাপের কেমন সন্তান তুমি? কি উত্তর দেবে?
বুঝলাম। গীতি আনত মাথা নাড়ল।
অথচ যে কোনও বাবা কিন্তু তুলনায় উচ্চমানের সন্তানের জন্য গর্ব করে বলতে পারেন, আমি শুধু জন্মই দিইনি। যথার্থ মানুষ করে গড়েও তুলেছি। তাই নয় কি?
গীতি ফের নির্বাক মাথা নেড়ে সহমত জানাল।

গীতির হাতে একগোছা চাবি দিয়ে মণিময় বাজারে গেছেন। গীতি ঘুরে ফিরে দেখছিল। প্রশস্ত বারান্দা ঘেরা বাড়িটা, সম্ভবত ইংরেজ আমলে তৈরি। বড় আকারের দরজা জানলা। তলায় অনেকগুলো ঘর। পর্যাপ্ত আলো বাতাস। অপেক্ষাকৃত তিনটি ছোট ঘরে স্টুডিও লাইব্রেরী আর গানঘর। ভেতর বারান্দা থেকে সমুদ্র গর্জন আর ঝাউবনের শব্দ আরও জোরালো শোনা যায়। উঠানের একদিকে চাকর বাকর চৌকিদারের থাকার ঘর। অপরদিকে গ্যারেজ ঘরে ঐতিহাসিক ধুলোয় মলিন ভগ্ন অচল একটি রোলস রয়েস গাড়ি। সকালের আগন্তুককে দূর থেকে দেখা ইস্তক যে আওয়াজ দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছিল গীতি সেই গোল্ডেন রিট্রিবার কুকুরটিকে চৌকিদারের সঙ্গে দেখতে পেল। একটু আগে হলঘরের দেয়ালে ঝোলানো বন্দুকও দেখেছে। বুঝতে অসুবিধা হল না, সবকিছুই নিরাপত্তা প্রয়োজনে।
চিংড়ি বিরিয়ানি রাঁধতে জান? বাজার থেকে ফিরে মণিময় জিগ্যেস করলেন। গীতি না সূচক মাথা নাড়ল।
নারকেলের ইলিশও হবে আজ। গীতিকে ফের কোনও প্রশ্নে বিব্রত না করে মণিময় জানালেন, তোমাকে পনিরের চাটনিও খাওয়াব।
অর্থাৎ কিনা আমার রান্না করা হল না। গীতি কপট ভ্রূকুটি করল।
তা কেন? মণিময় প্রস্তাব রাখলেন, আমার কোচিং বা ডাইরেকশনে আসল কাজটা তুমিই করবে। ও কে?
সে দেখা যাবে। আগে আমি বাকি সব ঘুরে দেখিতো।
চন্দ্রা এসে তোমার ব্রেক ফাস্ট দিয়ে গেছে তো?
আমি কি চন্দ্রাকে চিনি নাকি? গীতি অকপট স্বীকারোক্তি করল, কালো হরিণ চোখের একজন টিফিন নিয়ে এসেছিল। তোমারটা ডাইনিং টেবিলে রাখা আছে।
সে কি চলে গেছে?
বোধহয়। আমাকে এমন বিশ্রী নজরে দেখছিল যে ভাল্লাগছিল না। ছুটি দিয়ে চলে যেতে বলেছি। দরকার কি আমি তো আছিই।
মণিময়ের মনে খটকা লাগলেও কোন প্রতিক্রিয়া বুঝতে দিলেন না। রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। গীতিও দাঁড়িয়ে না থেকে স্টুডিওর দিকে এগিয়ে গেল।
স্টুডিওটা নজরদারী নয়। অপেশাদার সখের শিল্পীর যেমনটি হয়ে থাকে তেমনটি। সিংহভাগ ছবি আর মূর্তি অসমাপ্ত। অপরিছন্নতায় অনুমান হয়, ইদানিং এখানে কোনও সৃষ্টিকর্মের প্রচেষ্টা চলেনি।

তবু গীতি গভীর মনোযোগ দিয়ে ঘুরে ফিরে দেখছিল। বোদ্ধা বা রসিকজন যেমনটি কোনও প্রদর্শনী দেখে থাকে তেমন আচরণে।
অনেকক্ষণ হল একখানি ছবির সামনে গীতি দাঁড়িয়ে আছে। চোখমুখ জুড়ে একই সঙ্গে বিস্ময় ভ্রূকুটি উষ্মা।
সুমুখের রঙিন তৈলচিত্রে তামাটে রঙের রমণীটি সম্পূর্ণ বেআব্রু। আঁটসাট সুঠাম শরীরে সুবর্তুল স্তনযুগল। ভারী নিতম্ব। অতুলনীয় নাভি। সিংহ কোমর। বাঁধুলি ফুলের মত ঠোঁট। মাথায় কুঁচকালো চুলের খোঁপায় ফুলমালা, কাঠের কাঁকই। রমণীটির একহাত বুকের বর্তুলে। অপর হাতের তেলোয় ঢাকা উরুসন্ধিস্থল। আয়েসী বেড়ালের মতো চোখে দ্বিধা সঙ্কোচ লজ্জা ভয়।
চন্দ্রাকে এভাবে সম্পূর্ণ নগ্ন করে জীবন্ত ছবি আঁকায় গীতির বিন্দুমাত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল না। তবে গুণী সুপুরুষকে নারীরা অভিলাষ করলেও গীতির মনে হল, অনভ্যাস মানুষের যাবতীয় বিদ্যা গুণাবলী প্রতিভা বিনষ্ট করে। অতএব মণিময়কে কিছু বলা দরকার মনে করল।
চন্দ্রাকে তুমি কিভাবে ছুটি দিয়েছ? খাবার টেবিলে বসে মণিময় খটকা লাগা প্রসঙ্গে পরিষ্কার ধারণায় পৌঁছাতে চাইলেন।
আমি যে কদিন আছি ওকে আসতে বারণ করে বলেছি, দরকার হলে ডেকে পাঠানো হবে।
এরকম বলে ঠিক করোনি। মণিময় ওঁর সমস্যা সম্পর্কে ইংগিত করে বললেন, কি পরিচয়ে থাকবে তুমি? পুত্রের বান্ধবী। ভাবী পুত্রবধূ নাকি অন্য কোন কিছু?
ভাবী পুত্রবধূ ছাড়া অন্য যা কিছু তোমার মন চায় বলতে পার। গীতি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, আমার সিদ্ধান্তটা হঠাৎই বদলে গেছে।
কি সেই সিদ্ধান্ত? ভয়ঙ্কর কিছু শুনবে বলে আশঙ্কিত মণিময়ের মনে হল, গীতির তুমি সম্বোধন বোধ হয় নিছক ছেলেমানুষী আদুরেপনা নয়।
সাগ্নিকের সঙ্গে আমি আর কোনও সম্পর্ক রাখব না। গীতি অকম্পিত স্বরে বলল।
কেন? মণিময়ের স্বরে বিস্ময়।
কেননা, ধর্ম থেকে সত্য শ্রেষ্ঠ। গীতি খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সত্য তোমার জন্য আমি অধর্মেও রাজি। আই লাভ ইউ মণি।
গীতি রীতিমতো অপ্রত্যাশিত চমকে দিয়ে এঁটো মুখে মণিময়কে চকাৎ করে চুমু খেল। তারপর আর একমুহূর্ত সুমুখে থাকল না। দৌড়ে নিজের ঘরে গেল।
মণিময় হতভম্ব হকচকিয়ে গেলেও অগতানুগতিক ভালবাসার ছোঁয়ায় অদ্ভুত এক ধরণের আমেজে বিভোর হলেন।
মণিময়ের দুপুরে ঘুমনো অভ্যাস নেই। আজ আভ্যন্তরীণ উষ্ণ আবেশ উচ্ছ্বাসে অনেকদিন পর রেকর্ড মিউজিয়ামের রেকর্ডগুলি ঝাঁড়পুছ করছিলেন।
সময় দুপুর গড়িয়ে প্রাক-বিকেল।
বড় আশা করে এসেছি। গানের কলি দিয়ে শুরু করে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গীতি জিগ্যেস করল, ভেতরে আসতে পারি?
এসো এসো আমার ঘরে। মণিময়ও গান দিয়ে শুরু ও শেষ করলেন, তোমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জান? মোহিনী মায়া এলো।

কেন, আলো আমার আলো বলা যায় না? গীতি ভেতরে ঢুকে সাজানো রেকর্ড ক্যাসেটগুলির দিকে দৃষ্টি মেলে বলল, চক্ষে আমার তৃষ্ণা। তারপর মণিময়ের অল্প দূরে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত গভীরতা থেকে শোনাল, আমাকে হয়ত বেহায়া দুষ্ট চরিত্রের মনে হতে পারে। কিন্তু যেটা সত্যি তা হল, সাগ্নিকের চাইতে তুমি এখন আমার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।
আমি ভাবছিলাম, শুধু ভাবছিলাম।
কি? গীতি কাছাকাছি এসে বসল।
এ কোন পাখি ধরা দিতে চায়। মণিময় কৌতূহল গোপন রাখলেন না, কারণটা জানতে পারি কি?
নির্ভয়ে বলব? অতলাক্ত চোখ মেলে ধরে গীতি বলল, সকালে প্রথম বিমুগ্ধ দর্শনেই তোমার চোখের আলোয় দেখেছিলাম—।
কি দেখেছিলে? মণিময়ের চোখে ফাঁদ পাতা আঠা।
অন্তর উদাসী। গীতি গড়গড়িয়ে বলে গেল, ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ তুমি। অথচ, তুমি আকর্ষণীয় অসাধারণ রূপগুণ স্বাস্থ্যের অধিকারী। অন্যদিকে সাগ্নিক রুগ্ন। নানারকম নেশায় অকালে ওর বার্দ্ধক্যের মতো ভগ্ন চেহারা। বিন্দুমাত্র যৌবনের উজ্জ্বলতা নেই। যা কিছু প্রতিভা ছিল অযত্ন অবহেলায় শেষ হয়ে গেছে। বাবাকে নিয়ে সন্তানদের গর্ব করা প্রসঙ্গে সকালে তোমার বিশ্লেষণ যথার্থই ছিল।
তুমি তো সাগ্নিককে ভালবাসতে। শুনেছি, ভালবাসায় সব হয়। তাহলে সাগ্নিক কেন অমন হয়ে গেল, বলতে পার?
প্রশ্ন তো আমারও। গীতি আনত ম্লান চোখ চেয়ে বলল, যতদূর জানি ওর মুখ চেয়েই তুমি আর দ্বিতীয় বিয়ে করনি। দু'বছর বয়স থেকে ওকে মায়ের আদর ভালবাসাও দিয়েছ। তবু কেন ও বাবার কিছুই পেল না, ভাবতে আশ্চর্য লাগে।
ফ্লাওয়ার মিলে উঁচু পদে চাকরি সুবাদে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ধারে বাংলোয় থাকতাম। তৃণা আমার স্ত্রী সাগ্নিককে দু'বছর বয়সের রেখে মারা গেল। সাগ্নিক তারপরও দশটি বছর আমার কাছে ছিল। তারপর পড়াশুনোর সুবিধার জন্য অথবা মামা বাড়ির আদরের আকর্ষণে সুকীয়া স্ট্রিটে থাকা শুরু। সম্ভবত মামাবাড়িই ওর অধঃপতনের মূলে।
সাগ্নিক এই যে একের পর এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসছে। গীতি দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে বলল, ও কোনও পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারবে না তা আমি জানি। কেননা ও জিততে জানে না। বরং, একটু প্রেরণা পেলে তোমার দ্বারা অনেক কিছুই সম্ভব। বিলিভ মী মণি, আই লাভ ইউ। ভালবেসে তোমাকে অনুপ্রাণিত করতে চাই।
রেকর্ড চালাব, শুনবে? মণিময় এক ঝলক হেসে শোনালেন, সখি ভালবাসা কারে কয়!
পরে শুনব, ওগো মোর গীতিময়।
তুমি এত গান জান। খুশি ঝলমল মণিময় বললেন, তোমার এ ধরণের চট জলদি সংলাপ আমাকে দারুণ আনন্দ দিচ্ছে।
তাহলে, নব আনন্দে জাগো আজি।
গীতি আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে মণিময়ের গালে শব্দ করে চুমু খেল। ফের নিজের জায়গায় এসে বসে নিবিড় চোখের পাতায় তাকিয়ে রইল।

কি খেলা খেলে যাও। মণিময় কপট বিরক্তি দেখিয়ে বললেন, এত সুখ দিও না সয়না। তোমার এত ভালবাসা কোথায় রাখব? তুমি চিরদিন যদি নাহি রবে—
তাহলে? গীতি কৌতুকী হাসল।
পরদেশী মেয়ে যাওরে ফিরে। মণিময় হাতের ইশারায় খোলা দরজা দেখালেন।
নাহ্, যাব না। গীতি কুন্দফুলের মতো দাঁতে পুঁটিমাছের ঝিলিক ছড়িয়ে বলল, আমি রব চিরদিন তোমারই যেন। তুমি আমার আপনার চেয়ে আপন। আর আমি তোমার?
মণিময় কোনও জবাব দিলেন না।
চুপ করে থাকলে চলবে না। গীতি দু'হাতে মণিময়ের গলা জড়িয়ে ধরে আব্দার করল, গানের কলিতেই উত্তর দিতে হবে। বল।
তুমি একজনই শুধু বন্ধু আমার। গীতির চুলে আদর করে মণিময় আবেগ আপ্লুত ফের বললেন, তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা। তুমি এলে অনেক দিন পরে যেন বৃষ্টি এল। তুমি মায়াবন বিহারিণী—
স্টপ। থামিয়ে দিয়ে গীতি বলল, চল তবে যাই।
কোথায়?
যেখানে মধু গন্ধে স্নিগ্ধ ছায়া। ফুল বলে ধন্য আমি। ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে, চঞ্চল সোনালি পাখনায় মৌমাছি প্রজাপতিরা ওড়ে। নীল নীর্জন সাগরে এলোমেলো হাওয়া বয়ে যায়। সেখানে, মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল।
অপূউরব, গীতি তুমি তুলনাহীনা। মণিময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন।
তাহলে, আমারে কর তোমার বীণা। গীতি কলকলিয়ে হাসল।
আজ তবে এইটুকু থাক। মণিময় আবেগের লাগাম টানতে চাইলেন।
তবে তাই হোক। গীতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তৈরি হয়ে আসি। দু'জনে বেড়াতে বের হব। যেতে যেতে কিছু কথা বলব।

লাল ও কমলা রঙের রেশমি সুতোর কাজ করা শাড়ি পরেছে গীতি। মাঝে মাঝে ছোট চুমকির কাজ করা। রেশমের মতো একঢাল চুল। হালকা ন্যাচারাল লিপস্টিক। পুঁতি বিডস্ কাঁচ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি এক্সক্লুসিভ গয়না।
কি দারুণ দারুণ গোলাপ তোমার বাগানে! সমুদ্রতীরে যাত্রাপথে গীতি বলল।
নেবে তুমি? মণিময় জিজ্ঞেস করলো।
না। সৌন্দর্য নষ্ট হবে। ঝরে যাবে। তাছাড়া, অসময়ে ওর সুবাসও হারাবে।
জেলেদের ছোট্ট গ্রাম পেরিয়ে দু'জনে সমুদ্র তীরে পৌঁছল। সোনালি বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে নীল সমুদ্রের কাছাকাছি গেল। অজস্র ঢেউ ফুঁসছে। সশব্দে আছড়ে পড়ছে। গীতি সমুদ্র-ফেনায় পা ভেজালো। বেশ কিছুক্ষণ মাছ ধরার পালতোলা নৌকোর দিকে তাকিয়ে।
গীতি। মণিময় ডাকলেন।
উঁ? যেন অতলান্ত কোন সুদূর থেকে গীতি সাড়া দিল।
কিছু কথা বলবে বলেছিলে। কি কথা?

আগে চল কোথাও বসি।
গীতি নানা বর্ণ ও আকারের নুড়ি ঝিনুক কুড়িয়ে কোচড় ভরল। একপাল গরু চড়ে বেড়াচ্ছে বালির জাজিমের ওপর। ভেজা বালিতে ছোট ছোট গর্ত। সুড়ৎ করে লাল কাঁকড়া ঢুকে যাচ্ছে সেই গর্তে। নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছে গাঙশালিখ। তীরভূমির ক্ষয়রোধ করতে অজস্র পাথরের চাঙড় ফেলা হয়েছে। দেখে শুনে যুতসই একটা পাথরে বসে দু'জনে। মুখে এসে পড়ে দিনান্তের সূর্যর বিমর্ষ অলস আলো। একসময় সেই আভা আকাশে ছড়িয়ে সমুদ্রে ডুবে যায়। চরাচরে নৈঃশব্দ নেমে আসে। মিহি বাতাসে শরীরময় অদ্ভুত এক শিহরণ। গীতি অস্ফুট গুনগুন করে, এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়। মণিময় অন্য গানের কলি ধরেন, নিঃঝুম সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখিরা—।
থামলে কেন? গীতি জিজ্ঞেস করল।
তুমিই বা গুনগুনানি বন্ধ করলে কেন? মণিময় প্রশ্ন জুড়লেন।
কেউ কোনও উত্তর না দিয়ে হেসে লুটোপুটি। একে অপরের হাতের মুঠোয় হাত রাখে। শীতপত্রের মতো গীতির ঠোঁট কেঁপে উঠল। দৃষ্টিতে সুদূরের আহ্বান। তন্দ্রাতুর গভীরতা। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ছন্দায়িত বুক।
গীতির উরুতে মণিময় মৃদু চাপ দেন। রক্তধমনীতে জোয়ার অনুভব করেন। গীতির শরীরের প্রতিটি অংশে স্পর্শ করে সুখানুভূতি পেতে ইচ্ছে জাগে। গীতির নাকের পাটা ফুলে ওঠে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। কপালে উত্তেজনার রেখা প্রকটিত হয়। মোচড় অঙ্গ ভঙ্গিতে উষ্ণতা ছড়ায়। নীরবতায় মণিময় প্ররোচিত হলেন। কবুতরের মতো নরম শরীরটাকে নিয়ে আঁকড়ে ধরলেন। চুলের অরণ্যে নাক ডুবিয়ে সুবাস নিলেন। উষ্ণ নিঃশ্বাসের উত্তাপে দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কায় গীতি আচমকা উঠে দাঁড়াল। পোশাক ঠিকঠাক করে বলল, এবার ঘরে ফিরে চল।
অন্ধকার আচমকা ঘনীভূত হয়ে আসায় মণিময় আপত্তি করলেন না। গীতির মসৃণ কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে চললেন।
আচ্ছা মণি, অবাক করা সম্বোধনে গীতি নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে প্রশ্ন করল, তোমার কোনও নেশাটেশা নেই?
আছে, অনেকরকম নেশা আছে। নতুন ডাকে পুলকিত মণিময় হালকা মেজাজে জবাব দিলেন, বই পড়া বাগান করা ছবি আঁকা মূর্তি গড়া গানশোনা—এরকম হরেক রকম নেশা আমার।
ইয়ার্কি না। কপট মেজাজ দেখিয়ে গীতি বলল, সাগ্নিকের মতো নেশার কথা বলছি।
এককালে অগুনতি সিগারেট খেতাম। মণিময় উন্মনা বললেন, ভালরকম মদ্যপানও করতাম। সেই যখন চাকরি করতাম তখন। সাগ্নিক মামা বাড়ি চলে যেতে বড্ড নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ হয়ে গেলাম। তখনই বিপরীত আচরণ শুরু করলাম আমি। চাকরি ছাড়লাম। সিগারেট মদ বর্জন করলাম। নিরিবিলি নির্জনে এই বাড়িটা কিনে শহুরে সমাজ সভ্যতাও ছেড়ে দিলাম। এখন অবশ্য অল্প-স্বল্প ব্রান্ডী পান করি। ব্যস। আমার কলেস্টরল সুগার পেসার নেই। মর্ণিংওয়াক জগিং করি। সাঁতার কেটে স্নান আর বাগান করাতেও যথেষ্ট শরীর চর্চা হয়।
তাইতো তুমি এই বয়সেও তারুণ্যে উজ্জ্বল। গীতি ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত বলল, গুণী ব্যতিক্রমী

অগতানুগতিক তুমি অসাধারণ। এরকম পুরুষের কাছেই নারীরা বশ্যতা স্বীকার করে।
আসার সময় তুমি কি যেন বলবে বলেছিলে। মণিময় কথার মোড় ঘোরাতে বললেন, এখনও বলোনি কিন্তু।
আমি বলতে চেয়েছিলাম, যদি তোমার নিঃসঙ্গতা কাটাতে সঙ্গী হতে চাই?
সেটা কেমন করে সম্ভব? মণিময় ম্লান কৌতুকী হাসলেন।
জানিনা, তুমি আমার মালা নেবে কি নেবে না। তোমার প্রেমের যোগ্য হয়ত আমি নয়। অন্তত বন্ধুতো হতে পারি। মনে কর, পাশ করার পর এখানে চলে এলাম। এই বাড়িটাকে সংস্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর আকর্ষণীয় হোটেলে রূপান্তরিত করলাম। নাম রাখলাম, হোটেল মণি। তুমি রাজি হবে না?
শুনেছি, গালুডির জলহাওয়া পরিবেশ দারুণ ভাল। হোটেল, হলিডে হোম, হেলথ রিসর্ট করার উপযুক্ত জায়গা। তাহলে এখানে হোটেল চালানোর পরিকল্পনা কেন?
শুধু তোমার জন্য। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বর্ণময় স্বপ্ন।
আমি কিন্তু সাগ্নিকের বাবা। দু'জনের বয়সের ব্যবধানটা কত জান? বাস্তব দিকটা চিন্তা করে দেখ। ডোন্ট বী ইমোশনাল।
গীতি তাৎক্ষণিক কোনও জবাব দিল না।

ঘরে ফিরে দীর্ঘ সময় নিয়ে গীতি স্নান করল। অন্তর্বাস বিহীন রাতের পোশাক পরল। সুগন্ধী পারফিউম ব্যবহার করল। তারপর টিভি খুলে বসল। কিছুক্ষণ পর মণিময় চায়ের সঙ্গে চিংড়ি মাছের সিঙাড়া ভেজে নিয়ে এলেন। গীতিকে দিলেন, নিজে নিলেন।
রাত্রে তুমি কি খাবে? সিঙাড়ায় কামড় বসিয়ে মণিময় জিজ্ঞেস করলেন।
কিছু না। গীতি শ্রাগ করে বলল, বাব্বা দুপুরে যা খাইয়েছ!
কিছুতো খেতেই হবে। ওবেলার কিছুটা নারকেল-ইলিশ আছে। সামান্য সাদা ভাত ফুটিয়ে নেব। তুমি রাজিতো?
বেশ তাই হবে। তোমার বড্ড খাই খাই অভ্যেস।
আসলে আমার প্রবল হজমশক্তি। মণিময় সগর্বে শোনালেন, আমি খেতে এবং খাওয়াতে ভালবাসি। রাঁধতে যখন জানি, নো প্রব্লেম। কাল তোমাকে কি খাওয়াব জান?
কি করে জানব?
মোচার ডাল, বাগদা-চিংড়ির দম আর পমফ্রেট মাছের ঝালকারি।
আমার পছন্দ অপছন্দটা একবারও জানতে চাইলে নাতো। গীতি চা সিঙাড়া খেতে খেতে আক্ষেপ করল।
সত্যিই ভুল হয়ে গেছে। মণিময় রসিকতায় জিব কেটে বললেন, ঠিক আছে বল তোমার কি খেতে পছন্দ।
তোমার পছন্দমতো যেমন চলছে চলুক। গীতি দুর্বোধ্য কৃপণ হেসে বলল, আমার পছন্দটা ঠিক সময়ে জানাব। তখন দেখব, তুমি কেমন খেতে খাওয়াতে ভালবাস।
ও কে।
কথায় কথায় মণিময় জানালেন, এখানে সূর্য ডুবলেই ঝপ করে অন্ধকার নামে। পরমুহূর্তেই গভীর রাত মনে হয়। বাইরে লোকজন থাকে না বললেই চলে। সকলেরই সাত তাড়াতাড়ি

রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়া অভ্যেস। তাছাড়া একটু আগে সতর্ক করে বলা হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ কেন্দ্রীভূত আছে তা থেকে রাত্রে দু'শ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় আসার সম্ভাবনা আছে।
তাই? গীতি উৎফুল্ল ও হতাশ হল, দিনে হলে সমুদ্রের ঝড় দেখা যেত। শুনেছি, দারুণ নাকি সেই দৃশ্য। ভয়ঙ্কর সুন্দর। মণিময় ভ্রূকুটি করে বললেন, আসতে দাও। দূর থেকে আওয়াজ শুনলেই টের পাবে। ভয়ে আত্মারাম খাঁচা হয়ে যাবে।
না মিস্টার। গীতি তাচ্ছিল্যের ঢঙে বলল, নটরাজকে দেখে কেউ ভয় পায় শুনেছ কখনও? ভয়ঙ্কর সুন্দর বিদ্যুৎ চমক আর বাজপড়ার শব্দ দেখতে শুনতে আমার দারুণ ভাল লাগে। ঘাটশিলার বাড়িটাতে কাচের জানলা ছিল। বাজপড়ে একটা নারকেল গাছ জ্বলতে দেখেছিলাম। অপূর্ব লেগেছিল। বৃষ্টিতে ভিজতে আমার ভাল লাগে। বাজপড়া তোয়াক্কা না করে ছাদে কতদিন বৃষ্টিতে ভিজেছি। শিল কুড়িয়েছি। এতটুকু ভয় করেনি।
তাই বলে এখানে তোমাকে ভিজতে দিচ্ছি না। মণিময় শাসন-স্বরে বললেন, যাই চটপট ভাতটা ফুটিয়ে ফেলি। দস্যি মেয়েটা না ঘুমোলে বিশ্বাস নেই।
রাত্রে খাওয়ার পর সত্যিই দুরন্ত ঘূর্ণি ঝড় উঠল। গীতি তখন নিজের ঘরে। উন্মত্ত খ্যাপাটে সোঁ সোঁ গোঙানি শব্দ তোলপাড় করল। গাছপালা ভাঙল মড় মড়। কড় কড় বাজ পড়ল অজস্র। সেইসঙ্গে বুক ধুকপুকানি ঝিলিক ঝিলিক বিদ্যুৎ চমকানি। বেশ কিছুক্ষণ তান্ডব অন্তে ঝড়ের দাপট স্তিমিত হল। গাছের পাতায় অশ্বখুরের শব্দ তুলে বৃষ্টি এল। তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও শিল পড়ার শব্দ শোনা গেল।
মণিময় এখন গান-ঘরে। অধিক রাত অব্দি ক্যাসেট বা ডিস্‌ক-এ গান শুনে বই পড়া অভ্যেস। এতক্ষণ যে গানগুলি ক্রমশ বেজে গেছে তাহল, মনে মোর প্রেমের মণিকা জাগিয়া উঠিল গোপনে। আমি এসেছিনু অবসর ক্ষণে মুকুল ফোটাতে তব মন বনে। আমার ভুবন শূন্য কাঙাল করে ব্যথা দিয়ে তুমি আঁখির আড়ালে সহসা যাবে গো চলে। আমার এ ভালবাসা জানিগো তোমার ক্ষণিকের ভাল লাগা ফুল/ক্ষণিক কবরী মাঝে দিয়েছিলে ঠাঁই, তারপর ভেঙে গেছে ভুল। ইত্যাদি ইত্যাদি।
এইমাত্র 'ওগো মোর গীতিময়' দিয়ে শুরু হওয়া গানটি 'তুমি বলেছিলে, এই আঁখির আড়াল মনের আড়াল নয়' দিয়ে শেষ হওয়ার পর ক্যাসেটটি অটো-স্টপ হল। মণিময় বর্ষা বিষয়ক ক্যাসেটটি আনতে গিয়ে ভাবলেন, গীতি ঘুমিয়ে পড়েছে কি?
গীতি বিছানায় শুয়ে বিনিদ্র গান শুনছিল। বাইরের ঝড়জল তান্ডব ছাপিয়ে ভেসে আসা গানের বিশেষ লাইন শব্দ হৃদয় ছুঁয়ে মনে গেঁথে বসছে। অবর্ণনীয় অব্যক্ত এক ধরনের সুখানুভূতি আলোড়িত হচ্ছিল। অথচ অনেকক্ষণ হল গান বন্ধ কেন? গীতির মনে প্রশ্ন, তবে কি মণি এবার ঘুমোল? পরক্ষণেই উত্তর পেয়ে গেল যখন বাতাসে ভেসে এলো, 'এমন দিনে তারে বলা যায়/এমন ঘনঘোর বরিষায়।'
কি বলতে চায় মণি? হরিণীর গতিতে গীতি দরজা খুলে ছুটল। বৃষ্টির দাপটে বাইরে শীতের ছোবল। ভেতরের মেঘ আগুন ঝড় নিয়ে গান ঘরের উন্মুক্ত দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ক্যাসেটে বেজে চলেছে, 'একথা শুনিবে না কেহ আর/নিভৃত নির্জন চারিধার/দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী/আকাশে জল ঝরে অনিবার/জগতে কেহ যেন নাহি আর/সমাজ সংসার মিছে

সব/মিছে এ জীবনের কলরব.....' তুমি! অজান্তে টেপ ডেক বন্ধ হতে গীতিকে দেখে চমকে উঠলেন মণিময়।
দরজাটা যদি আমার জন্যই খুলে রেখে থাক তো অবাক হচ্ছ কেন? গীতি দু'চোখের ভুরু কুঁচকে স্মিত হাসল।
দরজা বন্ধই ছিল। মণিময় ঈষৎ উদ্বিগ্ন চোখ চেয়ে বললেন, আগের ক্যাসেটটা শেষ হতে স্পষ্ট মনে হল কে যেন দরজা খটখটাচ্ছে। খুলে কাউকে দেখতে পেলাম না। সেই থেকে আর বন্ধ করা হয়নি।
ঝুপড়ির কেউ আসেনিতো? গীতি তীক্ষ্ণ তির্যক তাকালো।
আজ পর্যন্ত তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। মণিময় হালকা মেজাজে জবাব দিলেন।
তাহলে এই মুহূর্তে ঝড়ের রাতে তোমার ঘরে আমারি শুধু অভিসার। গীতি পেছন থেকে মণিময়কে জড়িয়ে ধরল। গলায় কানের নিচে একাধিক চুমু খেল।
প্লিজ, এমন করতে নেই। হকচকিত মণিময় দু'হাতের বন্ধন ছাড়িয়ে গীতির মুখোমুখি কপট প্রতিরোধ দৃষ্টিতে তাকালেন।
তুমি তো সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী বা তপস্বী নও মণি। গীতি তিরস্কারের ঢঙে বলল, তুমি নির্জনে হলেও মনুষ্য সমাজেই আছ। রমণের জন্যই রমণী। নারীসঙ্গ পুরুষের কাছে স্বর্গসুখ। তাহলে এত দ্বিধা কেন?
কেন জানিনা মনে হয়, তৃণা সাগ্নিকের প্রতি অবিচার করা হবে। মণিময় অকপট স্বীকারোক্তিতে দুর্বলতা জানালেন।
ক'দিন বেঁচে ছিল তোমার স্ত্রী? মণিময়কে সঞ্জীবিত করতে গীতি বোঝাল, ওইটুকু সময়ে কতটুকু, কি আর আশ মেটে। আর সাগ্নিক? তোমার সংযমী জীবন আর পিতৃস্নেহের কি মূল্য পেয়েছো ওর কাছ থেকে? একটু আগেই তো গান বাজছিল, 'নিভৃত নির্জন চারিধার/দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী....।' কথা দিচ্ছি, কেউ কিছু জানবে না।
বাঁকা হাসিতে আহ্বান জানিয়ে মণিময়ের বুকে গীতি আঙুলের রেখা টেনে চুমু খেল। প্রশ্রয় পেয়ে মণিময় ওর কোমর পিঠে দু'হাতের বেড় দিয়ে ধরলেন। নিবিড় চাপ দিয়ে কাছে টানলেন। দীর্ঘক্ষণ আকুপাকু উত্তেজনা আলিঙ্গনে কারও দেহে কোনও আব্রু রইল না। গীতির মসৃণ নগ্ন শরীরের প্ররোচনামূলক প্রতিটি অংশে মণিময় হাত চালালেন। অবাধ্য দংশন মর্দন চোষণে গীতি লালাসিক্ত লালাভ হল। চুল এলোমেলো। মণিময় এখন শায়িত গীতির বাহুদ্বয় আর নিতম্বে আবদ্ধ।
মণি। আধবোজা চোখে গীতি অস্ফুট ডাকল।
বল সোনা। মণিময়ের স্বরে আদরের স্পর্শ।
তুমি জান যে, নারীরা শৃঙ্গার নিপুণ পুরুষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। প্রত্যাশায় আবেগময় চোখ চেয়ে গীতি ঠোঁটের পাপড়ি উন্মুক্ত করল। জিবের ইশারায় প্রলোভিত করে বলল, আমি সমুদ্র ঢেউ ভালবাসায় তোমার সব পৌরুষ প্রতিভা কেড়ে নিতে চাই। প্লিজ আর কষ্ট দিও না।
প্রথমে গীতি সক্রিয় হল, তারপর মণিময়। দীর্ঘক্ষণ উথালি-পাথালি দাপাদাপি চলল। কিছুক্ষণ পুলকিত রোমাঞ্চিত শিহরণ। অস্ফুট শীৎকার ধ্বনি। উম্-ম্-ম্। আহ। সবশেষে প্রশান্ত

ধরিত্রী। সুখাবেশে আলস্যে অবশ দু'টি শরীর। গীতির তন্দ্রাতুর চোখে নিবিড় তৃপ্তি খুশির উজ্জ্বলতা। মণিময়ের বুকে মাথা রেখে গীতি বিড় বিড় করছে, চিরবন্ধু চির নির্ভর চির শান্তি।

আজ ভোরে যথাসময়ে পূর্ব আকাশে জবাকুসুম সূর্য উদয় হয়েছে। মাথার ওপর নিখুঁত নির্মল আকাশ। নরম হলুদ রোদ্দুরে খুশি ঝলমল প্রকৃতি। বোঝার উপায় নেই, গতকাল দুর্যোগের রাত কতটা কেমন ছিল।

মণিময় প্রতিদিনকার মতো আজও অতি প্রত্যূষে শয্যা ছেড়েছেন। গৃহ অভ্যন্তরের প্রয়োজনীয় কার্যাদি চুকিয়ে গান-ঘরে ঢুকলেন। পূজাপর্বের নির্বাচিত গানের ক্যাসেট চালালেন। তারপর বাইরে বাগানের দিকে পা বাড়ালেন।

ফটকের সামনে পুলিশের গাড়ি কেন? অবাক মণিময় নিজের মনে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করে থমকে দাঁড়ালেন। পরিচিত পুলিশ অফিসারকে এগিয়ে আসতে দেখলেন।

সকাল বেলাতেই আপনাকে ডিসটার্ব করতে এলাম বলে দুঃখিত। থানার অফিসার সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, কাল আপনার কোনও বোর্ডারের লাস্ট বাসে ফেরার কথা ছিল?

আমার তো কোনও বোর্ডারই নেই। মণিময় সপ্রতিভ জিজ্ঞেস করলেন, কেন বলুন তো?

রাফ ওয়েদারের জন্য কাল লাস্ট বাস ছাড়েনি। ওই বাসের মধ্যে একটি যুবকের ডেড বডি পাওয়া গেছে। শনাক্ত করা যায়নি। কে একজন বলছিল, ঝড়ের পর এদিক থেকেই নাকি ওকে যেতে দেখা গেছে। ওকে, স্যরি টু ডিসটার্ব ইউ।

মণিময়ের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ভাগ্যিস গীতি ধারে কাছে নেই। পরিচয় জিজ্ঞেস করলে রীতিমতো ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ষোলআনা সম্ভাবনা ছিল। মণিময় কিছু প্রশ্ন উত্তর গীতিকে শিখিয়ে দেয়া দরকার মনে করলেন। তাই ফের ঘরে ফিরে এলেন।

মণিময় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গীতিকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। ওয়াড্রব খুলে স্কাই ব্যাগের সন্ধানে একখানা খাম খুঁজে পেলেন। খামের ভেতর ছোট্ট চিঠিতে মণি সম্বোধনে গীতি লিখেছে, আমার বিশ্বাস কাল ঝড়ের মধ্যে সাগ্নিক এসেছিল। সেই দরজা খটখটিয়েছিল। তাই অন্ধকার থাকতেই চলে যাওয়া যথার্থ মনে হল। তোমাকে কাপুরুষ ভাবিনি। আমি নিজেও বিন্দুমাত্র ভীতু না। তুমি বীজরূপী পুরুষ, আর আমি আধার রূপী নারী। উভয়ের মিলনেই সৃষ্টি। কথায় আছে, সমুদ্র যেমন নেয় আবার ফিরিয়েও দেয়। আমার হয়ে শুভকামনা কর, সাগ্নিকের মতো কিছুতেই না। আমি যেন বুক মাথা উঁচু করে যথার্থ গর্ব করার মতো একটি সন্তান তোমাকে দিতে পারি।

মণিময় একাধিকবার চিঠিটা পড়লেন। কিন্তু, একবারটি থানায় যাবেন কিনা সে সম্পর্কে কিছুতেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছিলেন না। অবাক হয়ে দেখলেন, চন্দ্রা এসে পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বনাশ্রয়ে বন্ধন

দোতলার এই ঘরের জানলা দিয়ে খেয়া পারাপারের যাত্রীদের স্পষ্ট দেখা যায়। প্রত্যাশায় প্রতীক্ষারত রণবিজয় সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখলেন, এই খেয়াতেও আসেনি। কিছুটা নিরাশ হলেন। ভাবলেন, পরবর্তী খেয়া আসবে দেড় ঘণ্টা পরে। তখন রোদের তেজ বাড়বে। ভাটায় জল নেমে যাবে অনেক নীচে। আঠালো কাদার ওপর দিয়ে নগ্ন পায়ে সন্তর্পণে হাঁটতে হবে। তবেই খেয়ায় ওঠা সম্ভব। কষ্টকর তো বটেই, বিপজ্জনকও। পা পিছলে পড়ে গেলে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হবে। রণবিজয়ের ললাটে একাধিক উদ্বেগ রেখা প্রকটিত হল। যদিও তিনি বুঝতে পারলেন, পুনরায় প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া করণীয় কিছুই নেই।
নদীটা এখানে বেশ প্রশস্ত। দিনের বেলায় সিগালেরা ভাসে উড়ে বেড়ায়। সর্বক্ষণ কিছু জেলে নৌকা দেখা যায়। মাঝেমধ্যে গাদাবোট জাহাজ যাতায়াত করে। সময়ে বিপুল জলরাশির নিরুচ্ছ্বাস ঢেউ অর্ধভগ্ন কূলে আছড়ে পড়ে শ্রবণসুখ শব্দ ছড়ায়। দিনান্তে আবীর-রঙ সৌন্দর্য ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যেতে দেখা যায়।
আদিতে যে কখনও এখানে ইটভাটা ছিল তা বোঝার উপায় ছিল না। কেননা, পরবর্তীকালে টিলা দিঘি ফুলফলের বাগান দিয়ে ঘেরা জুটমিলের সাহেবের বিনোদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। রকমারি অজস্র গাছগাছালি নয়, সেই বিনোদন-আবাস তখন অব্যবহারে বিবর্ণ জঙ্গলময়। তবু প্রথম দর্শনেই রণবিজয়ের মনপসন্দ হয়েছিল। তাই জলদি কিনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বিলম্ব করেননি। সেই বিনোদন-ভূমি-আবাসই নানা সংস্কারে এখন রণবিজয়ের দৃষ্টিনন্দন বৃদ্ধাবাস।
এই সম্পত্তি ক্রয়ের পিছনে রণবিজয়ের বিশেষ মানসিকতা কাজ করেছিল। যৌবনে তিনি গান কবিতার অনুরাগী ছিলেন। ভালবাসতেন, কলকাতার কোলাহল থেকে নিরিবিলি দূরের কোনও নৈসর্গিক সৌন্দর্যময় এলাকায় বেড়াতে যেতে। সেসব অনুরাগ ভালবাসা হারিয়ে গিয়েছিল একাধিক কারণে। বাবার অকাল মৃত্যুতে মুদ্রণ প্রকাশন ব্যবসার হাল ধরতে হয়েছিল। জেরবার ছিলেন স্ত্রী সন্তানাদি নিয়ে সংসারের জাঁতাকলে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য বিষয় আশয় আদায়ে শরিকি মামলা মোকদ্দমায় অস্থিরতার অন্ত ছিল না। এখানে এসে সাময়িক মুক্তি শান্তির স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন রণবিজয়।
আটবছর হল রণবিজয় এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। শাখাপ্রশাখাময় সাজানো বাগান ছেড়ে বরাবরের জন্য এখানে চলে আসতে সরমার মন চায়নি। মহাভারতের বানপ্রস্থ দৃষ্টান্তে রণবিজয় বুঝিয়েছেন, দিনকালের হালচাল দ্রুত পালটে যাচ্ছে। তিনপুরুষের ত্রিবিধ রুচি মন মানসিকতার আপনজনদের নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারের সুখ-স্বপ্ন দেখলে দুঃখকষ্টের অন্ত থাকবে না। তার চাইতে মনোরম পরিবেশের শান্ত নীড়ে চলে যাওয়াই শ্রেয়। তাতে অনিবার্য সংঘাতের পরিবর্তে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে। উইক এন্ডে না হলেও বড় রকমের ছুটিতে ওরা হয়তো বেড়াতে যেতে পারে। কেননা তাতে ষোলোআনা লাভ। রথ দেখা কলা বেচা—দুইই হবে। তাছাড়া, বেহালা থেকে দূরত্ব তো এমন কিছু না। মন চাইলেই আসতে পারবে। সারাদিন সবার সঙ্গে কাটিয়ে দিনান্তে ফিরে যাওয়াও চলবে।

সেই থেকে রণবিজয়ের সঙ্গে সরমা এখানে। দম্পতি, বন্ধু, প্রেমিকযুগলের মতো অবিচ্ছিন্ন একাত্ম।

প্রথম দিকে রবিবার এলেই বেহালায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সরমা বায়না ধরতেন। রণবিজয় মেনেও নিতেন। একদিন ছাড় চেয়ে বললেন, এই শান্ত নির্জন প্রকৃতি পরিবেশ ছেড়ে ভিড় ভাট্টা কোলাহলে যেতে আমার ভাল্লাগে না। তাছাড়া, যাতায়াতের ধকলও আমার সহ্য হতে চায় না। এবার থেকে তুমি বরং বনমালীকে নিয়ে যাও।

বনমালীকে ছাড়াই সরমা একা যাতায়াত শুরু করলেন। সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। ঋতুভেদে প্রতিকূল আবহাওয়াতেও যাওয়া চাই-ই-চাই। তেমন কোনও অনিবার্য কারণ বাধা হয়ে দাঁড়ালে বনমালী দেড় মাইল সাইকেল চালিয়ে ডাকঘরে যেত। বেহালার সবাইকে চিন্তামুক্ত করতে রণবিজয়ের লেখা তার পাঠিয়ে আসত।

সেদিন ছিল রবিবার। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বেতারে ঘোষিত, প্রবল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। শূন্যহাতে যাওয়া সরমার অভ্যাস ছিল না। জ্যৈষ্ঠের ফল আম, লিচু, সবেদা, জামরুল, ফলসা ইত্যাদি গুছিয়ে রেখেছিলেন রাত্রে। ওজনে ভারী হয়ে যাবে বলে রণবিজয় কাঁঠাল নিতে বাধা দিয়েছিলেন। সকালে যেতে দিতে বাধা দিয়ে বললেন, আজ না হয় নাই বা গেলে। বনমালীকে বরং পাঠিয়ে দিই ডাকঘরে।

—তা কখনও হয় নাকি! সরমা মাতৃ-হৃদয়গত আবেগে বললেন, ওদের নাম করে ফলগুলি রেখেছি যে। দেখে নিও ঝড়বৃষ্টি কিস্যু হবে না। আবহাওয়া অফিসের আগাম খবর কতটুকু আর মেলে?

—তবু আমার কেন জানি না ভয় করছে। রণবিজয় মিনমিনিয়ে বললেন।

—অতই যদি ভয় তুমিও চল না সঙ্গে। সরমা তির্যক হাসলেন।

—কেন যাব? রণবিজয় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, ওরা আজ পর্যন্ত কেউ এসেছে? সম্পর্ক তো কখনও একতরফা হতে পারে না। আমি তবু বিপদে আপদে উৎসব অনুষ্ঠানে যাই।

সরমা কোনও জবাব খুঁজে পেলেন না। ভাবলেন, এমন বড় মাপের মানুষের সন্তান ওরা কেন যে এমনতর।

শহুরে জীবনের নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত সরমা এখানে জলকাদা পোকা মাকড় সাপ কেঁচো ইত্যাদিতে বিব্রত বোধ করতেন। অনেক সময় নিঃসঙ্গবোধে বিষণ্ণ হতেন। রণবিজয় বুঝতে পেরে আন্তরিক বলতেন, তোমার খুউব কষ্ট হচ্ছে তাই না? চলো, তোমার সাজানো বাগানে রেখে আসি। সরমার তখন ভালবাসা উথলে উঠত। হৃদয়ের গভীর থেকে নির্ভেজাল বলতেন, ওদের চাইতে তুমি আমার কম কিছু না। জেনে বুঝেও কেন খামোকা এমন বল?

সরমাকে সকালের প্রথম খেয়ায় তুলতে যাওয়ার পথে রণবিজয় বললেন, ওখানে থাকাকালে ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে ঝুঁকি নিও না। আজ না হয় থেকেই যেও।

—তা হয় কখনও! বিস্মিত সরমা বললেন, এখানে তুমি বুঝি একা থাকবে?

—একা কেন? বনমালী তো থাকছেই।

—বনমালীকে হলেই চলবে তোমার? সরমা বিদ্রূপ করে হাসলেন, তবে যে কাব্য করে কত কথা বল। সেগুলি মিথ্যে বুঝি?

—কী কথা?
—সেই যে বল, এখন আমাদের দু'জনেরই আয়ু জ্বলন্ত সলতের শেষাংশের মতো। এসময় প্রতিটি মুহূর্তই স্বর্ণময়। সুতরাং, খিটিমিটি ঝগড়া আর বাক্যালাপ বন্ধ রেখে এতটুকু সময় নষ্ট করার নয়। যতদিন বাঁচব একদিনের জন্যও কেউ বিচ্ছিন্ন একা থাকব না।
—সে জন্যই তো বলছি, ঝুঁকি নিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিতে যেও না। বড্ড একা হয়ে যাব।
—শত সতর্ক থাকলেও একজনকে তো একা একদিন হতেই হবে। খেয়ায় ওঠার আগে সরমা বললেন, সাবধানে থেকো। জলঝড়ে যেন সতীনের সংসারের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে বেরিও না। তোমার তো সাইনাস সর্দি কাশির ধাত আছে। তুমি না থাকলে সতীনের ঘরের সন্তানেরাও যে অনাথ হয়ে যাবে।
সতীনের সংসার বলতে রণবিজয়ের ফল সব্জির চাষবাস আর ফুল বাগান। ওরা সত্যিই রণবিজয়ের সন্তানের মতো, কিন্তু ঔরসজাতদের মতো স্বাবলম্বী হয়ে বাবা মাকে অবজ্ঞা করার সুযোগ পায় না। আজীবন নির্ভরশীল বলে সদা অনুগত। ঝিমিয়ে পড়া বিষণ্ণতা দেখে রণবিজয় ওদের রোগ শোক ক্ষুধা ক্লান্তি টের পান। পরিবেশিত জল খাদ্য ওষুধে ওদের দোদুল দোলনে আনন্দ সুখ পরিতৃপ্তি হাসি বুঝতে পারেন। তখন নিজেও বুকভরা সুবাসিত বাতাসে গুন গুন সঙ্গীতময় হয়ে ওঠেন।
সরমার এতসব অনুভূতি গভীরতা নেই। সামান্যতম পরিচর্যার বাসনা জাগে না। বরং ওদের জন্য রণবিজয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম আর বেহিসেবি অর্থ খরচে রীতিমতো ঈর্ষা বোধ করেন। অথচ আশ্চর্য, নিজ মন্দিরের বিগ্রহকে নিবেদনের জন্য যথেষ্ট ফুল ছিঁড়তে নির্মম সিদ্ধহস্ত। ভীষণ কষ্টবোধে সরমাকে সেসময় রণবিজয়ের শত্রু মনে হয়।
আশঙ্কা মতো দুর্যোগ শুরু হল বিকেলে। প্রথমে ঘূর্ণিঝড় উঠল। ঝোড়ো বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা গেল। খেয়াঘাটের দোকানগুলিতে শব্দ করে ঝাঁপ পড়ল। জেলেদের ডিঙি নৌকাগুলি টলমল দোল খেতে লাগল। বিশাল গাছেরা আত্মসমর্পণকারী ভঙ্গিমায় বার বার মাথা নত করল। তারপর শুরু হল বৃষ্টি। সঙ্গে মেঘের কড়কড় আওয়াজ আর বিদ্যুতের ঝলকানি। আকাশের মেঘ যেন আরও ঘনীভূত হয়ে রাতের গাঢ় অন্ধকারে শস্যক্ষেত শ্মশান ফেরিঘাট নদী গ্রাস করতে উদ্যোগী হল।
রণবিজয় সেদিনও এই দোতলা ঘরের জানলায় দাঁড়িয়েছিলেন। নজর ছিল খেয়াঘাটের দিকে। হাজারগুণ বেশি উদ্বেগ প্রতীক্ষা ছিল সরমার জন্য। হিসেবমতো সেসময় সরমার ওপারের খেয়াঘাটে পৌঁছানোর সময়।
সাধারণত সন্ধ্যা অন্ত প্রাক রাত্রে খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে যায়। রণবিজয়ের আশঙ্কা হল, এরকম তাণ্ডব চলতে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যাত্রী-অভাবে খেয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। নদীকূলে আছড়ে পড়া জলের শব্দে রণবিজয় অনুমান করলেন, এখন জোয়ার চলছে। দীর্ঘক্ষণ পর অসীম শক্তিধর বাতাস বৃষ্টির তাণ্ডব স্তিমিত হল। বন্ধ জানলার শার্সি দিয়ে রণবিজয় অস্পষ্ট আলো দেখে অনুমান করলেন, এখনও রাত হয়নি। খেয়া চলাচল শুরু হওয়ার আশায় বুক বাঁধলেন।
অবশেষে একখানা খেয়া এল। ক্লান্ত বৃষ্টি বাতাস উপেক্ষা করে রণবিজয় জানলার কপাট খুলে উৎগ্রীব তাকালেন। বাতাসে সোঁদা গন্ধ এসে ঘরে ঢুকল। খেয়ার যাত্রীরা একে একে ত্রস্ত

সকলে চলে গেল। কিন্তু, কোথায় সরমা। রাতের অন্ধকারকে এগিয়ে আসতে দেখে রণবিজয়ের নানা অশুভ আশঙ্কা হল। তিন বছর আগেকার ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব মনে পড়ল। সেবার একটা খেয়া নৌকা ডুবেছিল। সন্ধানী উদ্ধারকারী ডুবুরি জেলের জাল আর জলপুলিশের সেকি ব্যস্ততা। তেত্রিশজন যাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করা গিয়েছিল। আর ক'জন মারা গিয়েছিল তা কেউ জানে না। কত যে মাটির বাড়ি ধূলিসাৎ হয়েছিল। গাছ ভেঙেছিল টিনের চাল উড়েছিল। ছাগল বাছুর আছড়ে পড়েছিল।

রণবিজয় ভাবলেন, মানুষ বড় আশ্চর্যরকম স্বার্থপর। সবাই শুধুমাত্র আপনজনদের জন্য কাতর উদ্বিগ্ন থাকে। সেবার সরমা সঙ্গে থাকায় আজকের মতো উৎকণ্ঠা উত্তেজনা অস্থিরতা ছিল না। হতে পারে, সরমা দেব দ্বিজে বিশ্বাসী। ওর রক্ত উত্তপ্ত টগবগে, দৃষ্টি শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক। মানসিক শক্তিও প্রবল। কিন্তু, ভিন্নতর প্রয়োজনে ওর মধ্য দেহে যে তিনবার কঠিন অস্ত্রোপচার হয়েছে। ওর শীর্ণ শরীরটা ঝড়ের বেগে অনায়াসে আছড়ে পড়তে পারে। অনিবার্য মৃত্যু তখন কে ঠেকাবে?

হঠাৎই বিচলিত রণবিজয়ের মন বলল, এমনও তো হতে পারে যে আবছা আলোয় যাত্রীদের ভিড়ে সরমা নজরে পড়েনি। যদি কোনও দোকানে আশ্রয় নিয়ে থাকে। হয়তো টর্চ ছাতা হাতে রণবিজয়কে আশা করছে। সুতরাং আর কালক্ষেপ করলেন না। ঝটিতি সরমার সন্ধানে বের হলেন। জলকাদা আবর্জনা ডিঙিয়ে হু হু ঠাণ্ডার কামড়ে কাঁপুনি ধরা শরীরে খেয়াঘাটের সম্ভাব্য সব আস্তানায় খোঁজ করলেন। কিন্তু, কোথাও সরমাকে পেলেন না।

হতাশ রণবিজয় সিদ্ধান্ত নিলেন, শেষ খেয়া দেখে ফিরলেন। সেইমতো ঝিরঝির বৃষ্টিবাতাসে ছাতার তলায় খেয়াঘাটে দাঁড়ালেন। অস্পষ্ট আলোর বুক চিরে প্রত্যাশিত খেয়া এসে তীরে ভিড়ল হিমশীতল নিস্তব্ধতা সঙ্গে নিয়ে। সবার আগে লাফিয়ে নেমে পরিচিত এক যাত্রী সুমুখে দাঁড়াল। ওপারে বজ্রাঘাতে সরমার মৃত্যুসংবাদ জানাল বিষণ্ণ চোখমুখে। আকস্মিক আঘাতে অশ্রুবাক্‌শূন্য রণবিজয় পাথরমূর্তি হয়ে গেলেন।

সেদিনের স্মৃতিচারণে রণবিজয়ের বুক উজাড় করা মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস উড়ল। জ্বর তপ্ত রোগীর মতো অবসাদবোধ করলেন।

সরমা সঙ্গকালে রণবিজয়ের জীবনটা যথেষ্ট ছন্দগতিময় সার্থক সুন্দর ছিল। দিন মাস বছরগুলি অতিদ্রুত কোথা দিয়ে যে পার হয়ে যেত টেরও পাওয়া যেত না। এখানে এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। ফোন আসায় প্রিয় পরিচিত আপনজনেরা হামেশা খোঁজখবর নেয়। সন্তান সন্ততিরা একা অথবা দলবদ্ধভাবে আসা যাওয়া করে। সুযোগ সুবিধামতো দু'চারদিন থেকেও যায়। তাই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকায় বিকল্প হিসেবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর বসেছে। অনায়াসে টিভি ফ্রিজ পাম্প পাখা চলে, আলো জ্বলে। তবু, রণবিজয়ের যেন কিছুতেই সরমা শূন্যতা ভরাট হয় না। সর্বক্ষণ দুঃসহ নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। দেড় বছরকে দেড়শ বছর মনে হয়।

রণবিজয় বিস্তর চিন্তাভাবনার পর সম্প্রতি সবাইকে অবাক আলোড়িত করে খবরের কাগজে পাত্রী চাই কলমে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। পাত্র হিসেবে নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে লিখেছিলেন, একজন বিপত্নীক প্রৌঢ়ের জন্য যথোপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী চাই। যে কোনও বর্ণের বয়স্কা কুমারী বিধবা ডিভোর্সি চলবে।

সরমার সঙ্গে রণবিজয়ের বিয়ে হয়েছিল এমনি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই। সেবার কিন্তু এত

বেশি চিঠি আসেনি। এবার তো ফোনও এসেছে বিস্তর। একদিন সকালে চায়ের টেবিলে আগের দিন ডাকে আসা চিঠিগুলি খুঁটিয়ে পড়ায় ব্যস্ত। সেইসময় আই এস ডিতে সুদূর আমেরিকা থেকে ফোন এল। আমেরিকায় তো চেনা জানা কেউ নেই! রণবিজয় অবাক হলেন।

—আমার ফোন, ঠিক শুনেছিস তো? বনমালীর কাছে জানতে চাইলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার নাম ফোন নম্বরই তো বললেন।

—হ্যালো, রণবিজয় চৌধুরি বলছি। রিসিভার ধরে রণবিজয় বললেন।

—নমস্কার, আমি শালিনী সেনগুপ্ত ফ্রম চ্যাপেল হিল অব আমেরিকা।

—ঠিক চিনতে পারছি না তো।

—সেটাই স্বাভাবিক। নিখুঁত বাংলা উচ্চারণে শালিনী বলল, আপনি 'পাত্রী চাই' কলমে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। আমার মা পারমিতা মিত্র। ডিভোর্সি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা। ঠিকানা, কলকাতার নিউ আলিপুর। মনে পড়ছে?

—ইয়েস। আমিতো বিস্তারিত জানিয়ে চিঠির জবাব দিয়েছি।

—সে চিঠি মা পেয়েছে। আমরা খুবই উৎসাহী। আমার মনে হয়, আপনি সত্যিকার আগ্রহী হলে আর চিঠি চালাচালি না করে মার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা ভাল। দ্বিধা সঙ্কোচ কেটে গেলে নিউ আলিপুরের বাড়িতে আপনার একবার যাওয়া দরকার। সাক্ষাৎ আলোচনায় দু'জনে আরও অনেক সহজ হয়ে যেতে পারবেন। তারপর উপযুক্ত যথার্থ মনে হলে রেজিস্ট্রি বিয়ে করা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে।

—তোমাকে আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে। রণবিজয় খোলামনে প্রতিক্রিয়া জানালেন।

—ইজ ইট? শালিনী শব্দ করে সোচ্চার হাসল। পরে পালটা জবাব দিল, চিঠিতে সস্ত্রীক গৃহত্যাগ আর দ্বিতীয় বিয়ের উদ্দেশের স্বপক্ষে যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে আপনাকেও ইন্টারেস্টিং মনে না হওয়ার উপায় নেই।

—তুমি পড়েছ সেই চিঠি? অবাক রণবিজয় ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করলেন।

—ফোনে মা পড়েছে, আমি শুনেছি। ইন ফ্যাক্ট, আপনার বিজ্ঞাপনটা আমার রহস্যময় লেগেছিল। নিছক কৌতূহল বশত বকলমে আমিই চিঠি লিখেছিলাম। সেসময় এক বন্ধু কলকাতায় যাচ্ছিল। ওকে ওখানে টিকিট লাগিয়ে পোষ্ট করতে বলেছিলাম। নিখুঁত ছক ছিল, তাই আপনি ধরতে পারেননি। পরে অবশ্য ফোনে মাকে সবকিছুই জানিয়ে রেখেছিলাম, যাতে অপ্রস্তুত বিরক্ত না হয়।

—তারপর? এবার রণবিজয় কৌতূহলী হলেন, তোমার মা এখন কী বলছেন?

—আপনার জীবনপঞ্জী পড়ে মা দারুণ ইমপ্রেসড। শালিনী প্রখর পর্যবেক্ষণ প্রতিভার পরিচয় দিল, সব মানুষেরই একটা গোপন প্রয়োজনের ঘর থাকে। হয়তো ঠিক আপনার মতো দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মন মানসিকতার মানুষের সঙ্গ সান্নিধ্যের জন্য ওর সেই ঘর প্রস্তুত হয়েই ছিল। মা অনিচ্ছুক নয় বলেই তো আপনাকে ফোন করছি। উজ্জ্বল পরিণতির লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাবও রেখেছি। এবার সবকিছু আপনাদের দু'জনের হৃদয়-নির্ভর। উইশ ইউ গুড লাক। রণবিজয়কে আর কোনও কথা বলার সুযোগ দেয়নি শালিনী।

দুপুরে ফের আই এস ডিতে ফোন এল। এবার লন্ডনের ম্যানচেস্টার থেকে। পারমিতার পুত্র শালিনীর অনুজ প্রাঞ্জল দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচে জানাল যে, ভাইবোন দু'জনেরই অদূর ভবিষ্যতে

দেশে ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। শত অনুরোধ সত্ত্বেও পারমিতা মেয়ে বা ছেলের কাছে থেকে বাকি জীবন কাটাতে অনিচ্ছুক। সুতরাং, ওঁর নিরাপত্তার জন্য একজন নির্ভরশীল সঙ্গী অত্যন্ত জরুরী। ছোটবেলা থেকে যুবতী হয়ে ওঠা সর্বক্ষণের পরিচারিকার বিয়ে হবে বৈশাখের শেষে। সুতরাং তার আগে রণবিজয়ের সঙ্গে পারমিতার বিয়ে হলে ভাইবোন দু'জনে চিন্তামুক্ত হতে পারে।

প্রাঞ্জলের ভাব ভাষা শালিনীর মতো না। প্রতিটি শব্দবাক্য আবেগ আপ্লুত। কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার মতো অনুচ্চ মিনতি-মাখা।

প্রাঞ্জল রিসিভার রাখতেই রণবিজয় নিউ আলিপুরের নম্বরে ডায়াল করলেন। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর লাইন পেলেন।

—হ্যালো, ওপারের মিষ্টিমধুর নারীকণ্ঠে রণবিজয়ের শরীর শির শির করে উঠল।

—আমি পারমিতা মিত্রর সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

—পারমিতা মিত্রই বলছি। আপনি?

—আমার নাম, রণবিজয় চৌধুরি।

—হ্যাঁ, আপনার মুক্তাক্ষরে লেখা সুন্দর চিঠিটা আমি পেয়েছি। ভীষণ ভাল লেগেছে। অল্প কথায় এমন গুছিয়ে লিখেছেন যে, সহজেই আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে গেছে।

—সেটা কীরকম জানতে পারি কি?

—অবশ্যই না। সে তো আমার একান্ত নিজস্ব, বলব না?

—তবে থাক। রণবিজয় প্রসঙ্গ পালটালেন, শালিনী আর প্রাঞ্জল আজ আমাকে ফোন করেছিল।

—জানি। দু'জনেই আমাকে জানিয়েছে।

—কাল যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, সময় দিতে পারবেন?

—স্বচ্ছন্দে। আমার হাতে তো এখন অফুরন্ত নিষ্কর্মা সময়। বই পড়ে আর কত সময় কাটে। আপনার তবু চাষবাস বাগান নিয়ে সময় কেটে যায়।

—সে তো সকাল বিকেলের নরম রোদ্দুরে। সাইনাস আছে যে।

—তাহলে সকালে রোদের তেজ বাড়ার আগেই চলে আসুন। দুপুরে দুটো ডালভাত এখানেই খাবেন।

—ডাল ভাত তো ইদানীং নিত্য দিনের কপালের লিখন। আপনার ওখানেও সেই ডালভাত! তার চাইতে আমি বরং খেয়েই যাব।

—এই বয়সেও বেশ মজা করতে পারেন দেখছি। গাম্ভীর্যের মুখোশ খুলে পারমিতা অনেকদিন পর হাসলেন, বেশতো বলুন কোন খাবার আপনার পছন্দের?

—পছন্দের আইটেম ভবিষ্যতে দেখা যাবে। বেশি পদ আমি পছন্দ করি না। আমার পুকুরের রুই মাছ নিয়ে যাব। যতরকম যেভাবে খুশি রাঁধবেন। সঙ্গে একটু শুক্তো আর চাটনি, ব্যস। ডালকে না হয় কালকে দিলাম ছুটি।

ষাট ঊর্ধ্ব সুশ্রী পারমিতা সেজেছিলেন রুচি সম্মত। রেঁধেছিলেন ভাল। আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি ছিল না। আলাপ আলোচনা আত্মপ্রকাশে ছিলেন খোলামেলা। কিন্তু, কার্পণ্য ছিল হাসির বেলায়। ওঁর ঘরদোর আসবাবপত্র বিলাসদ্রব্য ছিল ছিমছাম সাজানো। অজস্র বইয়ের লাইব্রেরি, দুষ্প্রাপ্য ক্যাকটাসসমষ্টি আর ক্যাসেট মিউজিয়াম নজর কাড়ার মতো। সেদিন দু'জনে সংযত শালীনতায় নব আনন্দে কেটেছিল। আজ সেই পারমিতার আসার পালা। নিজের গাড়ি নিয়ে

আসতে চেয়েছিলেন। রণবিজয় বুঝিয়েছেন, খামোকা কী দরকার। বাড়ি অব্দিতো আর যাওয়া যাবে না। ড্রাইভারকে গাড়ি পাহারায় এপারে বুড়ুলঘাটে থাকতে হবে। তার চাইতে তারাতলার মোড় থেকে ডি এস বাস ধরা ভাল হবে। ওখান থেকেই ছাড়ে। দেড়ঘণ্টায় বুড়ুলঘাটে পৌঁছে দেবে। খেয়া পেরিয়ে ওপারে গেলেই বাড়ি। বাসুদেবপুর ঘাট থেকে দেখা যায়।

খেয়া আসার সময় হতে উত্তেজনায় এবার আর দোতলার জানলা থেকে নজররাখা নয়। দীর্ঘদেহী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তরতাজা রণবিজয় এখন খেয়াখাটে দাঁড়িয়ে। পরনে উজালা সফেদ দামী দক্ষিণী লুঙ্গি আর আদ্দির পাঞ্জাবি। হাতে পারমিতার জন্য আনা ছাতা আর গামছা।

আভিজাত্যে ভরা পারমিতা এলেন। পরনে সাদা সিল্কের শাড়ী। চোখে রোদ চশমা। কাঁধ অব্দি খাটো করে ছাঁটা চুল শ্যাম্পু ডাই করা। গলায় পরেছেন ঝুটা মুক্তা মালা। কপালে শোভনীয় টিপ। মণিবন্ধে স্বর্ণবলয়বন্দী ঘড়ি। বগলে সৌখিন শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। একহাতে স্বচ্ছ পলিপ্যাকে হলদিরামের মিষ্টি। অপরহাতে নজরদারী স্লিপার।

—এমনটিই আশঙ্কা করছিলাম। পারমিতা কাছে আসতে রণবিজয় বললেন, কাদা ভেঙে খেয়ায় উঠতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে?

—তেমন কিছু না। কমলা কোয়া ঠোঁটের আড়াল থেকে পারমিতার দুধ সাদা দাঁত ঝিলিক দিল, নতুন অভিজ্ঞতা তো হল।

—আমি তৈরি হয়েই এসেছি। রণবিজয় গামছা দেখিয়ে বললেন, বাঁধের ওপারেই টিউবওয়েল আছে। আগে পা ধুয়ে নেবেন চলুন।

পারমিতা ব্যাগ আর পলিপ্যাক রণবিজয়ের হাতে দিয়ে পা ধুলেন। এগিয়ে দেয়া গামছা ফিরিয়ে দিয়ে স্লিপার পরলেন। তারপর বাঁধে উঠে শুধু ব্যাগটা চেয়ে নিলেন। রণবিজয় ছাতা খুলে মাথায় দিতে বলায় অবাক হয়ে বললেন, ওই তো আপনার বাড়ি। এইটুকু যেতে ছাতা লাগে নাকি! তবু দিন, যখন এনেছেন।

—ওটাই যে আমার বাড়ি বুঝলেন কেমন করে? রণবিজয় জিগ্যেস করলেন।

—খেয়ায় একজনকে জিগ্যেস করতে বললেন। ওর কাছেই জেনেছি, ক্যানেলের ওপারটা চণ্ডীপুর। ওই বাড়িটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের বাংলো। উলুঘাটা বা শ্রীরামপুর নামে কোনও জায়গাতে নাকি ছোটখাটো একটা চিড়িয়াখানা আর ডাকবাংলো আছে।

—আর কিছু?

—আটান্ন গেট নামে একটা সুন্দর জায়গা আছে। সেখানে অনেকে পিকনিক করতে আসে।

—ব্যস? বাসুদেবপুরের পর রঘুনাথপুর গ্রাম, তারপর বেলারী। বেলারীতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মন্দির স্কুল ছাত্রাবাস আছে—এসব বলেনি?

—সময় সুযোগ পেলাম কোথায়? তার আগেই তো তরী এসে তীরে ভিড়ল। দেখলাম, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় সুভাষ মুখার্জির মতো চুল উড়ছে। সাদা পোশাকে দারুণ লাগছিল আপনাকে।

—তাই বুঝি! রণবিজয় ঈষৎ লাজুক বললেন, আপনাকেও আজ দেখতে খুউব সুন্দর লাগছে। আপনি যে এতটা সাজ সচেতন সেদিন বুঝতে পারিনি।

—শুনে খুশি হলাম।

পারমিতাকে খুশি রাখতে রণবিজয়ের আন্তরিকতার অন্ত নেই। নদীমুখি সেই ঘরের জানলা এখন উন্মুক্ত। সুমুখে রমণীয় দৃশ্য। বাতাসে ভেসে আসছে আমের মঞ্জরী আর বাতাবীলেবু ফুলের সুবাস। অচেনা পাখির ডাক। স্বয়ং রণবিজয় নিজ হাতে নিয়ে এলেন কাগজী লেবুর পাতা নিঃসৃত গন্ধেভরা শীতল পানীয়। সঙ্গে নারকেলের নাড়ু সন্দেশ আর ক্ষীর।

—এগুলি সব হোম মেড। রণবিজয় জানতে চাইলেন, চা না কফি খাবেন?

—কোনওটাই না। পারমিতা সরবতে চুমুক দিয়ে বললেন, আপনি বরং বসুন।

—একটু পরে। আমি বরং রান্নার দিকটা একটু দেখে আসি। তারপর চুটিয়ে গল্প করা যাবে। পারমিতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

খাবার টেবিলে বসে পারমিতার চক্ষু চড়কগাছ। ঝাঁ চকচকে দুর্লভ কাঁসার থালায় ভাত ঘি। বেগুন আর ফ্যাসা মাছ ভাজা। ছোট ছোট বাটিতে সাজানো ডাল, চিংড়ির মোচাঘণ্ট, মৌরলা-চচ্চড়ি, সরষে-তপসে, ঝাল-কাজলি আর তেল কই। সবশেষে আমসত্ত্বর চাটনি আর ঘন দুধের পাথর বাটি।

এতসব রাঁধল কে? আয়োজনের বহর দেখে মেকি ভদ্রতায় না গিয়ে পারমিতা জিগ্যেস করলেন।

—রান্নায় সরমার সুখ্যাতি ছিল। এখন তো আর কপালে জোটে না। আমি আর বনমালী কোনও রকমে চালিয়ে নেই। সে সব হাত পোড়ানো রান্না তো খাওয়ানো যায় না। কেউ এলে বনমালী ওর বুড়ি মাসিকে ডেকে আনে। চণ্ডীপুরে থাকে।

—কিন্তু, এই খাবারগুলি যে আমার পছন্দের তা জানলেন কেমন করে?

—পরশু শালিনী ফোন করেছিল। আমি যে গিয়েছিলাম, আজ আপনি আসবেন—সেসব শুনল। তারপর আপনার পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে অনেককিছু বলল। আমি জিগ্যেস করে জেনেছি। দুধ ঘি ডাল ইত্যাদি অবশ্য বলেনি।

—শালিনী আমার বন্ধুর মতো। কখনও সখনও আবার অভিভাবকও বটে। প্রাঞ্জল অনেকটা ওর বাবার ধাঁচের। অঢেল অর্থ উপার্জন ভোগ বিলাস আর স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চায় না। সেই যে গেল, আর আসেনি। বউমা নাতিকে ফটোতেই দেখি।

—নিছক কৌতূহলে একটা প্রশ্ন করব? রণবিজয় যথেষ্ট দোনামনা বললেন।

—প্রশ্নটা কী?

—শালিনী প্রাঞ্জলের বাবা এখন কোথায় জানেন?

—এখন কোথায় তা বলতে পারব না। সেসময় ওমানে ছিল। আমাকে এখানকার চাকরি ছেড়ে যেতে বলেছিল। তা কখনও হয় নাকি। একমাত্র সন্তান। আমিও চলে গেলে ওর মা বাবাকে দেখত কে? ওর মা বাবা আর আমার দু'টি—এই চার সন্তানের মুখ চেয়েই আমি দ্বিতীয় বিয়ে করিনি। আমাদের ডিভোর্সের পর মা বেশিদিন বাঁচেনি। বাবা ওকে জানাননি। বাবা নামী অ্যাডভোকেট ছিলেন। বিষয় আশয় আমার নামে লিখে দিয়ে বলেছিলেন, ওঁর মৃত্যু সংবাদও যেন জানানো না হয়। অন্য কোনও সূত্রে খবর পেয়ে হাজির হলেও যেন মুখাগ্নি থেকে বঞ্চিত করা হয়। সেদিন যে গাড়িতে করে ড্রাইভার আপনাকে তারাতলা অব্দি এগিয়ে দিয়েছিল সেটি আমার শ্বশুরমশায়ের। নইলে ছেলেমেয়েকে মানুষ করে একজন অধ্যাপিকার কী এমন সাধ্য যে গাড়ি কিনবে?

—আমি কিন্তু এত কিছু জানতে চাইনি।

—তবু জানা দরকার। পারমিতা খাওয়া শেষ করে ফের সেই দোতলার ঘরে জানলার কাছে বসলেন। প্রকৃতির মতো নিজেকে উন্মুক্ত করলেন, আমি ইছামতী নদীর ধারের টাকির মেয়ে। কলকাতার ডাস্টবিন, আবর্জনা, গাড়ির হর্ণ, ধোঁয়া, মিছিল স্লোগান হৈ হট্টোগোল খুন খারাপি রঙ চঙ ঠাট বাট অপছন্দ হলেও উপায় ছিল না। এখন চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত। সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে যখন বৃদ্ধাবাসে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম সেইসময় শালিনী এমন একটি অকল্পনীয় কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে।

নিউ আলিপুর থেকে বেহালা এমন কিছু দূর নয়। রণবিজয় সহমর্মিতায় দু'জনের দূরত্ব কমিয়ে আনতে বললেন, আমি যে কেন এখানে চলে এসেছি তা কিছুটা লিখেছি বাকিটা সেদিন বলেছি। এখানকার ঘাস মাটি মাছ পাখি পুকুর ফুল ফল আমার প্রাণ আনন্দ স্বজন। তবু সরমা-শূন্যতায় কেমন যেন অপরিপূর্ণ আমি। তাই তো—।

দু'টি নিঃসঙ্গ মানুষ মানুষীর বিষণ্ণ বিলাপ মিলেমিশে একাকার হয়। দ্রুত সময় কেটে যায়। রোদের তেজ নরম হয়ে আসে। ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ তুলে এক ঝাঁক টিয়া পাখি উড়ে যায়। দূরে ডাহুক ডাকে। চালতা হরিতকি কামরাঙা আমলকি ফলসা লিচু সবেদা আম জাম কাঁঠাল জামরুল গাছে কাঠবেড়ালি লাফায়। রঙ বেরঙের পাখি, শালিক, বুলবুলি ওড়াওড়ি করে। অপরাজিতা ঝুমকো লতা দোল খায়। ফুল বাগানে ফড়িং প্রজাপতির পাখনা ফুর্ ফুর্ পত্পত্ চঞ্চল। টলমল জলের পদ্মবনের ধারে মাছরাঙা ওৎ পেতে থাকে।

একসময় বনমালী এসে চা দিয়ে যায়। পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়ে। নদী টইটম্বুর জোয়ারের জলে। রণবিজয় আর পারমিতার কথোপকথনে ভাটা পড়ে।

—এবার আমাকে ফিরতে হবে। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে পারমিতা উঠে দাঁড়ালেন।

—কেমন লাগল জায়গাটা? বুড়ুলঘাটে পারমিতাকে বাসে তুলে দিতে এসে রণবিজয় জিগ্যেস করলেন।

—ফ্যানটাসটিক। আপনাকেও খুউব ভাল লাগল।

—তাহলে?

রণবিজয় যে ঠিক কী জানতে চাইছেন, পারমিতা তা বুঝতে পারলেন। তাৎক্ষণিক কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। সবকিছু ঠিকঠাক আকর্ষণীয় মনের মতো হওয়া সত্ত্বেও দ্বিধা দ্বন্দ্ব হল। ভাবলেন, যুগল হলে নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ শূন্যতা হয়তো থাকবে না। কিন্তু অনিবার্য একদিন, দু'জনের একজনকে তো যেতেই হবে আগে। সেই প্রথমজন যদি রণবিজয় হয়?

—আমার একটা প্রশ্ন আছে। রণবিজয়ের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে পারমিতা জানতে চাইলেন, আপনার দেয়া বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি বা ফোনে মোট কতজন সাড়া দিয়েছেন?

—তা প্রায় পঞ্চাশ হবে।

সংখ্যাটা শুনে পারমিতা আশ্বস্ত হলেন। মনকে বোঝালেন, অদূর ভবিষ্যৎ হলে তখন ওঁর দেয়া বিজ্ঞাপনের উত্তরের সংখ্যাটা একশ হতে পারে। অনেক বছর পরে পাঁচশ হওয়া অসম্ভব কিছু না।

ভোগবতী গঙ্গা সাধুসঙ্গ

গঙ্গার বিবিধ মহিমা।

ক্রুদ্ধ জহ্নুমুনি গঙ্গাকে পান করে পুনরায় নিজের জানু দিয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন তাই এক নাম জাহ্নবী। ভগীরথ মর্তে নিয়ে এসেছিলেন বলে অপর নাম ভাগীরথী। বসু গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মরূপে জন্ম নেওয়ায় আর এক নাম ভীষ্মজননী। স্বর্গ মর্ত পাতাল—এই ত্রিধারায় প্রবাহিতা অপরূপা গঙ্গার নাম ত্রিপথগামিনী। স্বর্গধামের অংশ মন্দাকিনী। লবণ সমুদ্রে মিলিত ধারা অংশ অলকানন্দা। পাতাল গমন অংশের নাম ভোগবতী।

সময়, শরৎকাল। স্থান, প্রবাহমনা গঙ্গার তীরভূমি।

পুষ্পোদ্যান পরিবেষ্টিত একটি আশ্রম। চারদিক ঘিরে শ্যামল শোভা। অদূরে শত শৃঙ্গের কয়েকটি পর্বত। সবুজ বনানী। পরিপূর্ণ সরোবর। নির্মল আকাশ। বাতাসে ভাসছে চন্দন চম্পক মন্দারের সুবাস। বর্ণময় ফুল ফল পশুপক্ষী। আর রমণীয় অরণ্য।

ওঁ ভোর ভুবনস্বহাঃ।

পুবের আকাশে জবাকুসুম সূর্য দৃশ্যমান।

আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘকালীন তপস্যা-সফল শীর্ণদেহী তপস্বী। অবগাহন স্নানান্তে কৃতাঞ্জলি পুটে উদাত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করছেন,

ওঁ জবাকুসুম সংকাশন কাশ্যপিয়ম্
মহাধুতিং ধনতারিং সর্বপাপঘ্ন
প্রণতস্মি দিবাকরম্.....।

সূর্য প্রণাম অন্তে তীরভূমিতে উঠে এলেন তপস্বী। ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান কালে বাকশূন্য বিস্মিত হলেন। তিনি কী দেবদর্শন করছেন!

শান্ত সুন্দর যৌবনদীপ্ত দীঘদেহী যুবকটি অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। যুবা পুরুষটির চোখ মুখ ঠোঁট চিবুক উজ্জ্বল। মাথায় রাশি রাশি পীতবর্ণের কেশ কুণ্ডলী। বিভক্ত সিঁথি। কেশগুলি কাঁধের ওপর পর্যন্ত ঝুলন্ত। নিলাভ চাহনিতে স্নিগ্ধ গভীরতা। মুখশ্রীতে পরম পবিত্র করুণার কোমলতা। একজন তপস্যা সফল তপস্বীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিবিনিময় অসম্ভব।

লাজুক বিনয়ী নম্র যুবা পুরুষটি ভূমিতে দৃষ্টি নামাল। তারপর সাহস সঞ্চয় করে তপস্বীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সম্মানসূচক অভিবাদন জানিয়ে উপবিষ্ট হয়ে তপস্বীর উজ্জ্বল গৈরিক পদযুগল স্পর্শ করল। শান্ত স্নিগ্ধ প্রার্থনা জানাল, আমাকে দীক্ষা দিন প্রভু।

তোমার পরিচয়? সস্নেহে কেশ স্পর্শ করে তপস্বী জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি পরম করুণাময় সৃষ্ট একজন সামান্য মানুষমাত্র। অধিক পরিচয়দানে অক্ষম আমাকে মার্জনা করবেন।

তথাস্তু। তপস্বী প্রীত হলেন। যুবাপুরুষটির হাত ধরে তুললেন, প্রথম দর্শনে তোমাকে রাজবংশজাত বলেই অনুমান। যদি কোন পাপ স্পর্শ করেই থাকে তজ্জন্য দীক্ষা নেয়া নিষ্প্রয়োজন। অনুতাপ কর। অনুতাপানলে দগ্ধ হলেই পবিত্র হবে। আমার নিকট কেবলমাত্র অনুতাপের দীক্ষাই সম্ভব।

আমি যে আত্মার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেয়ার প্রত্যাশায় এসেছি। ভবিষ্যতের জন্য পথ প্রদর্শন করুন মুনিবর।

অন্নহীন ক্ষুধার্তকে অন্ন বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান কর বৎস। ঈষৎ হাসিমুখে তপস্বী বললেন, সর্বজীবে প্রেম ভালবাসা দাও।

আমি সংসার-ত্যাগী। আমাকে কী বনবাস থেকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিচ্ছেন মুনিবর? সবিনয়ে জানতে চাইল যুবাপুরুষটি।

অবশ্যই।

আশাহত যুবাপুরুষটি বিমর্ষ বোধ করল। চোখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

বনবাসী সাধকের কণ্ঠ থেকে তো সেই বাণীই শ্রবণীয় ছিল, 'এই জগত মায়া বিশেষ। এখানে যা বহু ও বিচিত্র মনে হয় তা প্রকৃতপক্ষে একই সৎবস্তুর বিকার মাত্র। সুখ দুঃখ মায়ার কাণ্ড। দুঃখ থেকে নিবৃত্তির উপায় মায়াকে অতিক্রমন। জগত--দুঃখ সুখকে অস্বীকার করা। বিশুদ্ধ অবিকৃত সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাওয়া।'

যুবাপুরুষটির ঈঙ্গিত বাসনা তপস্বীর নিকট স্বচ্ছ হল। তিনি স্মিত হাসলেন। তারপর দূরের পর্বত গাত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দিষ্ট করলেন।

কি দেখতে পাচ্ছো?

একটি দেবমন্দির।

দেবমন্দিরে কি হয় জান?

করুণাময় ঈশ্বরের আরাধনা।

ঈশ্বর-আরাধনা কি কেবলমাত্র দেবমন্দিরেই সীমাবদ্ধ? কঠিন প্রশ্ন রাখলেন তপস্বী। তারপর উত্তরের অপেক্ষায় থাকলেন না, তুমি এক অপূর্ব ধর্মসঙ্গমস্থলে এসেছো বৎস। এসেছোই যখন কিছুদিন আমার আশ্রমে থাক। আপন মনে যথেষ্ট দ্বিধাহীন বিচরণ করে বেড়াও। দেখবে, তোমার মনের বহু জটিল প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকেই পেতে সক্ষম হবে। তারপর গৃহে ফেরা না-ফেরার সিদ্ধান্ত নিও।

যথা আপনার নির্দেশ প্রভু। যুবা পুরুষটি সম্মতি জানাল।

অতঃপর যুবা পুরুষটি তপস্বীর নির্দেশমতে নদীতে অবগাহন স্নান করল। আশ্রমে এসে শুচিবস্ত্র পরল। ভূমিষ্ঠ হয়ে গুরু প্রণাম করল।

মাথায় আশীর্ব্বাদ সূচক হাত রেখে তপস্বী বললেন, সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর পূর্বেকার নাম পরিচয় বিলুপ্ত হয়। তাই বনবাসকালে তুমি প্রিয়ঙ্কর নামে পরিচিত হবে।

এভাবেই দীক্ষিত হল প্রিয়ঙ্কর।

দীক্ষান্তে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত প্রিয়ঙ্কর বললেন, আপনি সম্ভবত তপস্যা সাফল্যে ক্ষুধা-অনুভূতি উত্তীর্ণ সিদ্ধ পুরুষ। আমাকেও ক্ষুধা-উত্তীর্ণের পথ প্রদর্শন করে শারীরিক দুর্বলতা থেকে রক্ষা করুন গুরুদেব।

তোমার অনুমান ভ্রান্ত বৎস। তপস্বী ভ্রান্তি মোচন করে বললেন, সংসার ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীদেরও ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি থাকে। আহার্য পানীয় ঔষধ বস্ত্র প্রয়োজন হয়। তুমি পরম করুণাময়ের দান ফলমূল পানীয় গ্রহণ কর।

আর আপনি?

এখন আমার আহ্নিক সময়। ইষ্টনামে ধ্যানস্থ হব আমি।
রাত্রিকালে জ্যোৎস্নালোকিত আঙিনায় বসে তপস্বী প্রশ্ন করলেন, প্রকৃতিময় বিচরণকালে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণীয় কিছু দৃষ্টিগোচর হল?
বিচ্ছিন্ন এককভাবে কোন কিছুই যথাযথ রমণীয় মনে হয়নি আমার। প্রিয়ঙ্কর স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করলেন, বৃক্ষ পর্বত তৃণ নির্ঝর ফলমূল শোভিত সম্মিলিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই আমাকে বিস্মিত অভিভূত করেছে। একক অর্থইতো অপূর্ণ। সেই অপূর্ণতায় আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না।
তথাপি তোমার মনোনিবেশ বাঞ্ছনীয় ছিল। তপস্বী কারণ দর্শালেন, যেহেতু তন্মধ্যে শিক্ষনীয় কিছু ছিল।
কী সেই শিক্ষনীয়? প্রিয়ঙ্কর সঙ্কুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।
প্রাণী-পদাহতা অবিচলিত পৃথিবী বলছে, ক্ষমা করতে শেখ। পর্বত বৃক্ষ তৃণ নির্ঝরাদির বক্তব্য, পরোপকারী হও। সমর্পণ আর পরম সহিষ্ণুতার শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত, বৃক্ষ। নির্বাক আকাশ উদার মুক্ত হতে বলছে।
তপস্বীর প্রথম শিষ্য প্রিয়ঙ্করের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন এক নতুন জগতের চিত্র ফুটে উঠছে। শরীরে উন্মুক্ত বাতায়ন পথের শীতল সুবাসিত বাতাসের স্পর্শ লাগছে।
তপস্বী অনর্গল বলে চলেছেন, যেদিকেই দৃষ্টি দেবে অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু ঈশ্বরের দান দেখতে পাবে। শীতবস্ত্র ভারবহন আর গমনাগমনের জন্য তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন। শস্য উদ্ভিদের জন্ম পশুচারণ আর পানীয় জলের জন্য। আকাশ থেকে বর্ষা নামছে তাঁরই ইচ্ছাতে। দিক্‌নির্ণয়ের জন্য আছে নক্ষত্র। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পর্বত।
মুগ্ধ অভিভূত প্রিয়ঙ্কর নির্বাক শান্ত স্তব্ধ।
আবহমান কাল থেকে মানুষ ধর্মাচারণ করছে কেন? উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে তপস্বী বলে চলেছেন, পার্থিব জগত যে সম্পূর্ণ সুখকর নয়। দুঃখের পরিমাণই বেশী। আর সেই দুঃখ থেকে মানুষ নিবৃত্তি কামনা করে। নিবৃত্তির পথ সন্ধানের উপায়ের জন্যই ধর্ম জিজ্ঞাসা। অসীম শক্তিধর সৃষ্টিকর্তাকে কল্পনা। দুর্জ্ঞেয় শক্তিই মানুষের কাছে পরমেশ্বর ঈশ্বর আল্লা পরমপিতা। ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য মহাপুরুষের অবলম্বিত সাধন-নীতিই ধর্মনীতি।
সর্বধর্মের মূল সুর কি গুরুদেব?
প্রেম ভালবাসা। প্রাণীমাত্রই পরমেশ্বরের সৃষ্টি। অতএব, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালবাসতে শেখ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রেমসাধনা সুখদুঃখময়। পার্থিব জীবনে পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ—সবই স্বীকার্য। তবে তাতে ভীত হওয়ার কিছু নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পালন করার মধ্য দিয়ে দুঃখ পাপ থেকে নিবৃত্তি লাভ সম্ভব।
রাত্রি গভীর হচ্ছে। তথাপি গুরুশিষ্যের চোখে নিদ্রা ক্লান্তি নেই। বিশ্ব চরাচর বিস্মৃত প্রিয়ঙ্কর ভূ-তলে স্বর্গরাজ্য স্থাপন সম্পর্কে তপস্বীর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।
এহেন শিক্ষার্থী পুরুষকে শিষ্যরূপে পেয়ে তপস্বীও পরম তৃপ্ত। বিতরণের মধ্য দিয়েই তো জ্ঞান বিস্তার লাভ করে। অন্যান্য সবকিছুইতো বিতরণে লোপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেকারণে তপস্বী প্রফুল্ল চিত্তে বললেন, পার্থিব আর পারমার্থিক জীবনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ব্যবধান রচনা

অনুচিত। সর্বধর্মের দ্বিধাহীন ঐক্যমত, কু অনুসরণে দুঃখ ও মৃত্যু। সু অনুসরণে সুখ ও অনন্ত জীবন।

মানব সমাজ সংসার জীবনে এত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ কেন গুরুদেব?

সম্ভবত এই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তোমার সংসার ত্যাগের কারণ। তপস্বী তাঁর অনুমান যথার্থ কিনা জানতে চাইলেন। স্নিগ্ধ হাসি মুখে উত্তর দিলেন, সংঘর্ষের মূলে থাকে স্বার্থ। কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি ষড়রিপুই সেই স্বার্থের উৎস। পরিণাম দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষ। স্বার্থের এই উৎসকে দূরীকরণের জন্য সকল ধর্মেই যথাযথ নির্দেশ আছে।

প্রশ্ন উত্তর পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন তপস্বী। প্রিয়ঙ্করের মনে পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, সর্বজীবে প্রেম ভালবাসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম সুখ শান্তির সহায়ক সত্ত্বেও প্রবজ্যা সন্ন্যাস তপস্যা সাধনার নিমিত্ত সংসারত্যাগী বনবাসী হওয়া কেন? অগত্যা নিজের কাছেই উত্তর চাইলেন প্রিয়ঙ্কর।

পরদিন প্রভাত কাল। অরণ্য আকাশ প্রকৃতির বর্ণ পরিবর্তিত হচ্ছে। গঙ্গাস্নান সূর্য প্রণামে যাবেন তপস্বী। আজ সঙ্গী হয়েছেন প্রিয়ঙ্করও। পথিমধ্যে গতরাত্রে উত্তর খুঁজে না-পাওয়া প্রশ্নটা তপস্বীর কাছে নিবেদন করলেন।

স্নানে নামার পূর্বে তপস্বী বললেন, দুঃখকর বনবাস সন্ন্যাসীদের নিকট আনন্দনিবাস। উদ্দেশ্য, বিধিমতে নির্জন একান্তে ওঁঙ্কারমন্ত্র যপ। প্রাণায়াম মনকে স্থির রাখে। স্থির মুহূর্তে বুদ্ধি হয় সারথি। উদ্ভুত মনশক্তি চক্ষু ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে সক্ষম। এইরূপ মানসিক অবস্থাই ঈশ্বরচিন্তার অনুকূল। ঈশ্বরের সহিত হৃদয়ের সংযোগেই 'সত্যদৃষ্টি' লাভ করা যায়। আশীর্বাদ করছি, সত্যদৃষ্টি লাভে তুমি সক্ষম হও। জয়তু ভব।

দুই

সময়কালের গতি গঙ্গার ন্যায় বেগবতী। মানুষ মহাকালের কাছে ক্রীড়নক মাত্র। ঘটনা সর্বদাই ভাগ্যচক্র তাড়িত।

মাসাধিককাল যাবত প্রিয়ঙ্কর তপস্বীর আশ্রমে আশ্রিত। বনপ্রকৃতিময় ভ্রমণ বিচরণে মুক্ত পুরুষ। যপ তপ মন্ত্র উচ্চারণ তপস্যায় উৎসাহিত করেন না তপস্বী। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যা-উত্তীর্ণকালে সর্বধর্মীয় তত্ত্বকথা শুনিয়ে থাকেন।

দুঃখের কারণ স্বরূপ স্নেহ মায়া প্রেম মমতার সূত্র ছিন্ন বর্জন করে শান্তি লাভের আশাতেই মানুষ বনবাসী হয়ে থাকে। কীমাশ্চর্যম্! পিতৃস্নেহ আদরে প্রিয়ঙ্করকে পুত্রজ্ঞানে মায়াময় বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইছেন তপস্বী? প্রিয়ঙ্কর যথেষ্ট বিব্রত আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

এই আশ্রম থেকে অন্তর্ধান সমুচিত হবে কিনা তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বিত হলেন।

সিদ্ধিলাভের জন্য নির্জনতা আবশ্যক। মোহজাত স্নেহবোধ থেকে শোকের উদ্ভব। রাজপ্রাসাদের সুখভোগে বৈরাগ্য আসায় যুবাপুরুষটির চোখে এখন এক অন্য স্বপ্নের জগত। মাটিতে শয্যা, হাতই বালিশ। করপুটে ভোজন। আহারের জন্য ফল আর নদীনালা সরোবরের জলই পানীয়। অবস্থান আবাস আচ্ছাদনের জন্য পর্বত-গুহা আর বৃক্ষ-ছায়া।

অবশেষে যুবাপুরুষটি দ্বিধাদ্বন্দ্ব জয় করলেন। আগুনের মত দুর্ধর্ষ, সিংহের মত পরাক্রান্ত হয়েও তিনি মহাত্মাদের গন্তব্যদিক উত্তরমুখি হলেন। উদ্দেশ্য, পরম ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন।

উপবন পর্বত নদী তপ্ত প্রান্তর—বহুযোজন পথ অতিক্রম করে যুবাপুরুষটি ঘর্মাক্ত তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। ধুলায় মলিন তাঁর কেশ বস্ত্র। পদযুগল ক্ষত রক্তাক্ত।

বর্ণালী ফুলফল শোভিত এক অরণ্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন যুবাপুরুষটি। সরোবর তীরে বৃক্ষছায়ায় পদযাত্রার বিরতি টানলেন। জল আচমন অন্তে ফলাহার করে শীতল ছায়াঘন পল্লবশয্যায় শয়ন করলেন।

শ্রান্তিতে আতুর যুবাপুরুষটির অর্দ্ধনিমিলিত চোখে এখন, কয়েকশত যোজন দূরবর্তী বিশ্ববিল্ব রাজ্য। সম্রাট বিশালাক্ষ্য। শিক্ষাগুরু অয়নাচার্য। গুরু-কন্যা পৃথা। মহিষী অদিতি। বিশালাক্ষ্য-ভ্রাতা মিত্রাক্ষ্য। এবং মহারাজের সবিশেষ প্রিয় স্নেহভাজন স্বয়ং অঞ্জনাক্ষ্য।

তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ অগ্নির মত অঞ্জনাক্ষ্য ধনুর্ধারী বলবান। সর্বপ্রকার তেজদীপ্ত কলাবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী। গুরুগৃহে স্বল্প শাস্ত্রপাঠ ও সঙ্গীত বিদ্যারও অধিকারী।

অঞ্জনাক্ষ্যর জন্য রাজপ্রাসাদে সুখভোগ সমাদর ছিল পর্যাপ্ত। মহানন্দে দিন যাপনকালে অঞ্জনাক্ষ্য জানতেন না, কেন কাকাশ্রী মিত্রাক্ষ্য তাকে ঈর্ষা করেন। রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবীতে মিত্রাক্ষ্যর বিদ্রোহী-বাক্যের কারণও অজ্ঞাত ছিল। পৃথা প্রেয়সী হওয়া সূত্রে একদিন নির্মম দুঃসহ গোপন সত্য তথ্যটা প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

অঞ্জনাক্ষ্যকে নিভৃতে ডাকলেন গুরুদেব অয়নাচার্য। একান্ত ধীর স্থির শব্দ বাক্যে বোঝালেন, তুমি অবশ্যই আমার শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার বিশেষ বিশেষ গুণাবলীতে আমি গর্বিতও বটে। পৃথার প্রতি তোমার আসক্তিও আমার অজানা নয়। অস্বীকার করা যায় না, তোমাকে স্বামীরূপে পাওয়ার অধিকারিণী হলে পৃথা ধন্য হবে। আমার পক্ষেও তোমার মত উপযুক্ত জামাতা পাওয়া ভাগ্যের কথা। তথাপি—

তথাপি কি গুরুদেব? বাক্‌রুদ্ধ অয়নাচার্যের বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করলেন অঞ্জনাক্ষ্য।

সে বড় নির্মম সত্য বৎস। অয়নাচার্যের চোখ মুখে যন্ত্রণা ফুটে ওঠে, ব্যক্ত হলে তোমার পক্ষে সহ্য করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে হয়ত। তাই আমি ভীত।

না গুরুদেব। সত্যকে সহ্য করার ক্ষমতা আমার আয়ত্তাধীন। আপনি দ্বিধাহীন সত্য প্রকাশ করুন।

বিবাহকালে পিতৃমাতৃ পরিচয় যে একান্ত আবশ্যিক পুত্র। অয়নাচার্য অতঃপর অঞ্জনাক্ষ্যর পরিচয় উদঘাটন করলেন, তুমি সম্রাট বিশালাক্ষ্যর ঔরসজাত পুত্র নয় বৎস।

তাহলে? অঞ্জনাক্ষ্য অবিচলিত ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

মৃগয়াকালে অরণ্যস্থিত ঝর্ণার নিকট স্বয়ং সম্রাট তোমাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। অপুত্রক সম্রাট তোমাকে ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তুমি রাজপুত্রসম সম্রাটের পালিত হলেও পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন মাত্র।

ব্যক্তির চরিত্রগত পরিচয়ই যথার্থ। অঞ্জনাক্ষ্য দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, মানুষের গুণেই তার প্রকৃত পরিচয়। সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। তথাপি পৃথার সঙ্গে প্রেম বিবাহে বিভেদ সৃষ্টি করছেন কেন?

শত সহস্র গুণের অধিকারী সত্ত্বেও জন্ম পরিচয় ব্যতীত পৃথার সঙ্গে তোমার বিবাহে সম্মতি দেয়া আমার পক্ষে কঠিন অসম্ভব। অয়নাচার্য পৌরুষোচিত বজ্রকণ্ঠে নির্ভীক জবাব দিলেন, কেবলমাত্র বীরোচিত শক্তিপ্রয়োগ মাধ্যমেই পৃথাকে জয় করা সম্ভব। আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে কী তুমি ইচ্ছুক? আমি প্রস্তুত।
নারীলাভ হেতু গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ! অঞ্জনাক্ষ্য বিনয়াবনত সম্মান প্রদর্শন করলেন, আমাকে মার্জনা করবেন গুরুদেব।

যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিচারণে বিমর্ষ দুর্বল প্রিয়ঙ্কর। বিশ্রাম অন্তে চোখের পাতা উন্মুক্ত করলেন। এ যে অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর দৃশ্য!
সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন জ্যোর্তিময় সৌম্যদর্শন এক ঋষিপুরুষ। পরনে গৈরিক ব্যসন। কুঞ্চিত ললাটে আঁকা অর্ধচন্দ্র। কেশ ও শ্মশ্রু পক্ক। নাশা উন্নত। গলদেশে উপবীত। হাতে ত্রিশূল আর করমণ্ডলু।
প্রিয়ঙ্করের গলায় লাল সুতোয় গ্রথিত ঝুলন্ত রুদ্রাক্ষটি দেখামাত্র ঋষির চোখের সামনে পঞ্চ বিংশতি বৎসর পূর্বেকার একটি দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠল।
এই সেই স্থান। বনবৃক্ষ লতাগুল্মের অন্তরালবর্তী পর্ণকুটিরটি ঈষৎ দৃশ্যমান।
দিনটি ছিল নবজাতকের মঙ্গল কামনায় বেদপাঠ ও নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের। আকস্মিক উপস্থিত ঋষি দর্শনে নবজাতকের মা লজ্জা সঙ্কুচিতা হলেন। সন্তানকে স্তনদানে বিরতি টানলেন। অতঃপর ঋষিকে ভক্তিপূর্ণ সম্ভাষণ পূর্বক পদযুগল ধোয়ার জন্য জল দিলেন। উপবেশনের জন্য দিলেন আসন।
ফলাহার ও দুধ পান করে ঋষি পরম তৃপ্ত হলেন। শিশুপুত্রটি এতক্ষণ হাত পা সঞ্চালন করে ক্রন্দনরত ছিল। এক্ষণে হাসি মুখে নীলাভ চোখে ঋষির দিকে তাকাল।
শিশু পুত্রটির দেহে করমণ্ডলুর জল সিঞ্চন করলেন ঋষি। আশীর্বাদ স্বরূপ একটি রুদ্রাক্ষ ফল অর্পণ করে বললেন, সুখায় ভবতু। আয়ুষ্মান ভব। শিশুপুত্রের মাকে উদ্দেশ করে নিজেকে সুদক্ষ শাস্ত্রবিদ পরিচয় দানে ভবিষ্যৎ বাণী শোনালেন, তোমার সন্তানটি অবশ্যই সর্ববিধ তেজদীপ্ত কলাবিদ্যায় পারদর্শী হবে। শাস্ত্রজ্ঞ সঙ্গীতপ্রিয়তার লক্ষণও সুস্পষ্ট। প্রতিলোমজ শিশুটির অশুভ দিকও দেখা যাচ্ছে। শিশুটির জীবন বড়ই বৈচিত্র্যময় হবে। পুত্রটির ঔরসে রাজমহিষীর গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা প্রবল। যদিচ সম্ভাবনা ক্ষীণ তথাপি উত্তরকালে পুত্রটি পিতৃঘাতী পুরুষ হতে পারে। তবে সর্বত্যাগী সম্যক সম্বন্ধ সর্বজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। প্রদত্ত রুদ্রাক্ষ ফলটিই রক্ষাকবচ। প্রয়োজনে লালসূত্রে গ্রথিত করে এই রক্ষাকবচটি গলায় ধারণ করাবে।
এক্ষণে দিনমণি অস্তাচলগামী। পরিবর্তিত প্রকৃতির বর্ণ। পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে আছে লাল হলুদ আভা। কুলায় ফেরা পাখিদের কুজন ক্লান্ত অস্পষ্ট।
প্রিয়ঙ্করের শরীরে এক স্বর্গীয় রোমাঞ্চ অনুভূত হল। দেবতুল্য জ্যোতির্ময় ঋষিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন প্রিয়ঙ্কর।
সুখায় ভবতু। আয়ুষ্মান ভব। আশীর্বাদ-উচ্চারণ পূর্বক ঋষি প্রশ্ন করলেন, ললাটে তোমার চিন্তারেখা সুস্পষ্ট। কীসের জন্য তোমার হৃদয় মন চঞ্চল? দ্বিধাহীন ব্যক্ত কর।

আমি বড়ই ভাগ্যহীন ঋষিবর। নিজের ভাগ্য বিপর্যয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করে প্রিয়ঙ্কর বললেন, আমি শান্তি প্রত্যাশী। কোন ধর্মে দীক্ষালাভে শান্তিলাভ সম্ভব?

ধর্মে দীক্ষিত হতে চাও? ঈষৎ হাসিমুখে ঋষি বললেন, ধর্ম একটিই—মনুষ্য ধর্ম। মনুষ্য জাতিও একটিই। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির মূলেও মানুষই। যুগে যুগে বিশ্বমানবের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদেরই প্রচারে ধর্ম ভাষা গোষ্ঠী ভেদের সৃষ্টি। ফলশ্রুতি, অশান্তি উপদ্রবে পৃথিবী জর্জরিত। ধর্মের নামে সৃষ্টি অধর্ম। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশ্রোতা। সৎকাজ আত্মসংযম আর মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছেও দীক্ষা শপথ গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর প্রিয়ঙ্করকে একটি পর্ণকুটির দেখালেন ঋষি। বৃক্ষলতা আচ্ছাদিত কুটিরটির চতুর্দিকে নানা ফলফুল বৃক্ষের সমাবেশ। হরিণ ময়ূরের অবাধ বিচরণ। ফুলের সুবাস পাখির কূজন ভ্রমরের গুঞ্জনে আমোদিত পরিবেশ।

প্রিয়ঙ্করকে উপদেশের ভঙ্গিতে ঋষি বললেন, জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষা পবিত্র। এই স্থানেই তোমার জন্ম হয়েছিল। সেহেতু এই পবিত্রস্থানে তোমার অবস্থান বাঞ্ছনীয়।

প্রিয়ঙ্কর বিস্ময়বোধ করে বললেন, এই আমার জন্মস্থান! আমার জন্মপরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞানতা দূর করুন মুনিবর।

জন্মমাত্রই আশীর্ব্বাদ। জন্মসূত্র সম্পর্কে ভাবনা নিরর্থক। কর্মময় জীবনে সৃষ্ট কর্মই প্রকৃত পরিচয়।

তথাপি আপন পরিচয় না-জানা মানুষের মনে হীনম্মন্যতা আসেই। প্রিয়ঙ্কর ব্যাকুল প্রার্থনা জানালেন, অন্তত কিঞ্চিৎ আলোকপাত করে আমার চাঞ্চল্য দূর করলে বাধিত হব।

তথাস্তু। ঋষি শর্ত আরোপ করে বললেন, পিতামাতার নাম জিজ্ঞাসা করবে না।

প্রিয়ঙ্কর সম্মতি জানাতে ঋষি বিবরণ শুরু করলেন, তোমার শরীরে রাজরক্ত প্রবাহিত। যৌবনকাল থেকেই তোমার পিতা ছিলেন অহিংসায় বিশ্বাসী ঈশ্বর চিন্তামুখি। পশুপ্রাণী বধকে তিনি নিষ্ঠুর নির্মম মহাপাপ কাজ মনে করতেন। তথাপি রাজধর্মাচরণের অঙ্গ মনে করে মৃগয়ায় যেতেন। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাজঐশ্বর্য বিলাস বিরহিত বিজন অজ্ঞাতবাস। কয়েকটি দিন আত্মমগ্ন ঈশ্বরানুরাগী অবস্থান। এইরূপ অজ্ঞাতবাস কালে একদিন একাকী বনসৌন্দর্য সন্দর্শনে বিচরণ করছিলেন। নদী-স্নান সমাপনান্তে কুটির প্রত্যাগতা সিক্তবসনা লাবণ্যময়ী লজ্জাবনতা এক কন্যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আতুর তিনি এই পর্ণকুটিরে এসে আপন পরিচয় প্রদান করলেন। যথাযথ সমাদৃত আপ্যায়িত হয়ে তিনি বনলতা মণ্ডিত শীতল তরুতলকেই শ্রেয় ও মুক্তি উদারতার স্বচ্ছ স্বাচ্ছন্দতার অমৃতায়ন মনে করেছিলেন। আনন্দময় এই দীন পর্ণকুটিরে পুত্রজনিত গৃহস্থধর্ম পালনে উৎসাহ বোধ করার ফলশ্রুতি তোমার জন্মলাভ।

প্রিয়ঙ্করের চোখে আনন্দাশ্রু। পরন্তু মুখমণ্ডল ঈষৎ পাণ্ডুর। বাক্‌রুদ্ধ।

বিমর্ষ প্রিয়ঙ্করের মানসিক দুর্বলতা দূর করতে ঋষি উৎসাহিত করলেন, অহেতুক অধিক জিজ্ঞাসায় মনকে কলুষিত করা বাঞ্ছনীয় নয় বৎস। কাল সূর্য উদয়কালে আমি মানস সরোবর উদ্দেশে যাত্রা করব। তৎপূর্বে বিশেষ কোন জিজ্ঞাসা থাকলে তবেই নিবেদন কর।

আমার মাতা পিতা কী জীবিত আছেন?

ইহজীবনে তোমার মাতার সাক্ষাৎলাভ অসম্ভব। কিন্তু পিতৃসান্নিধ্যলাভে তুমি নিশ্চিত সূর্যালোকের সন্ধান পাবে। সেই দিনটির প্রতীক্ষায় ধৈর্যধারণ কর।

তিন

সময় বসন্তকাল। বর্ণালী ফুলের সমাহারে চতুর্দিক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যময়। স্থান গিরিতটের শ্যামল গোচারণভূমি। গোপালকেরা হাস্যমুখর ক্রীড়ারত। সবুজ দুর্বাঘাসে সবৎস গাভিরা ব্যস্ত। মৃদুমন্দ বাতাসে ভাসছে চন্দন গন্ধ। মৌমাছিরা মধু পানে মত্ত। ময়ূর হরিণীর চিত্ত চঞ্চল। সুবাসিত মন্দার পুষ্প কুঞ্জে কোকিল ডাকছে সুমধুর। বিকশিত কুন্দ কর্ণিহার। মুকুলিত বিবিধ বৃক্ষ। চক্রবাক চকোরের মধুর ডাকে অরণ্য হয়েছে পরম রমণীয়।
আচম্বিতে মেঘকুণ্ডলী আকাশ আবৃত করল। মহাশব্দে ঝড় উঠল প্রবল। বাতাসের বেগে গাছপালা বিচূর্ণিত হল। চরাচর কাঁপানো বজ্রবিদ্যুৎ। অরণ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গেল। দাবানলের লাল আলোয় গাভিসকল ভীত সন্ত্রস্ত দিকশূন্য হয়ে পড়ল। গোপালকেরা প্রাণভয়ে নিশানাহীন পালাতে তৎপর হল।
বৃহৎ একটি বৃক্ষের নিচে একা মোহাবিষ্ট বসে আছেন প্রিয়ঙ্কর। প্রতিক্রিয়াহীন বিভোর স্থির তিনি। দাবানল দুর্যোগ তাড়িতা সম্মুখস্থ আরোহিণীর প্রতি দৃষ্টি তাঁর পলকহীন।
অপার সৌন্দর্যময়ী রমণীটি বললেন, আমি হীরণ্যাচলের রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্যর পত্নী অর্চি। পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে বসন্ত ঋতুর সৌন্দর্য দেখতে বেরিয়েছিলাম। অসময়োচিত ঘন বনদুর্যোগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। বিপন্না শরণাগতাকে আশ্রয় দিন।
প্রিয়ঙ্কর অভয় দান পূর্বক মহিষী অর্চিকে পর্বত গুহায় নিয়ে গেলেন। প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করতে বললেন।
মৃত্যুভয়ে সংকুচিতা মহিষী অর্চি বললেন, আমি তৃষ্ণার্ত।
ধৈর্য ধরতে বলে জল ফলের ব্যবস্থা করতে গেলেন প্রিয়ঙ্কর। ফিরে এসে অর্চিকে সংজ্ঞাহীনা দেখতে পেলেন। জল সিঞ্চনে চেতনা ফিরিয়ে বললেন, উত্তেজনা ভীতি তৃষ্ণায় আপনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন মাত্র। আপনি ক্ষুধার্তও বটে।
সুমিষ্ট ফল আর পদ্মপাতায় আনা জল দিয়ে আপ্যায়িত করলেন প্রিয়ঙ্কর।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি অন্তে মহিষী অর্চির চোখে ক্লান্তি আলস্যের নিদ্রা নেমে এল। তিনি অর্ধনিমিলিত নেত্রে অপরূপ দেহ সৌন্দর্যের অধিকারী প্রিয়ঙ্করের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলেন, গৈরিক বসনধারী হলেও সূর্যদীপ্ত মুখশ্রী অপূর্ব সুন্দর। পদ্মের মত চোখ। মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ হাসি মাখা মুখ। তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের মত দেহ-রং। যেন দেবদর্শন করলেন মহিষী অর্চি।
অস্থির প্রণয়িনী নারীরা গুণী রূপবান পুরুষ-সান্নিধ্যে অচঞ্চলা থাকতে সক্ষম হয় না। তেজোহীন পুরুষ রমণীদের নিকট নিরর্থক নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয়ে থাকে। বয়সী রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য সরল প্রিয়ভাষী মহামতি। নিরহঙ্কারী দানশীল ক্ষমাশীল পরম ধার্মিক চরিত্রবান পুরুষ। কিন্তু চপল নয়না কামিনীদের কাছে মলিন কুটিল তীক্ষ্ম স্বভাবের চপল পুরুষরাই যে বেশি প্রিয়। সেকারণে রাজার প্রতি মহিষীর যথাযথ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না।
প্রেম ভালবাসাহীন দাম্পত্যজীবনে সুখশান্তি সম্পর্ক দৃঢ় স্থায়ী গভীর হয় না।

সেদিন দিনাবসানে সূর্য তখন অস্তাচলে। চর্তুদিক শূন্য ম্রিয়মান নিরানন্দময়। মলয় বাতাস বইছিল। সময় ধূসর সায়ন্তনী সন্ধ্যা। এই সময়ে কামভাব উদয় হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পূর্বে সুবাসিত জলে স্নান সমাপন করে নির্মল সূক্ষ্ম বর্ণাঢ্য পোশাক পরেছেন মহিষী অর্চি। সুবিন্যস্ত কেশবাস। গ্রীবাদেশে পদক। হাতে বলয়। পায়ে স্বর্ণনূপুর। নিতম্বে কাঞ্চন মেখলা। গলায় মুক্তাহার। ললাট সীমন্তে চন্দন আর সিন্দুর। পরিচারিকাদের দ্বারা সুসজ্জিতা অর্চি।

শিবিকার বাতায়নে প্রতীক্ষায় ব্যাকুলা মহিষী অর্চি। অনিন্দ্যসুন্দরীর চোখ দুটি খঞ্জন পাখির মত। কুন্দ ফুলের মত দাঁত। বিপুল নিতম্ব মনোহর জঙ্ঘা। উদর গলদেশে ত্রিবলী রেখা। স্তনদ্বয় সুঠাম সুউন্নত সুবর্তুল। সিংহ কোমরের মত ক্ষীণ কোটি। মসৃণ টিকোল নাক। পিঠের ওপর দুলছে কুঁচরঙা করবী। চম্পক বর্ণের সুন্দরীর ঠোঁটে হরিণীর মত চটুল চপল এক চিলতে হাসি।

স্বচ্ছ আঁধার-বস্ত্রে প্রকৃতি ক্রমশ নারীর মত রহস্যময়ী দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিল। মহিষী অর্চি বলগাহীন কাম কাতরা হয়ে পড়লেন। চোখে মাদকতা। পীনোন্নত পয়োধর ঘন সম্মদ্ধ। রমণেচ্ছায় বলহীন হয়ে পড়ছে দেহ। রাজ-প্রতীক্ষা দুঃসহ হয়ে উঠছিল।

কিন্তু কোথায় রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য?

অরণ্য পরিবেষ্টিত পর্বত গাত্রের দেবমন্দিরে তখন কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ শব্দে সন্ধ্যারতি চলছে। সেখানে নির্বাক নিশ্চুপ ধ্যানস্থ তপস্বীর মত বসে আছেন রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য। পঞ্চপ্রদীপের শিখা ধূপদানির সুগন্ধী ধোঁয়ায় তিনি মোহাবিষ্ট। পুরোহিতের মঙ্গল সন্ধ্যারতিতে বিমুগ্ধ অভিভূত তিনি। অর্ধনিমিলিত চোখে তিনি যেন পরম পবিত্র আনন্দময় এক স্বর্গীয় ভূমিতে বিচরণ করছেন। এসময় রাজ অন্তঃপুরে প্রতীক্ষারতা রূপবতী পত্নী রাজঐশ্বর্য সংসারধর্ম স্মরণে আসার কথা নয়।

রাত্রিকালে অন্তঃপুরে এলেন রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য। পুঞ্জীভূত মেঘে ঢাকা মহিষীর মুখ দেখে বিলম্বের হেতু প্রকাশ করলেন।

নিজ ওষ্ঠ দংশন করে কামান্ধ মহিষী ক্রোধ প্রকাশ করলেন, কী আছে ওই দেবমন্দিরে যার জন্য স্বর্গসুখ নারীসঙ্গ অবহেলা করা যায়!

স্নিগ্ধ স্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে নীলাঞ্জনাক্ষ্য হাসলেন, ভক্তিরসের আনন্দই যে শ্রেষ্ঠ তা তোমাকে বোঝানো অসম্ভব।

রাগমদমত্ত বিষয় সুখাভিমুখ কোপ কলহের অংকুর স্বরূপা নারীদের কাছে রতিসুখ দিতে সক্ষম কামুক পুরুষরাই সর্বময়। এই শ্রেণীর নারীরা বৃদ্ধপতিকে শত্রুজ্ঞানে কলহ করে থাকে।

মহিষী অর্চি সর্পিনীর মত দংশনে উদ্যত হলেন, বিবাহ সংসারধর্ম আপনার মত পুরুষের জন্য নয়। জানিনা, একটি নারী জীবনকে এভাবে বিপন্ন ব্যর্থ করার মধ্যে আপনার কোন মহান ধর্ম পালন হচ্ছে।

মহিষী যে দুর্মুখি রাজা তা জানতেন। দুর্মুখি রমণী কন্টক অগ্নি সর্পের চেয়েও বেশী ভয়াবহ। রাজা তাই পুনর্বার বাক্য ব্যয় নিরর্থক মনে করলেন। অবিলম্বে মহিষীর শয্যাকক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন।

মহিষী প্রমাদ গুণলেন। উদ্দাম কামনায় স্বীয় আচরণ সংযত করে রাজার সামনে বাধা হয়ে

দাঁড়ালেন। মুক্তকেশী মহিষী নগ্ন হয়ে রাজার ওষ্ঠ চুম্বন করলেন। দংশন নখ-আচরে রাজার বুক ক্ষত বিক্ষত হল। মহিষী তার স্তনে রাজার হাত নিয়ে মর্দনের ইংগিত করলেন। শয্যায় রতিক্রীড়ার আহ্বান জানালেন। তথাপি নির্লিপ্ত রাজা স্থির দৃষ্টিতে নিরাসক্ত অনীহা প্রকাশ করলেন।

সংসারে রমণীদেহ সকলেরই প্রিয়। এই দেহের জন্য প্রাণীমাত্রেরই নিদ্রা বিলুপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় বিহ্বল হয়ে পড়ে। উন্মাদনায় নানা ভ্রান্তি আসে। মহিষী বিস্মিত, এ কিরকম পুরুষ যিনি নিরাবরণ পত্নীর অতুলনীয়া দেহ সৌন্দর্য দেখেও কামার্ত হয় না!

হতাশ মহিষীর দুই চোখ থেকে বিরক্তি ভরা ঘৃণা ঝরে পড়ে, আপনি বোধকরি স্বাভাবিক পুরুষের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। পৌরুষহীন পুরুষ রাজবংশের কলঙ্ক। ধিক, শত ধিক আপনাকে।

ধৈর্য ও জ্ঞানের সাহায্যে রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য যথাসম্ভব সংযত স্থির থাকতে চেষ্টা করলেন। অনুত্তেজিত শান্ত সংযত উত্তর দিলেন, পুরুষ শ্রেষ্ঠরাই বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে থাকে। মোহগ্রস্ত ভোগলালসায় তুমি বশীভূত হয়ে পড়েছো অর্চি। উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা কর।

মহিষীর কণ্ঠস্বর কামাগ্নি জ্বালা ব্যথার অশ্রুজলে তীব্র হয়ে উঠল, রমণ সুখ দিতে অক্ষম পতি পাপী পুরুষ। তাঁর মুখে উপদেশ মানায় না। আপনার মুখদর্শন করতে ঘৃণা হয় আমার।

রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য আগের মতই নিরুত্তেজ সংযমী অনুরোধ জানালেন, শান্ত সংযত হও অর্চি। শুভবোধ জাগ্রত কর।

রমণের জন্যই রমণী। মহিষী তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুললেন, আমার কামনার মধ্যে অশুভবোধ কোথায় দেখছেন আপনি?

রাজার উজ্জ্বল হাসিমুখে হঠাৎ যেন মেঘের ছায়া পড়ল। অথচ তিনি রাগ দ্বেষ মুক্তচিত্তে অবিচলিত। মহিষীকে বোঝাতে চাইলেন, আত্মাকে ভোগের দ্বারা অবসন্ন হতে দেয়া অনুচিত। সন্তান লাভের জন্যই শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীসঙ্গের বিধান দিয়েছেন। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়। সন্তান কী পাওনি তুমি? তবে কেন অক্ষম পুরুষ অপবাদ দিচ্ছ?

সন্তান পেয়েছি সত্য। কিন্তু, আমি তো দেবী নয়—মানবীমাত্র। এই মুহূর্তে আমার তৃষ্ণা নিবারণ করা স্বামী হিসেবে আপনার পবিত্র কর্তব্য। অন্যথায় আমি আত্মঘাতিনী হব।

মার্জনা প্রার্থনা করে রাজা বললেন, আজ আমি উপবাসী। জয়ন্তী যোগে উপবাস রাত্রি জাগরণে কোটি জন্মার্জিত পাপ দূর হয়ে থাকে। জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। তাই আজ দেবমন্দিরে রাত্রিযাপনের সংকল্প গ্রহণ করেছি।

ইন্দ্রিয় চরিতার্থে ব্যর্থরা অনেক সময় প্রমত্ত চিত্তে স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণ করে বসে। ঐশ্বর্য রূপ গর্বে মোহান্ধ মহিষী কামাগ্নি তাড়িত ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। রাজার প্রতি কেবলমাত্র অশালীন রূঢ় মন্তব্য করেই শান্ত হলেন না। উগ্রমূর্তি ধারণ করে রাজার পোশাক ধরে আকর্ষণ করে মুষ্টিঘাত করলেন।

রাজরক্ত তথাপি উত্তপ্ত হল না। কে বলবে নীলাঞ্জনাক্ষ্য এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি! ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তিনি উপদেশ দিলেন, যে কর্ম সংসারে পুণ্য উৎপাদন বৈরাগ্য আনয়ন করে না সেই কর্মের অনুষ্ঠানে জীব জীবিত হয়েও মৃত। তুমি দেহাদিতে আসক্তা বাসনাবদ্ধ চিত্তে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছ। ভ্রান্ত পথে চলতে চাইছ। পতির প্রতি অশ্রদ্ধা ঈশ্বরাধনায় পরাঙ্মুখ তুমি। ঈশ্বর তোমার শুভবোধ জাগ্রত করুন।

ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর। কতবার বলেছি, আমি মানবীমাত্র। নারীধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ব্যর্থ দুর্বল কাপুরুষ আপনি নারীর এই শয্যাকক্ষ ত্যাগ করে আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন।
রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য সুখার্থী পুরুষ। মহিষীর মত্ত আচরণেও মুখে তাঁর স্নেহ ক্ষমা ভালবাসার উজ্জ্বল আলো। হৃদয় দ্বিধাহীন। অলসভঙ্গিতে তিনি দুঃখের আদি কারণ অন্তঃপুরের পত্নীর তৃষ্ণাকক্ষ থেকে নির্বাক প্রস্থান করলেন।
পত্নী-পরাজিত পুরুষ নাকি আমৃত্যু অবিশুদ্ধ থাকে। শুদ্ধিকরণের কোন বিধান রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্যর জানা ছিল না। পরবর্তী দিনে তিনি দেবমন্দিরে ছিলেন না। রাজপ্রাসাদেও আর প্রত্যাবর্তন করেননি।
পুংশ্চালী নারীরা নাকি দয়ামায়া হীনা নীচাশয়া হয়ে থাকে। শুধুমাত্র শৃঙ্গারপটু নিপুণ বলিষ্ঠ পুরুষের কাছেই তারা বশীভূতা হয়। এই শ্রেণীর নারীরা ধনবান পতি অপেক্ষা দরিদ্র যুবককে বেশি পছন্দ করে থাকে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নিম্নবর্ণের পুরুষের জন্যও অসতী হতে পারে। অতঃপর মহিষী অর্চি গোপনে একাধিক পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েন।
অরণ্যে ঋতু সৌন্দর্য দেখার নামে ভ্রমণে বেরিয়ে সুঠাম মাংসলযুক্ত দরাজ বুকের দেহ সৌষ্ঠব সম্পন্ন পুরুষের অন্বেষণ করেন মহিষী অর্চি। মনে ধরলে ছলে বলে কৌশলে সেই পুরুষটিকে মোহিত করে ফেলেন। কপট গন্ধর্ব বিবাহও করেন অনেকক্ষেত্রে। ভোগ লালসা চরিতার্থতার পর নানা অপবাদ দিয়ে অনধিকার রাজপ্রাসাদে প্রবেশের দায়ে সেই পুরুষটিকে মৃত্যুদণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হন না।
সলজ্জ হাসিমুখে প্রিয়ঙ্করকে প্রেম নিবেদন করলেন মহিষী অর্চি, আপনার পৌরুষদীপ্ত দেহ যে-কোন নারীর কাছেই লোভনীয়। রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য অতিবৃদ্ধ রুগ্ন রতিরসে অক্ষম অপ্রাজ্ঞ পশুতুল্য ছিলেন। দীর্ঘদিন পূর্বে রাত্রির অন্ধকারে তিনি অন্তর্ধান করেছেন। অনিদ্রিত রাত্রিযাপন করে আমি নৈরাশ্য পীড়িতা। আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।
প্রিয়ঙ্কর এতক্ষণ অর্চির অপরূপ সৌন্দর্য দেখছিলেন। পুনর্বার দ্বিধাহীন আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। লাস্যময়ীর দৃষ্টিতে যেন শাণিত বাণ। দেহময় চঞ্চল যৌবন মদিরা। উদ্দাম কামনামিশ্রিত হাসি ব্রীড়া বঙ্কিম দৃষ্টি। যেকোন পুরুষের ইন্দ্রিয় বিভ্রম অনিবার্য।
তথাপি প্রিয়ঙ্কর নিরাসক্ত সংযমী পুরুষের মত উত্তর দিলেন, আমি তপস্বী-দীক্ষিত বনবাসী। আপনি বরং অন্যত্র আপনার উপযোগী যথাযোগ্য পুরুষের অন্বেষণ করুন।
অর্চির বাম চোখ কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত। ঈষৎ বঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঠোঁটে স্বল্প হাসি ফুটিয়ে বললেন, আপনি বীরপুরুষ। নারীর নিকট বীরপ্রবর পতিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে থাকে। উভয়েই যখন সৃষ্টিকর্তার জীব তবে এত দ্বিধা করছেন কেন?
আমি বনবাসী সন্ন্যাসী। পত্নী পুত্র দেহ গৃহ ধনসম্পদে আসক্তিহীন। আমাকে প্রলোভন না দেখানোই বাঞ্ছনীয়।
আমার অনুমান, আপনার শরীরে বইছে রাজরক্ত। সম্ভবত বিশেষ কোন কারণে নৈরাশ্য পীড়িত হয়ে রাজশয্যার পরিবর্তে পল্লব শয্যা শ্রেয় মনে করে থাকবেন। সুখ স্বজন ছেড়ে এসে এখানে অভ্যস্ত ভোগের অভাবে কষ্টও নিশ্চয়ই পাচ্ছেন। বনবাস আপনার মত

বীরপুরুষের জন্য নয়। বনগুহা কৃকলাস পেঁচাদের বাসস্থান। ভ্রান্তপথ ছেড়ে আপনি আমার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে চলুন। রাজপ্রাসাদই আপনার উপযুক্ত স্থান।
অর্চির মুখ থেকে নানা প্ররোচনামূলক কথা শুনে ঈষৎ দুর্বলতা অনুভব করলেন প্রিয়ঙ্কর। কিছুক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে সময় কাটালেন। অবশেষে করজোড়ে মিনতি জানালেন, প্রলুব্ধ করবেন না রাজমহিষী। এখানেই আমার পরম শান্তি।
এই বনবাসে! বিস্ময়ে অবজ্ঞাভরে উচ্চকিত হাসলেন রাজমহিষী।
প্রিয়ঙ্কর বিন্দুমাত্র বিমর্ষ লজ্জিত হলেন না। বরং দৃঢ়তার সঙ্গেই আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জলেই বিমল চিত্ত সম্ভব। ভোগ বিলাসের পরিণাম ভয়ঙ্কর দুঃখপ্রদ।
বিদুষী অর্চি বাকচাতুর্য পাণ্ডিত্যে ছলনাময়ী হয়ে উঠলেন, বনস্থলীওতো সতত রক্তাক্ত। তাহলে এখানে সন্তোষ শান্তি কিভাবে সম্ভব? তাছাড়া, ভোগান্তে যেমন সংযম বাসনা আসে তেমনি সংযমীদেরও ভোগবাসনা জাগে। ভোজন তৃপ্তরা উপবাসী থাকতে চায়। আবার বনবাসীদেরও ক্ষুধায় আহার খুঁজতে হয়। জনসমাগমে বিব্রতজন নির্জন বনবাসী হতে চায়। নিঃসঙ্গজন সঙ্গী কামনা করে থাকে। আপনার কী কোনপ্রকার বাসনাই জাগ্রত হয় না? অসত্য উত্তরের ছলনা করবেন না। মনে রাখবেন, বনবাসী সন্ন্যাসীর মুখে মিথ্যাভাষণ চূড়ান্ত পাপাচার।
পরাভূত প্রিয়ঙ্কর নিরুত্তর ম্লান বিমর্ষ হলেন। সত্য বটে তিনি অপরিপক্ক বৈরাগ্যহেতু বনবাসী মাত্র। নৈরাশ্য পীড়িত হয়ে সংসারত্যাগীদের মত একজন। নিঃসঙ্গ ব্রত গ্রহণ করেও এযাবত গৃহস্থাশ্রম চিন্তা প্রেয়সী পৃথার সঙ্গ কামনা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। নির্জনে পৃথার স্মৃতিচারণকালে একদিন উত্তেজনায় বীর্যস্খলন পর্যন্ত হয়েছে।
মহিষী অর্চির ধারাবাহিক আহ্বান আকুতিতে প্রিয়ঙ্করের মনে ভোগের বাসনা জাগল। ভাবলেন, তেজোহীন পুরুষ নিরর্থক নিষ্প্রয়োজনীয়। সুখ স্বাদে লালায়িত প্রিয়ঙ্কর বললেন, সূর্য অস্তাচলে। অন্ধকার আসন্ন। আসুন আপনাকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

চার

হীরণ্যাচলের রাজপ্রাসাদটি পর্বতশৃঙ্গের ওপর অবস্থিত। পরিখা প্রাকার ঘেরা প্রাসাদটি রত্নময় স্তম্ভ সোপান শোভিত। দুর্লভ মণিময় চিত্রিত। গৃহদ্বার স্ফটিক নির্মিত। সুবর্ণ কপাটযুক্ত তোরণ। রমণীয় তপবন। ব্যবসায়ীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। বিশাল বিশাল অট্টালিকা মন্দির শোভিত মহানগরী।
রাজভবন দ্বারে রত্নখচিত কপাট। সামনে দণ্ড হাতে দ্বাররক্ষক।
প্রহরার জন্য নিযুক্ত কোটাল দ্বারপালক রক্ষীদের দৃষ্টির অন্তরালে গোপন পথে প্রিয়ঙ্কর অর্চি অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।
একাধিক দ্বার অতিক্রম করার পর মহিষীর শয়নকক্ষ।
সুন্দরীদের দ্বারা কস্তুরী গন্ধযুক্ত চামরে প্রিয়ঙ্কর অভ্যর্থিত হলেন।
শয়নকক্ষটি রমণীয়। রত্নকুম্ভে চর্চিত পুষ্পমালা। চিত্রপুষ্প শোভিত মখমলি শয্যাদর্পণ। দুগ্ধ ফেননিভ শয্যাটি মহামূল্য মণিমুক্তা হীরক সুবর্ণ খচিত গ্রথিত সুন্দর শিল্পমণ্ডিত।

প্রিয়ঙ্করকে রাজপোশাক দিয়ে সুগন্ধী নির্মল জলে স্নান করে পরতে বলা হল। প্রিয়ঙ্কর অপ্রসন্ন বিস্ময় সঙ্কোচ শঙ্কা বোধ করলেন। কিন্তু নির্দেশ মানতে বাধ্য হলেন।
বনবাসী পোশাক ছেড়ে স্নানান্তে নির্মল সূক্ষ্ম বর্ণাঢ্য পোশাক পরে পালঙ্কের শিয়রের কাছে মুকুরের সামনে দাঁড়ালেন প্রিয়ঙ্কর। তারপর উন্মুক্ত দক্ষিণ গবাক্ষ পথে দূরের অন্ধকারে নিমগ্ন অরণ্যের দিকে তাকালেন।
বিশ্বস্ত পরিচারিকাদের দ্বারা অর্চি এখন সুমার্জিত মহামূল্য বসন ভূষণ অলংকারে সুসজ্জিতা। শৃঙ্গার অন্তে ইংগিতে সকল পরিচারিকাকে কক্ষত্যাগের নির্দেশ দিলেন অর্চি।
এখন দুর্ভেদ্য এই কক্ষটিতে নিশাচর পাখির শব্দ পর্যন্ত কানে আসা অসম্ভব।
প্রিয়ঙ্করকে সযত্নে নিজহাতে আপ্যায়ন করলেন স্বয়ং মহিষী অর্চি। বাটিতে কুমকুম গোলাপ আতর চুয়া কেশর কস্তুরী চন্দন। থালায় মল্লিকা মালতি চম্পক ফুল। ক্ষীর চিনি মিছরি নেয়াপতি ডাব।
আহার ভোজনকালে প্রিয়ঙ্করের পাশে বসে সাদা পালকের মত চামর দোলালেন অর্চি। আহারান্তে এগিয়ে দিলেন খিলি পান মিষ্টি সুপারী উত্তেজক লবঙ্গ কর্পূর এলাচ জয়িত্রী জয়ফল সাজানো রেকাবি।
সবশেষে প্রিয়ঙ্করকে কটাক্ষ বাণে শয্যায় ডাকলেন অর্চি।
সঙ্কোচে শয্যায় বসলেন প্রিয়ঙ্কর। আচম্বিতে আলিঙ্গন চুম্বন করলেন অর্চি। বিস্মিত করে প্রিয়ঙ্করের চর্বিত তাম্বুল নিজের মুখে নিলেন।
ভীতি উত্তেজনায় প্রিয়ঙ্করের শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। ঘামের আঘ্রাণে অর্চি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। স্তন যুগলের গিরিবর্তে প্রিয়ঙ্করের গণ্ডদেশ আবদ্ধ করলেন।
দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর পুষ্পমালায় প্রিয়ঙ্করকে বরণ প্রণাম করে অর্চি প্রার্থনা নিবেদন করলেন, আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন হে বীর।
পাপবোধে কাতর প্রিয়ঙ্কর অসহায় শিশুর মত আর্তচিৎকার করে উঠলেন, এ কী করলেন মহিষী!
উত্তর দানের প্রয়োজন বোধ করলেন না অর্চি। অধিকন্তু বেশবাস অলংকার শৃঙ্গার কেশবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ল। উলঙ্গ তনু কণ্ডুয়নযুক্ত যোনি দেখিয়ে রতিক্রিয়ায় আহ্বান জানালেন।
তপস্বীর মুখ নিঃসৃত মন্ত্র কথা প্রিয়ঙ্করের স্মরণে এল। 'যোনি হইতে জন্মগ্রহণ করে যোনিতে সংসক্ত, স্তনপান করে স্তন মর্দন? সজ্জনগণ সতত জননীর জঘনে আসক্তি বর্জন করে থাকে।'
প্রিয়ঙ্কর নিজরিপু সংযত করে নিরাসক্ত অনীহা প্রকাশ করলেন।
কামজ্বালায় অর্চি ভয়ঙ্করী হয়ে উঠলেন, হে বীর আপনি কি জানেন না যে কামাতুরা রমণীকে রমণদানে অস্বীকৃত পুরুষকে নারীহত্যা সমতুল্য পাপে পাপী হতে হয়?
উপস্থিতা রমণী-গ্রহণে গৃহীদের দোষ হয় না। প্রিয়ঙ্কর আত্মপক্ষের সমর্থনে যুক্তি দেখালেন, পরিত্যাগের দোষ-পাপ কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমি বনবাসী। সর্বত্যাগী বনবাসীর ধর্ম নারীসঙ্গ পরিহার করা।
অর্চিও পরাজিতা হতে না-প্রস্তুত, বেশ্যার শাপে ব্রহ্মা আর তাঁর প্রপৌত্রকেও একদিন প্রভাশূন্য হতে হয়েছিল। আপনি কি সেই ঘটনা স্মরণ করে ভীত নন?

বিন্দুমাত্র নয়। প্রিয়ঙ্কর দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমার ধর্মমতে পরস্ত্রী জননীবৎ।
নিজ জায়া জয়প্রদাকে যে রাজা শ্রীসেন মুনি শিষ্যকে দান করেছিলেন সেটা কোন ধর্ম বলতে পারেন? উত্তেজিত অর্চি ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করে বললেন, পত্নীরূপে এতই আপত্তি যদি তাহলে অন্তত দাসীরূপে আমাকে গ্রহণ করুন।
দাসীওতো নারীই। নারীমাত্রই আমার কাছে বর্জনীয়। রমণী কন্টক অগ্নি সর্পের অধিক ভয়াবহ।
আপনি মহামূর্খ। উপমা তুলনায় ক্ষিপ্তা অর্চির সগর্ব ঘোষণা, নারীসঙ্গ যে কোন পুরুষের কাছেই স্বর্গসুখ।
আপনি অজ্ঞতার অন্ধকারে আছেন। ভৎর্সনা করে প্রিয়ঙ্কর বোঝাতে চাইলেন, ধর্মই আলোকপ্রদ দীপ নয়। গুণের আভরণ বিবেক। বিবেকের আভরণ প্রশম। প্রশমের আভরণ বৈরাগ্য। বিবেক আমাকে প্রলোভন থেকে বিরত থাকতে বলছে।
সম্মুখে স্বর্ণপাত্রে সিন্দুর ধরলেন অর্চি। ললাট সীমন্তে পরিয়ে দিতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'দান দ্বারাই হস্ত অলংকৃত হয়। পরোপকার দ্বারা দেহ শোভিত হয়।' অপরিপূর্ণ তৃষ্ণার্ত আমি পূর্ণতা প্রাপ্তির আশায় দান ভিক্ষা চাইছি। এবার আপনার ধর্ম যা বলে তাই করুন।
অর্চির এই প্রার্থনার মধ্যে ভোগ লালসা কোথায়? নারীর স্বাভাবিক ধর্মমতে পত্নীর মর্যাদাটা চাইছেন। ভয়ঙ্কর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লেন প্রিয়ঙ্কর। অবশেষে অর্চির ললাট সীমন্তে সিন্দুর পরিয়ে দিলেন।
পরম প্রাপ্তি তৃপ্তির উজ্জ্বলতায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্বক অর্চি বললেন, আজ থেকে আপনিও আমার প্রাণপ্রিয় পতি হলেন। আপনার ধর্মই আমার ধর্ম হল।
মহিষী অর্চি জানলেন না যে পতি নীলাঞ্জনাক্ষ্যর ঔরসজাতপুত্র অজ্ঞাতসারে আজ তাঁর দ্বিতীয় পতি হলেন।

পাঁচ

রাজরক্তে অকল্যাণকর বিবিধ ত্রুটি আকস্মিক অস্বাভাবিক বিষয় নয়। জন্মসূত্রে অবাধ্য ঔদ্ধত্য বলপ্রয়োগ অত্যাচার নিপীড়ন শোষণ ভোগ বিলাসিতা চিরন্তন। ধর্মভীরু রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য রাজকুমারকে রাজনীতি অস্ত্রশিক্ষা ভোগ বিলাসের সুযোগ দিতে চাননি। বাসনা ছিল, পুত্র হবে দানশীল ঈর্ষাবিহীন প্রিয়ভাষী। সেই উদ্দেশে যথার্থ শিক্ষা ও চরিত্র গঠন কল্পে রাজকুমারকে বহুযোজন দূরবর্তী অরণ্যস্থ সরোবর তীরের গুরুগৃহে প্রেরণ করেছেন।
শিক্ষা-আশ্রমটিতে দূর-দূরান্তের সর্বশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমাবেশ। পোশাক আহার শয়ন ব্যবস্থা বিলাসবিহীন। সদাচারি আচার্য কঠোর নিয়মশৃঙ্খলাপরায়ণ দৃঢ় মানসিকতার মানুষ। প্রাচীন সংস্কৃতি মানবিক মূল্যবোধ আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষের শিক্ষক।
সুপুরুষ পৃথুলাক্ষ্য রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্যর একমাত্র ভ্রাতা। তিনি সুচতুর ধূর্ত কুটিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ঈশ্বরের ইচ্ছা আর ভালবাসায় মানুষের মন জয় করায় বিশ্বাসী নহেন। পরিবর্তে বলপ্রয়োগে

সম্ভ্রম আদায়ে বিশ্বাসী। রাজসিংহাসনের প্রতি প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীলাঞ্জনাক্ষ্যর অনুগত চাটুকার ছিলেন। রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্যর অন্তর্ধানের পরও বিদ্রোহীরূপ প্রকাশ করেননি। বুদ্ধিমতী অর্চির মেজাজকে সমীহ করে ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করেছেন। এক্ষণে মহিষী অর্চির রূপগুণমুগ্ধ অনুগতের অন্তরালে কার্যত তিনিই শাসনকর্তা।

মৃগয়া প্রত্যাগত পৃথুলাক্ষ্য সৌজন্যমূলক মহিষী অর্চির সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন। অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট বহির্কক্ষে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বলা হল। মহিষীকে আগমন বার্তা শোনাতে গিয়ে পরিচারিকা প্রত্যাগমন করল না। শ্রদ্ধা নিবেদন উদ্দেশে দীর্ঘক্ষণ একাকী প্রতীক্ষায় পৃথুলাক্ষ্য অপমানিত হলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত বিমর্ষ হয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

'নিব্বুতা নূন সা নারী, যসসায়ং ঈদিশো পতি।'

প্রিয়ঙ্করের মত পতি প্রাপ্তিতে অর্চির নারীহৃদয় পরিতৃপ্ত নির্বাপিত।

ইতিপূর্বেকার মোহ প্রসন্নতা আনন্দে মোহিত পুরুষরা ছিল মহিষীর ক্রীড়া-মৃগের মত। মহামূর্খের মত তারা সকলে কপটতার শিকার হয়েছে। কাম চরিতার্থ অন্তে বিহ্বল পরিস্থিতিতে প্রতারিত হয়ে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করেছে।

প্রিয়ঙ্কর ব্যতিক্রম। মহিষী অর্চিকে যথার্থ পত্নীর মর্যাদা দান করে তবেই তিনি তাঁর প্রথম কৌমার্য প্রয়োগ করেছেন। স্বভাবতই তিনি ভয়ভ্রান্তি অনুশোচনা পাপবোধ মুক্ত।

কিন্তু, মহিষী অর্চি স্বয়ং চিন্তামুক্ত হতে পারলেন না। পৃথুলাক্ষ্যর প্রত্যাবর্তন সংবাদ শ্রবণই যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ। অধিকন্তু সংবাদে প্রকাশ, অতিথি কক্ষে দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষার পর তিনি কিয়ৎকাল উদ্ভ্রান্তের মত পদচারণা করেছিলেন। সেই সময়কালে জ্বলন্ত শিখার মত তাঁর চোখে ছিল অবিশ্বাস্য ঘৃণা ক্রোধ প্রতিহিংসা। অনুমান, রূঢ় নির্মম ভয়ঙ্কর ভীমমূর্তিটির মস্তিষ্ক ছিল অত্যন্ত উষ্ণ উত্তেজিত। প্রস্থান অন্তে এতদ্ অবধি তিনি স্বীয় বিশ্রাম কক্ষের কপাট বন্ধ করে অবস্থান করছেন।

সন্দেহপ্রবণ পৃথুলাক্ষ্য যে তাঁর জ্যেষ্ঠশ্রীর বিপরীত চরিত্রের মানুষ মহিষী অর্চি তা অবহিত আছেন। ধর্মাচরণ তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। দুঃসাহসী শক্তিমান সেই পুরুষটি মহিষীর রূপগুণমুগ্ধ। সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত বিহ্বলতায় বিস্ময়াভিভূত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে অভ্যস্ত। একবারতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোবাসনা ব্যক্ত করেইছিলেন, ধর্মভীরু বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠশ্রী আপনার কাছে যথেষ্ট বেমানান মহিষী। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পৃথিবীর যেকোন মূল্যে আপনাকে জয় করতে ইচ্ছুক আমি জ্যেষ্ঠশ্রীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতেও রাজী। যদি আপনি অনুমতি করেন--। তরুণ রূপবান শক্ত সমর্থ পৃথুলাক্ষ্যর বক্তব্য শুনে মহিষী অর্চি বিশেষ রোমাঞ্চিত হলেন। তথাপি চূড়ান্ত অসংযমী তিনি আত্মসংবরণে সচেষ্ট হলেন।

পৃথুলাক্ষ্যর দেহ সৌষ্ঠবে আকৃষ্টা বিহ্বলা হয়েও কপট বিরক্তি প্রকাশ করলেন, মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমার স্নেহভাজন। শ্রদ্ধেয়ার প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন স্নেহভাজনের উচিত আচরণ হবে।

মনক্ষুণ্ণ পৃথুলাক্ষ্য বিমর্ষমনে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেও পরবর্তীকালে অসংশোধিত নিজস্ব চরিত্রমতো আচরণই করতেন। মহিষী অর্চিও তিরস্কারের ভঙ্গীতে একই বক্তব্য শোনাতেন। কিন্তু রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য রমণদানে অনীহা অক্ষমতা প্রকাশ করলে কামতাড়িতা অর্চির চোখ

মনে সর্বাগ্রে পৃথুলাক্ষ্যর আবির্ভাব হত। পৃথুলাক্ষ্যের প্রতি নির্দয় হেতু অনুশোচনায় কষ্টভোগ করতেন।

রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্যর অন্তর্ধানের পর নিঃসঙ্গ বিষাদময় কোন এক সময় সম্মুখে বাস্তব উপস্থিত পৃথুলাক্ষ্য। চোখ মুখে ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা অস্থিরতা সুস্পষ্ট। স্বাভাবিক নারীর দুর্বল আচরণে অর্চি প্রশ্ন করলেন, আপনি কি ক্ষুধার্ত? আহারের আয়োজন করব?

অবশ্যই ক্ষুধার্ত। পৃথুলাক্ষ্যর চাতক চোখের হাহাকার কণ্ঠে পরিস্ফুট হল, শারীরিক ক্ষুধার আহার্য প্রার্থনা নিয়ে উন্মাদের মত ছুটে এসেছি আমি। আশাকরি এবার আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবেন না।

গৃহে আপনার পত্নী শৈব্যা আমার ভগ্নিতুল্য। মহিষী অর্চি সুচতুর উত্তর দিলেন, গৃহে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত সত্ত্বেও ভিক্ষাপাত্র হাতে এখানে ছুটে আসা কেন?

আহার্যবস্তুরও যে প্রকারভেদ থাকে। স্বাদ বৈচিত্র্য ভিন্নতর হয়। অন্ন পরমান্ন অমৃতের স্বাদ কী এক হয় কখনও। ভাবাবেগ সংযত করে বীরভঙ্গীতে স্পর্শযোগ্য নিকটে দাঁড়ালেন পৃথুলাক্ষ্য। দৃষ্টিবন্দিনী অর্চিকে দৃঢ়তা দেখালেন, আপনার বিচারে আমি কী যথার্থ পুরুষ নয় মহিষী?

অবশ্যই আপনি যথার্থ বীরপুরুষ। ভাগ্যবতী শৈব্যাকে ঈর্ষা করার মত।

তবে এত দ্বিধা কেন! আপনি কী জ্যেষ্ঠশ্রী এখনও জীবিত আছেন বলে বিশ্বাসী?

পত্নীর দ্বারা লাঞ্ছনা অবমাননা গভীর ধর্মবোধ বৈরাগ্যহেতু রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্য গোপন নির্জন বনবাসে তপস্বী জীবন গ্রহণ করতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী পৃথুলাক্ষ্য যে মহিষী অর্চিসহ রাজসিংহাসন লোভে তাঁকে হত্যা করেননি সে সম্পর্কেও নিঃসন্দিহান নয় অর্চি। রাজকুমার এখনও গুরুগৃহে শিক্ষার্থী। নিজে রাজ্যশাসনে অনভিজ্ঞা। এমতাবস্থায় পৃথুলাক্ষ্যকে বলপ্রয়োগ করতে উৎসাহিত করা সমীচিন মনে করলেন না মহিষী। জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠের হৃদয়ানুভূতি জাগ্রত করতে বললেন, অবিশ্বাসী হলেও নিয়মবিধিমতে দ্বাদশ বর্ষ প্রতীক্ষা প্রয়োজন।

পৃথুলাক্ষ্য শান্ত বাধ্য অনুগত হলেন, দ্বাদশ কেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভিক্ষাপাত্র হাতে প্রতীক্ষায় থাকব আমি। আপনাকে আমার চাই-ই-ই।

দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ এখন কোন যুক্তি কৌশলে পৃথুলাক্ষ্যকে অনুগত বাধ্য রাখবেন মহিষী অর্চি? এদিকে রাজকুমার ঘোষণা করেছে, সারল্যেই তার সুখ। রাজপ্রাসাদের বিলাসিতা থেকে দূরত্বের মুক্ত প্রকৃতিতেই তার আনন্দ। মানুষের হিত কল্যাণ সুখের জন্য নিজেকে সে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। শিক্ষান্তে শিক্ষকের পদ গ্রহণে উৎসাহী। ভবিষ্যতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার।

অশুভ আশঙ্কা করলেন মহিষী অর্চি। সাক্ষাতে ব্যর্থ ক্ষুব্ধ পৃথুলাক্ষ্য লোভনীয় পুরস্কারের বিনিময়ে বিশ্বস্ত অনুচরের দ্বারা সংবাদ সংগ্রহে চেষ্টিত হবেন, কী এমন কারণ ছিল যে মহিষীর কক্ষ-কপাট বন্ধ ছিল! প্রিয়ঙ্করের উপস্থিতি সংবাদ সংগ্রহে তিনি নিশ্চিত সফল হবেন। পরিণাম হবে নির্মম নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর।

চূড়ান্ত চিত্তচাঞ্চল্য অস্থিরতার মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন মহিষী অর্চি। দ্বারে উপস্থিত সমূহ বিপদ সম্পর্কে প্রিয়ঙ্করকে সচেতন করলেন। কণ্ঠলগ্না হয়ে উৎকণ্ঠিত মিনতি জানালেন, কাল প্রভাতের সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করা সমীচিন নয়। অদ্য রাত্রির অন্ধকারই প্রকৃষ্ট সময়। হে

প্রাণপ্রিয়, বিশ্বস্ত পরিচারিকা প্রহরীর নিরাপত্তায় আপনি অবিলম্বে নিজ কুটিরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করুন।
পত্নীকে হিংস্র সিংহের সম্মুখে রেখে একাকি পলায়ন! প্রিয়ঙ্করের ধমনীতে যে রাজরক্ত। পৌরুষোচিত দৃঢ়তায় তিনি মহিষী অর্চির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন, যুদ্ধবিদ্যায় আমিও যথেষ্ট পারদর্শী। প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিতেও অপ্রস্তুত নই। কিন্তু কাপুরুযোচিত পলায়ন অসম্ভব। মার্জনা চাইছি।
আপনার বীরোচিত ঘোষণায় আমি মুগ্ধ। মহিষী অর্চির চোখ মুখে তৃপ্তির উজ্জ্বলতা সুস্পষ্ট। প্রিয়ঙ্করের ওষ্ঠে সশব্দ চুম্বন দিয়ে বললেন, আমি যে সঠিক পতি নির্বাচন করেছি তা প্রমাণিত। সেজন্য গর্ব অনুভব করছি। ঈষৎ হাস্যমুখে বোঝাতে সচেষ্ট হলেন, কিন্তু আপনি তো সর্বত্যাগী বনবাসী ছিলেন। তবে কেন অস্থির চিত্ত উষ্ণ মস্তিষ্কের পরিচয় দিচ্ছেন! রাজরক্তের অপরিণামদর্শী ঔদ্ধত্য প্রশমিত করুন। সর্বক্ষেত্রেই সম্মুখ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সুনিপুণ দক্ষ যোদ্ধার পরিচয় হয়। আপনি কার্যত সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত। পৃথুলাক্ষ্যকে পরাজিত করতে হবে কূটকৌশলে বিনা রক্তক্ষয়ে। তবেই আমাদের দ্বৈত জীবন ভবিষ্যতে নিষ্কণ্টক হবে। আপনি পলায়নে অসম্মত হলে সকল পরিকল্পনাই ধুলায় মিলিয়ে যেতে বাধ্য। স্থির শান্ত মস্তিষ্কে পরিণামটা অনুমান করুন।
কিন্তু—
আর কোন দ্বিধা নয় স্বামী। চুম্বন প্রণাম অন্তে মহিষী অর্চি বিষণ্ন চোখ মুখে কষ্টার্জিত হাসির উজ্জ্বলতা আনয়ন করে বললেন, আর বিলম্ব করবেন না। এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। অর্চির প্রতি বিশ্বাস রেখে আপনি নির্ভয় নিশ্চিন্তে যাত্রা শুরু করুন।
অতঃপর প্রিয়ঙ্কর অস্থির অবিশ্বাস অনিশ্চিত মনেই নিরাপদে প্রস্থান করলেন।

ছয়

অদ্য সপ্তম দিবস পর্যন্ত মহিষী অর্চি কার্যত নিজকক্ষে বন্দীদশায় আছেন। সংবাদে প্রকাশ, প্রজাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা বিরক্তি অসন্তোষের বহির্প্রকাশ ঘটেছে। বিক্ষুব্ধ উত্তেজিত জনতা দ্বারা রাজপ্রাসাদ পরিবেষ্টিত। গোপন পলায়ন পথ পর্যন্ত রুদ্ধ। সমবেত জনতার কণ্ঠে পৃথুলাক্ষ্যর নামে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। অন্যদিকে মহিষী অর্চির বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনি সোচ্চার।
বিচার চায় জনতা। হৃত রাজ্য উদ্ধারে অপারগ প্রজাদের রক্তশোষক ব্যভিচারিণীর বিচার। তাদের আরও অভিযোগ, মহিষীকে অদ্যাবধি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। তিনি ধর্মে অবিশ্বাসী। চাপা গুঞ্জনে বাতাস দূষিত ভারাক্রান্ত, রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্যর সঙ্গে মহিষীর সদ্ভাব ছিল না। ভ্রষ্টা তিনিই রাজাকে গোপনে হত্যা করেছেন। রাজ্যের অকল্যাণ ধ্বংস আশঙ্কায় ভীত ধর্মভীরু নাগরিকেরা সর্বসমক্ষে মহিষীর দণ্ড চাইছে। শান্তিপ্রিয় সুখী প্রজারা বিচার চাইছে! সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদতো রাজদ্রোহের পর্যায়ে পড়ে। পৃথুলাক্ষ্যর কুটিল চক্রান্তে যে এতসব জঘন্য কুৎসা রটনা তা মহিষী অর্চির অনুমান করতে ভ্রম হল না। অস্থির উত্তেজনায় তিনি একান্ত অনুগতা পরিচারিকাকে বললেন, পৃথুলাক্ষ্যকে একবার সংবাদ পাঠিয়ে অতিথি কক্ষে আনয়ন প্রয়োজন। আশু সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে।

আতঙ্কগ্রস্তা পরিচারিকা অনুরোধ জানাল, আপনি শান্ত হোন মহিষী। আকস্মিক উন্মাদনায় দুঃসাহসী কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।
আমি আজীবন দুঃসাহসী। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আশ্বস্ত করে মহিষী বললেন, আশঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এবার সম্পূর্ণ ভিন্নতর দুঃসাহসের পরিচয় দেব। ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় পৃথুলাক্ষ্যকে জয়ী হতে দেয়া যায় না। অর্চি পরাজিতা হতে জানে না।
মহিষীর দুঃসাহসিক পরিকল্পনাটা অনুগতা জানতে পারে কী?
সখীতুল্য বিশ্বস্ত পরিচারিকা হওয়া সত্ত্বেও গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার করলেই শোনানো সম্ভব।
ঈশ্বরের নামে শপথ করছি আপনার নির্দেশ যথাযথ পালন করব।
উত্তেজনা প্রশমিত করে মহিষী ভাবাবেগ তাড়িতা হলেন, এযাবত্‌কাল নারীকে পৃথিবীতে পুরুষের শ্রেষ্ঠসুখ মনে করে গর্ববোধ করতাম। কল্যাণময় দিক নিয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশ পাইনি। এখন উপলব্ধি করছি, দানই শ্রেষ্ঠধর্ম। ধর্মেই স্বর্গসুখ। জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পার্থিব রাজত্ব সম্পদ ত্যাগ করে বনবাসিনী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিংহাসন সহজেই ত্যাগ করা যায়। কিন্তু অর্চি যে মহার্ঘ। প্রিয়ঙ্কর ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে দান করা অসম্ভব।
এ যে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত মহিষী! বিস্মিত অনুগতার কণ্ঠে বিষণ্ন প্রশ্ন, কিন্তু কোন অপরাধে আমাদেরকে এই নিষ্ঠুর দণ্ড দিতে চাইছেন?
দণ্ড কোথায়? ম্লান হাসিমুখে অর্চি বললেন, রাজ সিংহাসন তো শূন্য থাকে না। সেবক সেবিকা সকলেরই প্রয়োজন হয়।
মহিষী সম্ভবত বিশেষ কারণে কারও আচরণে মর্মাহত হয়েছেন। তিনি নিশ্চিত ওই বিশ্বাসঘাতক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পৃথুলাক্ষ্য?
পৃথুলাক্ষ্য তো নিমিত্ত মাত্র। ওকে আয়ত্তে আনা অর্চির অসাধ্য নয়।
তবে!
যুবরাজ ঘোষণা করেছে, শিক্ষান্তে সে আর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করবে না। দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে গেল মহারাজ জীবিত আছেন কিনা অজ্ঞাত। এদিকে রাজ্যের স্থিতি অনিশ্চিত। কুটিল রাজনীতিতে আমিও বীতশ্রদ্ধ। এমতাবস্থায় বানপ্রস্থে গমনই শ্রেয়।

প্রহরীকে দিয়ে সাক্ষাতের নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন মহিষী অর্চি। যথেষ্ট গুরুত্ব বিচারে সেই নির্দেশকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে অতিথি কক্ষে পৃথুলাক্ষ্য উপস্থিত। ভীতিহীন অর্চির চিত্ত প্রশান্ত। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, কি অভিপ্রায় আপনার—মহিষী অর্চিকে শাসনক্ষমতাচ্যুত করে সম্রাটরূপে রাজসিংহাসন?
রাজ্যের কল্যাণে যদি তাই সত্য হয়? পৃথুলাক্ষ্যর নির্ভীক উত্তর।
সেজন্য ইন্ধনে কুৎসা রটনায় শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উত্তেজিত করা নিষ্প্রয়োজন ছিল। আপনি তো ভিক্ষা প্রার্থনায় অভ্যস্ত। আর কল্যাণ? কোন্ কল্যাণের মুখ চেয়ে জ্যেষ্ঠশ্রীর সহধর্মিণীর পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন? কুপ্রস্তাবে সম্মত হইনি বলেই কী আমি ব্যভিচারিণী?
কুপ্রস্তাব বলছেন কেন? পৃথুলাক্ষ্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে অনুশোচনা বিহীন উত্তর দিলেন,

এই রীতি কী ইতিহাস ধর্ম বহির্ভূত? দ্বাদশ বর্ষ প্রতীক্ষাও তো করেছি। এখনও আমার সেই প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার সময় সুযোগ আছে মহিষী অর্চি।
রাজসিংহাসন আর অর্চি—কোনটা আপনার অধিক আকাঙ্ক্ষিত?
দ্বাদশ বর্ষ আমি আপনার অনুগত হয়ে বিশ্বস্ত দায়িত্ব পালন করেছিমাত্র। শুধুমাত্র সিংহাসন লাভ নিশ্চিত উদ্দেশ্য ছিল না।
কিন্তু দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণকালে জনতা আমার বিচার চাইছে যে। কোনকিছুই আর আমার ইচ্ছা নির্ভর নয়। ওদের বিচার নত মস্তকে মান্য করা আমার কর্তব্য। কাল আমি জনতার সম্মুখীন হতে ইচ্ছুক। আপনি প্রকাশ্য বিচার সভার আয়োজন করুন।
মহিষী অর্চি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছেন অনুমান করে পৃথুলাক্ষ্য হতাশ উদভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ হতবাক নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর পরাজিতের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বিষণ্ণ অনুরোধ জানালেন, আমি এখনও আপনার অনুগত। যদি নির্দেশ দেনতো জনতাকে শান্ত করার দায়িত্ব নিতে সক্ষম। বিচারসভা নিষ্প্রয়োজন। আমার ত্রুটি মার্জনা করুন মহিষী।
ক্ষমাসুন্দর স্নিগ্ধ হাসলেন অর্চি, ভীত হচ্ছেন পৃথুলাক্ষ্য? আপনার ন্যায় বীরের ভীতি শোভা পায় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জনতার সম্মুখে আপনার মর্যাদা হানিকর কোন শব্দ বাক্যই আমি ব্যবহার করব না। বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। সভার আয়োজন উদ্দেশে প্রস্থান করুন।
যথা মহিষীর আদেশ।

সময় অপরাহ্ন। জনতার ঘৃণা ধিক্কার ধ্বনিতে প্রকাশ্য বিচার সভাস্থলের বাতাস উষ্ণ বিষাক্ত চঞ্চল। সোচ্চার ধ্বনিতে কৃতকর্মের জন্য মহিষীকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে অথবা তাঁর প্রাণদণ্ড দাবী করছে জনতা। সমস্ত পরিকল্পনাটাই বুঝিবা নিষ্ফল হয়ে যায়—পৃথুলাক্ষ্য বিব্রত উদ্বিগ্ন অস্থির।
সূর্যাস্তকালে যোগিনী বেশে মঞ্চে দর্শন দিলেন মহিষী অর্চি। এলায়িত তাঁর কেশ। গলায় রুদ্রাক্ষ মালা। অনুশোচনামুক্ত অধর। আনন্দময় চোখ। মুখে উজ্জ্বল জ্যোতি। ক্রোধ লজ্জা সঙ্কোচহীন প্রশান্ত ভঙ্গিমা।
মঞ্চে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন না অর্চি। স্মিত হাসিমুখে সকল অভিযোগ কুৎসা ঘৃণা অবজ্ঞা করলেন। ধীর শান্ত পদক্ষেপে মঞ্চের সম্মুখভাগে এসে দাঁড়ালেন।
এযে সাক্ষাৎ অপরূপা দেবী মূর্তি! জনতা বিস্মিত। কে বলবে সুন্দরী অর্চি কামচারিণী শোষক পতিঘাতিনী? এ যেন ত্যাগী তপস্বিনী। এযাবত যারা মহিষীর দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য সুযোগ পায়নি, শুধুমাত্র কানে শুনে কুৎসিত কল্পনা করে এসেছে, তাদের অনুশোচনা হল। যারা মৃত্যুদণ্ডের অনুকূলে ধ্বনি দিচ্ছিল তারা পরিবর্তিত হয়ে ভাবল, এ দেবী বিসর্জন অনুচিত, অসম্ভব। অভূতপূর্ব চুম্বকশক্তিতে নিমেষে ক্ষুব্ধ উত্তেজিত জনতা চমকিত নিশ্চুপ নিস্তব্ধ।
জনতা শান্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াহীন অপেক্ষামানা অর্চি ভাষণ শুরু করলেন--হে শান্তিপ্রিয় নাগরিক বৃন্দ, আপনাদের আনীত অভিযোগগুলির পশ্চাতে যে গূঢ় কারণ নিহিত আছে সে সম্পর্কে আমি যথেষ্ট অবহিত। সত্যকে অস্বীকার করা আমার চরিত্র বিরুদ্ধ। কিন্তু, অসত্যকে

খণ্ডন করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন সূচক বক্তব্য প্রকাশও আমার নীতি বিরুদ্ধ। অভিযোগগুলি যেহেতু আপনাদের, সত্যাসত্য বিচারের দায়িত্বও আপনাদেরই। পাপ পুণ্য অশুদ্ধি শুদ্ধি আমারই সৃষ্টি। একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছেই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি আসক্তিহীনা আমি বিগত দ্বাদশ বর্ষ মানুষের কল্যাণের জন মনুষ্য ধর্ম পালন করেছি মাত্র। অতি সম্প্রতি এক পবিত্র বনবাসী পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করে ক্লান্ত আমি প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পেয়েছি। আরাধ্য প্রার্থিত তিনিই আমাকে উপলব্ধি করিয়েছেন, নারী কেবলমাত্র ভোগবস্তু নয় সম্মানীয়া পাত্রীও। ভোগের পরিবর্তে ত্যাগ, হিংসা বর্জিত অহিংসা, যুদ্ধহীন শান্তি আদর্শ আদরণীয় বাঞ্ছনীয়। মৃত্যুদণ্ড কোন সমাধান-পথ নয়, ক্ষমাই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। অনুতাপানলে দগ্ধ হলেই পাপমুক্তি সম্ভব। রাজপ্রাসাদ, সিংহাসন সম্পদ আত্মীয় প্রিয়জনের পরিবর্তে নির্জন বনই মানুষের অমৃতায়ন। সংসার ধর্ম নারীধর্ম রাজধর্ম পালন অন্তে বানপ্রস্থ যাত্রাইতো যথার্থ আচরিত প্রার্থিত হওয়া উচিত। আমি তাই সর্বত্যাগিনী বনবাসিনীরূপে আত্মদর্শী হতে ইচ্ছুক। আপনারা অনুমোদন করছেন কি?
অবশ্যই অবশ্যই। উল্লসিত জনতা উচ্ছ্বসিত করতালি দিয়ে সাধু প্রস্তাবটিতে সাদর সম্মতি জানাল। সেইসঙ্গে অর্চির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে জয়ধ্বনি করল।
কিন্তু প্রশ্ন, রাজ সিংহাসন শূন্য রেখে আমার বানপ্রস্থ যাত্রা সম্ভব কি?
অসম্ভব অসম্ভব অসম্ভব। ভীতি বিহ্বল জনতার কণ্ঠ সোচ্চার হল।
অতএব উপায়? আমার বানপ্রস্থ যাত্রা তো অনুমোদিত।
সভাস্থল শ্মশান নিস্তব্ধ। জনতা বিমর্ষ নির্বাক হতভম্ব।
উপায় আছে। অর্চি সমস্যা-সমাধান সূত্র শোনালেন, স্বেচ্ছায় হীরণ্যাচলের রাজসিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করে আমি পৃথুলাক্ষ্যকে যোগ্যতম উত্তরাধিকারী ঘোষণা করছি। জনতার একাংশের মধ্যে পৃথুলাক্ষ্য বিরুদ্ধ চাপা গুঞ্জন শ্রবণ করে অর্চি বললেন, পৃথুলাক্ষ্য ক্ষমতা-লিপ্সাহীন অভিজ্ঞ। বিগত দ্বাদশ বর্ষ তিনি যথার্থ অনুগত ছিলেন। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ সন্তুষ্ট। তথাপি এই সুযোগ্য ব্যক্তিকে রাজা মনোনীত করায় কারও আপত্তি থাকলে দ্বিধাহীন হাত উর্দ্ধমুখি করুন।
জনতার একজনও অর্চির ইচ্ছা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করল না। পৃথুলাক্ষ্য সর্বসম্মতিক্রমে হীরণ্যাচলের রাজসিংহাসন লাভ করলেন। তথাপি তিনি আনন্দিত হতে পারলেন না। অর্চির নিকট পরাজিত তিনি গ্লানিতে নির্বাক লজ্জাবনত।

সাত

সময় সেই সায়ন্তনী সন্ধ্যা। মলয় বাতাস বইছে। চন্দনবৃক্ষের ক্ষত থেকে বাতাসে ভাসছে সুবাস। কলকাকলি মুখরিত বনস্থলী এখন নিস্তব্ধ। সরোবর ফুল ফল পশু পাখি শোভিত নিসর্গ এখন নিথর প্রশান্ত। কুঞ্জ কুটিরে জ্বলছে দীপ। একদা হীরণ্যাচলের সম্রাজ্ঞী সুন্দরী অর্চি এখন গৈরিক বসনা কুটির বাসিনী। তিনি তাঁর সর্বত্যাগ-ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণনা করছেন। একমাত্র শ্রোতা গৈরিক বসনধারী প্রিয়ঙ্কর।

আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ। বনস্থলীতে জ্যোৎস্নার প্লাবন। আকাশে শুকতারা দৃশ্যমান। জোনাকি জ্বলছে ইতস্তত। বাতাস শীতল সুবাসিত।

প্রিয়ঙ্কর ঈষৎ চিন্তিত। ভাবাবেগ তাড়িতা হয়ে অর্চির রাজপ্রাসাদ ত্যাগ আর বনবাস বাসনা যথার্থ সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করতে পারছেন না। বর্ণনায় সমাপ্তি রচনা করে প্রিয়ঙ্করের ভারাক্রান্ত অধরের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন অর্চি। নিরুত্তর প্রিয়ঙ্করকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন তিনি, আমি কি কোন অন্যায় করেছি? বিমর্ষ নির্বাক কেন আপনি?

রাজসুখ বর্জিত এই বনবাস কখনই তোমার যোগ্যস্থান নয় অর্চি। অলস ভঙ্গিমায় ভাবনার হেতু প্রকাশ করলেন প্রিয়ঙ্কর।

উপায় কী? স্নিগ্ধ হাসিমুখে অর্চি বললেন, আমি যে পতি পত্নীর পথের অভিন্নতা বুঝতে শিখেছি।

তোমার অভিপ্রায় সন্দেহাতীত সাধু। কিন্তু—

কিন্তু কি?

পথটা যে বড়ই রূঢ় কন্টকময়।

এযাবত ইন্দ্রিয় তাড়নায় বিপথগামী বৃত্তান্ত অকপটে বর্ণনা করে অর্চি বললেন, রাজা নীলাঞ্জনাক্ষ্যর প্রতি আমি যে অন্যায় অবিচার করেছি আপনার ক্ষেত্রে পুনর্বার করতে অনিচ্ছুক। 'ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্য'। কাম বিষয় উপভোগ করে যে কখনও কাম উপশম হয় না—এই শাস্ত্রবাক্য এতদিনে উপলব্ধি করতে পেরেছি। সমাগত দুরন্তকালে ঘৃণ্য আমাকে মোহান্ধ অন্ধকার উত্তীর্ণ মুক্তির পথ প্রদর্শন করুন।

অর্চির জীবন সম্পর্কিত গোপনীয়তা শ্রবণ করে প্রিয়ঙ্কর বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। পরন্তু দ্বিধাহীন সত্যপ্রকাশ করায় পরম প্রীত ক্ষমাশীল পরিচয় দিলেন, তুমিতো ঘৃণ্য নও অর্চি। যাহা সত্য তাহাই পবিত্র। অহং সমন্বিত কাম ক্রোধাদি শূন্য হলে তবেই চিত্ত পবিত্র হয়। অনুশোচনা তাপে দগ্ধ তুমি এখন পবিত্র। এবার তোমাকে যে আত্মদর্শী হতে হবে।

অর্চির চোখে বিস্ময়—অশ্রু। আনন্দ হাসি মুখে উত্তর দিলেন, যিনি স্বয়ং নির্ভয় স্বাধীন হয়ে অন্যকে ভয় থেকে রক্ষা করেন তিনিই তো প্রকৃত প্রতি। 'পতি' শব্দটিতো তাঁদেরই জন্য। হে আমার প্রণম্য পতি, আপনি আমাকে সুখ দুঃখাদি উত্তীর্ণ আনন্দময় নির্মল শান্তির জগতে প্রবেশের পথ প্রদর্শন করুন।

কিন্তু, আরাধনাকালে যদি মন উচাটন হয়? প্রিয়ঙ্কর সতর্ক বাক্য শোনালেন, ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্তি থাকলে ঈপ্সিত বাসনা নিষ্ফল হয়। কেবলমাত্র সাধুসঙ্গেই পরমানন্দ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রস্তুত আছ তুমি?

প্রিয়ঙ্করকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভক্তিনম্রা অর্চি বললেন, আশীর্বাদ করুন আমৃত্যু একমাত্র আপনিই যেন থাকেন আমার সাধুসঙ্গী।

প্রাকৃতিক

ক্ষীণস্রোতা সর্পিল নদীটি পার হলেই ফ্লাগ স্টেশন। নাম ক্রান্তি।

সূর্যডোবা টিলার ছায়ায় আয়েসী ঘুমন্ত বেড়ালের মত নিচু নির্জন প্লাটফর্ম। ছোট্ট স্টেশনঘর। বিরহ আকাশ জুড়ে এখনও আবছা ট্রাইকালার। বোবা বাতাসে বুনো পাতা আর মাটির সোঁদা গন্ধ। দিনের আলো ঝিমন্ত। দূরে চারদিকে স্বপ্নাতুর পাহাড় বৃত্ত। মাঝখানে ছায়ার আঁচল বিছানো কিছু উঁচু নিচু সমতল উপত্যকা। ইতস্তত কয়েকটি টিলা।

সাময়িক স্বল্প সাড়া জাগিয়ে কিছুক্ষণ আগে একটি দূরপাল্লার ট্রেন গেছে। প্লাটফর্ম শূন্য করে সেই ট্রেনে অনেক যাত্রী পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু, নেমেছে মাত্র একজন। যাত্রীটির নাম নীলাঞ্জন। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। মাথায় একরাশ অবাধ্য চুল। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। কাঁধে ঝুলন্ত কাপড়ের ব্যাগ। হাতে ছোট স্যুটকেশ।

শুনশান প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে একা নীলাঞ্জন নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো।

মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বনটিয়া উড়ে গেল। ওদের ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ নৈঃশব্দ্য টুকরো টুকরো করল। নীলাঞ্জনের গা ছম ছম করে উঠল। একা এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গত মনে করল না। প্লাটফর্মের শেষপ্রান্তে স্টেশন ঘরের দিকে পা বাড়াল।

নীলাঞ্জনকে রিসিভ করতে নিজে জীপের চাকায় আবীর-রঙ ধুলো উড়িয়ে মুক্তি এসেছে। ছাতিম গাছের তলায় ছায়া ছায়া আলোয় দাঁড়িয়ে আছে শান্ত সমাহিত নিরুদ্বেগ নদীর মতো।

মুক্তিকে জ্যোৎস্না স্নাত সমুদ্র ফেনার মতো উজ্জ্বল লাগছে। পরনে শিউলি শুভ্র জর্জেট শাড়ি। ম্যাচিং ব্লাউজ। ডাই করা শ্যাম্পু চুল উড়ছে বিজয় নিশানের মতো।

দু'জনে একসময় কাছাকাছি মুখোমুখি হল।

মুক্তির অতলান্ত সমুদ্র দৃষ্টি আর একফালি চাঁদের মতো নির্বাক ঠোঁটের হাসির অভ্যর্থনায় নীলাঞ্জন যেন বৃষ্টিকণার ছোঁয়া পেল। নিবু নিবু আঁচের পলকহীন চোখের আলো ছড়িয়ে মুক্তির সারা শরীরে আদর করল। ভালবাসার ফাগ মাখল। নিমেষে হারিয়ে গেল ছাতিম ফুলের গন্ধ। পরিবর্তে প্রিয় পরিচিত শ্যাম্পুর সুবাসে উপোসী বুক বর্ষা-নদী হয়ে উঠল।

'সানন্দাকে নিয়ে এলে না কেন?' মুক্তির প্রথম প্রশ্ন।

উত্তরে নীলাঞ্জনের অনেক কথা বলার ছিল যা এই মুহূর্তে বলা যায় না। মুক্তি সমুদ্র শঙ্খের সৌন্দর্য নিয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে ভালবাসে তো সানন্দা জেট বিমানের মতো গতি সম্পন্না। সানন্দা টবের অর্কিড ক্যাকটাস তো মুক্তি বনফুল।

'ও এলে কী আমরা যথেষ্ট ফ্রী হতে পারতাম?' নীলাঞ্জন চতুর প্রশ্ন রাখল।

মুক্তির চোখে দুষ্টুমিষ্টি কিশোরীর মতো মধুঝরা ঝিলিক দেখা গেল। সূর্যমুখি ঠোঁটের কোণে আনন্দ ঝরল। একটি লাজুক লতা ফিকে গোলাপি ফুল দোল খাচ্ছে যেন।

এখন পাকা প্রশস্ত সড়ক ধরে জীপ চলছে।

নীলাঞ্জনের পাশে বসে নীরবতায় জীপ চালাচ্ছে চর্যাপদের হরিণী। ওর চুলে কস্তূরীর সুবাস ভাসছে।

সড়কের ডান দিকে বৃটিশ আমলের পরিত্যক্ত কারখানা কলোনী কোলিয়ারী। কিছু পরে আধুনিক কোন কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছোটখাটো জনপদ। আরও পরে বাঁয়ে বাঁক নিলে রূপোসীর আঁচলের মতো একখানা উজ্জ্বল রাস্তা।
কিছুটা এগিয়ে যেতেই বাধা পড়ল। রাস্তার ওপর শালবল্লা ঝুলছে। জীপের হর্ণ শুনে গুমটি ঘর থেকে চৌকীর রক্ষী বেরিয়ে এল। মুক্তিকে চিনতে পেরে সেলাম ঠুকল। তারপর চটজলদি পথের বাধা মুক্ত করে দিল।
কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর রাস্তার দু'ধারে ঘন গাছ গাছালি দেখে অরণ্য মনে হয়। জীপটা যেন এবার অরণ্য অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে।
এরই মধ্যে আকাশে রাতের বাতি জ্বলে উঠেছে। সন্ধ্যা-অন্ধকারে অরণ্যপথকে বেশি স্পষ্ট লাগছে। উঁচু নিচু পথটা ঘুমন্ত পাহাড়ি সাপের মতো পড়ে আছে। দু'পাশে শাড়ির পাড়ের মতো লাল হলুদ কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া ফুলের সমারোহ। গাছেরা সনির্বন্ধ। ঝাঁকড়া বুনোট পাতার অন্ধকার-আড়াল থেকে পাখিরা গান গাইছে সমবেত। ইতস্তত বিদ্যুৎ-বাতিস্তম্ভে আলো জ্বলছে। যেন ছায়া আলোর জাফরিকাটা শাড়ি পরা তরুণী যত। শির শির বাতাস বইছে। ফুল আর শুকনো পাতা ঝরছে ঝুর্‌ঝুর্‌।
নীলাঞ্জন অভিভূত হয়ে পড়ল।
'কেমন লাগছে নীল'? নির্বাক নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে মুক্তি জানতে চাইল।
'কাকে? প্রকৃতি, নাকি অনেক দিন পর তোমাকে?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নীলাঞ্জন অন্যভাবে বলল, 'জানইতো—সুন্দরী রমণী আর প্রকৃতির প্রতি আমার ভীষণরকম দুর্বলতা।'
'এখনও!' মুক্তির কণ্ঠস্বরে কপট বিস্ময়। পরে প্রশ্ন জুড়ল, 'আরও কতদিন এমন থাকবে?'
'চিরকাল। আজীবন। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন। সেজন্যইতো সানন্দার যত ভয়।'
'কিসের ভয়?'
'এই বুঝি ওর স্বামীটিকে কেউ হাতিয়ে নিল।'
'এই বয়সেও?'
'কেন, চেহারা কি বলছে, আমি বুড়িয়ে গেছি?'
'তা অবশ্য নয়। বয়সের তুলনায় বরং বেশ ইয়াং হ্যান্ডসামই লাগছে। তবে কী জানো? রূপবান পুরুষ হল প্রথম যৌবনের মেয়েদের কাছে আকর্ষণ।'
'তারপর?'
'নিরাপত্তার জন্য ওরা একজন পুরুষকে চায় যে কিনা অর্থস্বচ্ছল।'
'আর এখন?' নীলাঞ্জন তির্যক তাকাল।
ক্যাচ্‌ করে জীপ থামাল মুক্তি। ঝাঁকুনি সামলে উঠে শ্রাগ করে বলল, 'এই বয়সে মেয়েরা একজন গুণী ব্যক্তিত্বের স্ত্রী হলে খুশি হয়। গর্ববোধ করে।'
নীলাঞ্জন নিরুত্তর রইল।
আবার জীপ চলছে।
কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর মুক্তি বলল, 'আজকাল আর কিছুই লিখছ না বোধহয়?'
নীলাঞ্জন অসম্ভব গম্ভীর হয়ে কোন জবাব দিল না। শুধু ম্লান হাসল।
ফটকের পর অনেকটা নুড়িপথ পেরিয়ে একটা সুন্দর বাংলোর সামনে এসে জীপটা দাঁড়াল। হর্ণের তীব্র শব্দ শুনে চারদিকের ঝাঁকড়ানো গাছের আড়াল থেকে পাখিরা সোরগোল তুলল।

মুক্তির স্বামী অরিন্দম আচার্য প্রতীক্ষায় ছিলেন। বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে নীলাঞ্জনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। শুরুতেই অভিযুক্ত করলেন, 'কতদিন পর আবার দেখা হল বলুনতো! এর মধ্যে সমুদ্রের ধারে সুন্দর একটা জায়গায় বদলি হয়েছিলাম। মুক্তিকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে আপনাকে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলাম। এলেন নাতো!'
'ইচ্ছে করলেই কী আর সব সময় আসা যায়?'
'হোয়াই নট?' মানতে রাজী নয় অরিন্দম বললেন, 'ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। এরপর থেকে শত বাধা থাকলেও কষ্ট করে চলে আসবেন। আজ আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারব না।'
অরিন্দম বড় ভালমানুষ। দম্ভহীন চাতুর্যহীন। পাণ্ডিত্য বুদ্ধিতে দীপ্ত। কথা বলার ভঙ্গীতে অসাধারণ চুম্বক শক্তি। যেকোন মানুষকেই অল্প সময়ে আপন করে কাছে টেনে নিতে সক্ষম।
রাতে খাবার-টেবিলে বসে অরিন্দম হাজার কথার মাঝে পুরনো প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। এবার অভিযোগ মুক্তির বিরুদ্ধে, 'বিয়ের পর থেকেই আপনার সুখ্যাতি শুনে শুনে কান দু'টো ঝালাপালা হয়ে যেত। যখন অচেনা আপনাকে রীতিমতো হিংসা করতে শুরু করেছি, ঠিক সেইসময় আপনার সঙ্গে পরিচিত হলাম। প্রথম সাক্ষাতেই আপনার চোখ মুখ ব্যবহার বলে দিল, আপনি খুব ভাল মানুষ। তারপর আবার একজন শিল্পী সাহিত্যিক। তাই বড্ড বেশি ভালবেসে ফেললাম। এখন আপনার সম্পর্কে এতবেশি খোঁজখবর রাখতে চাই যে প্রশ্ন শুনে মুক্তি সঙ্কোচ বোধ করে। কৌতূহলী বেশি প্রশ্ন করলে ও অসন্তুষ্ট হয়ে মেজাজ দেখায়।'
'এতটা ভালবাসেন বুঝতে পারলে যত বাধাই থাক না কেন আরও আগেই আসতাম।'
'এবার থেকে তা'হলে আসবেনতো?'
'আসব।'
'আসলে কি জানেন, জল জঙ্গল গ্রামে পোস্টিং-এর চাকরি। যাযাবরী জীবনে মনের মতো মানুষ পাওয়া দায়। আমি তবু কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি। ক্লাবে যাই। হঠাৎ হঠাৎ রাজধানীর অফিসেও যেতে হয়। এই যেমন দু'একদিনের মধ্যেই হয়ত দিল্লী অফিস থেকে ডাক আসবে। মুক্তি ক্লাবে যাওয়া পছন্দ করে না। ইন্টারকম ফোনে কারও সঙ্গে তেমন কথা চালাচালি করে না। এখানে পাঁচজন এক হল তো আলোচনার বিষয় শুধু অপরের কেচ্ছা কথা। ভি সি পি আর বই নিয়েই বেশি সময় কাটাতে হয়। আমি দু'চারদিন বাইরে গেলে বড্ড বোর ফিল করে। আপনি এসে পড়ায় ভালই হ'ল। আমি দিল্লী গেলে এবার ওর ততটা খারাপ লাগবে না।'
অরিন্দম সরল মনেই বললেন। নীলাঞ্জন কিন্তু ততটা সহজভাবে নিতে পারল না। চোর চোখে মুক্তির দিকে তাকাল। মুক্তির কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল না।
ছাদে চিল কুঠুরির মতো ঘরখানা চৌকো নয়, পাঁচ ভাঁজের। দু'ভাঁজে ভারী পর্দায় ঢাকা কাঁচের জানলা। একদিকে দেয়ালে বাঘের চামড়া ঝোলানো। দরজার ওপর শিংসহ হরিণের খুলি টাঙানো। গালিচা পাতা মেঝে। ফায়ার প্লেসও আছে। এ্যাটাচ বাথ। দেয়াল অভ্যন্তরে ওয়াড্রব আলমারি। টেবিল চেয়ার। টেবিলের ওপর বাতি, কিছু ম্যাগাজিন কলম আর এক বান্ডিল কাগজ। এ্যাসট্রে সিগারেট লাইটার রাখা। টেবিল এ্যালবামে রবীন্দ্রনাথের একখানা রঙিন ছবি। সামনে ডিসে রয়েছে কিছু সুগন্ধী ফুল।

ডিভানে শোওয়ার ব্যবস্থা ঝুঝিয়ে অরিন্দম নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রস্তাব রাখলেন, 'ঘরটা সাজিয়েছে মুক্তি। পরিকল্পনাটা অবশ্য আমার। যে ক'দিন থাকবেন তারমধ্যে চমকদার কিছু লেখা চাই-ই। আমার অর্ডার থাকবে, কেউ কোনরকম ডিসটার্ব করবে না। এমন কি মুক্তিকেই আসতে বারণ করে দেব। প্রয়োজনে কলিং বেল বাজালে তবেই কেউ আসবে। চানতো সকাল বিকেলের চা জলখাবার আর লাঞ্চ ডিনার পর্যন্ত এখানেই পেয়ে যাবেন।'
'আমি কী এমন কিছু দরের!' অবাক নীলাঞ্জন বলল, 'কি দরকার ছিল এসবের?'
'দরের নাহলেও প্রতিভাবান তো বটে। সার্থক সৃষ্টির জন্য যে যথার্থ পরিবেশ দরকার হয় আমি তা জানি।'
নীলাঞ্জন আর কথা বাড়াল না।

বাংলোটা একটা টিলার ওপর। ইংরেজ আমলে সাহেবদের জন্য গড়া হয়েছিল। তাই প্রাচীন হলেও এখনও বেশ অক্ষত অটুট।
বাংলো নয়তো যেন দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ। বিরাট আকারের জানলা দরজাঅলা ছোট বড় মাঝারি অনেকগুলি ঘর। অনেক ঘরে ফায়ার প্লেস আছে। মেঝেতে গালিচা পাতা। বেত মেহগিনীর আসবাবপত্র ঠাসা। উঁচু পাটাতনের বাথরুম। কমোড বাথটব বেসিন গীজার সাওয়ার ব্যবস্থা।
সামনে বিশাল বিশাল থামঅলা চওড়া বারান্দা। পিছনের দরজা খুললে প্রশস্ত উঠান। আমলকি গাছের নিচে ইঁদারা। পাম্পে ছাদের ট্যাঙ্কে জল ওঠার ব্যবস্থা সম্ভবত সাম্প্রতিক কালের সংযোজন।
বাংলোটা চৌকো নয়, অদ্ভুত ধরনের তিন ভাঁজের। বৃত্তাকারে রাস্তা লাল সুরকি নুড়ি কাঁকড় বিছানো দিয়ে ঢাকা। সামনে সবুজ ঘাসের লন। শাদা ক্রিসেন্থিনামের বর্ডার দেয়া। সিনিয়া ফুলের রেখাচিত্র আঁকা। পাশে পরিত্যক্ত টেনিস কোর্ট। ফোয়ারা দোলনা পার্ক। চারদিকে ইউক্যালিপটাস অশোক কৃষ্ণচূড়া আরও কত কি যে গাছ! যেন বোটানিক্যাল গার্ডেন। কেয়া কাঁটামনসা যুঁই হাস্নুহানা বোগনভেলিয়ার ঝোপ। করবী শিউলি স্থলপদ্ম জবা ফুলের গাছ। নাগচম্পা গাছও আছে একটা। সবশেষে কাঁটালতার বেড়া ঘেরা চৌহদ্দী।
এখান থেকে অল্প দূরে পাওয়ার হাউস গড়ার কাজ চলছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নানা ভাষাভাষী কর্মীদের জন্য অস্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে। ছোটখাটো বাজার দোকানপাট হয়েছে। আছে গেস্ট হাউস ক্লাব হাসপাতাল।
এই বিশাল বাংলোটা পদমর্যাদায় মেডিক্যাল অফিসার, জেনারেল ম্যানেজার আর চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে।
সামনের দিক থেকে কোন শরিকের মুখদর্শন সুযোগ নেই। কিন্তু উঠানকে কেন্দ্র করে পিছন দরজা খুললে সকলেই মুখোমুখি। ফাঁকা দিকটায় ঝি চাকর ড্রাইভার মালিদের থাকার আস্তানা।

গাছগাছালিতে হাজার রকমের পাখির সমবেত অর্কেস্ট্রায় নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে প্রতিদিন প্রত্যূষ ঘোষিত হয়। আকাশের ঘুম ভাঙে।
নীলাঞ্জনের ঘুম ভাঙল।
এখন পেঁজা তুলোর মতো কুয়াশা ভেদ করে দিনের আলো বেরিয়েছে। স্বচ্ছ পোশাক আবৃতা নিদ্রা-উত্থিতা ঢুলু ঢুলু প্রকৃতি। ফিকে সবুজ শাড়ির রূপোলী নদীর চওড়া পাড় দেখা যাচ্ছে। স্নান সেরে এয়োতির কপালের সিঁদুরের মত সূর্য উঠল।

ভোরের নরম হলুদ সোনালি রোদ্দুর গায়ে মেখে পাখিরা শিস দিচ্ছে। কিচির মিচির কথা বলছে। শিশির ভেজা বন ফুল পাতার গন্ধ ভরা বাতাসে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ছে।
ধারে কাছে অচেনা খানিকটা পথ হেঁটে ফিরে এসেছে নীলাঞ্জন। অনেকক্ষণ হল লনের ভেজা সবুজ গালিচায় নবাবের ভঙ্গিমায় পায়চারী করছে।
অরিন্দম কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। নীলাঞ্জনকে নজরে পড়তে 'গুড মর্নিং' জানিয়ে বললেন, 'এখন সাইটে পুরাদমে কাজ চলছে। রোজ সাতসকালে পাওয়ার হাউস সাইডিং-এ যেতে হচ্ছে। আপনাকে নিয়ে যাব একদিন।'
'দুপুরে খাবেন কোথায়?' নীলাঞ্জন জিগ্যেস করল।
'ফিরে এসে একসঙ্গে খাব।'
ব্যস্ত অরিন্দম গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। শব্দ তুলে জীপটা নিমেষে যেন গভীর কোন অরণ্যে মিলিয়ে গেল। সুন্দর সকালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ নীলাঞ্জন গুনগুনিয়ে উঠল, 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে।'
নিজেকে এই রমণীয় মুহূর্তে পৃথিবীর অন্যতম সুখীজনদের একজন মনে হচ্ছে। ভাবছে, শহরের ভিড়ভাট্টা জ্যামজট দুর্গন্ধ ধোঁয়া হৈ হট্টগোলে কি যে পায় সানন্দা!
সজনের ডালে একটা নীল পাখি দোল খাচ্ছিল। নীল আকাশে উড়ে গেল।
নীলাঞ্জনের নীল পাখি হয়ে কৈশোরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হল।
দুখীর বুড়িমাকে সখেদে প্রায়ই বলতে শোনা যেত, 'আপন থেকে পর ভাল। পর থেকে জঙ্গল ভাল।'
তারপর লোভনীয় কল্পনার রঙীন যৌবনে ঘরের গুরুজনদের উদ্দেশে ওঁদের দীক্ষাগুরুর মুখ থেকে একবার শোনা গিয়েছিল, 'মানুষ মাত্রেরই ভগবত সচেতন আত্মানুসন্ধানী হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য মাঝে মাঝে সংসার ছেড়ে কিছুদিন নির্জন অরণ্যে নিঃসঙ্গ অজ্ঞাতবাস দরকার।'
তখন কি এতসব আধ্যাত্ম তত্ত্বকথার গূঢ় অর্থ বুঝতাম? এখনই বা কতটুকু বুঝি?
নীলাঞ্জন আপনমনে নানা প্রশ্নের জাল বুনে চলল।
এই যে জটিল রাজনীতির আখড়া, কর্মক্ষেত্র আর টোল খাওয়া স্বপ্নসুখ নাভিশ্বাসের সংসার ছেড়ে একা চলে এসেছি সেটা কোন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে? তবে কী কারও দুর্বার আকর্ষণে।
নীলাঞ্জন সঠিক কোন উত্তর খুঁজে পেল না।
সকালে চা জলখাবারের টেবিলে বসে মুক্তি লেখালেখির প্রসঙ্গ টেনে আনল।
'আজ থেকে লেখা শুরু করবে তো?'
'ভাবছি।'
'অনেক অনেক লেখ নীল। লেখা থামিও না। দারুণ কিছু লেখার চেষ্টা কর। বন্ধুদের কত নাম ডাক খ্যাতি! ওদের লেখা নিয়ে নাটক সিনেমা টিভি সিরিয়াল হচ্ছে। কাগজে আলোচনা পরিচিতি বের হচ্ছে। আর তুমি?'
এসব নিয়ে নীলাঞ্জন একেবারেই মাথা ঘামায় না তা নয়। কিন্তু কি লাভ? একালে যোগ্যতা থাকলেও যেমনটি এ্যাম্বিশান সেখানে পৌঁছানো সহজসাধ্য নয়। সাহিত্য নিয়ে এম.এ পাশ করে দমকলের চাকরি করতে হয়। জার্নালিজম কোর্সের ডিগ্রীর কোন মূল্যই দেয়নি খবরের কাগজগুলি। আর অধ্যাপনা? কয়েকজোড়া ডক্টরেট যেখানে প্রার্থী আর রাজনৈতিক দলের সুপারিশ হল প্রধান খুঁটি সেখানে পাত্তা পাবে কেমন করে? সব কিছুতেই উল্টোসিধা গলিপথ।

অনেক কাঠখড় পোড়ানো ব্যাপার স্যাপার। সব মানুষের কি সবকিছু যোগ্যতা থাকে?
নীলাঞ্জন বাধ্য হয়ে মানসিকতায় বেমানান না-পছন্দ চাকরি করছে এখন।
'জীবনের কুঁজ নিয়ে সংগ্রামী সংসার আর অফিস করছি আমি'। মুক্তির প্রশ্নের জবাব দিল নীলাঞ্জন।
'তোমার লেখক বন্ধুরা বুঝি তা করে না?'
'গল্প নাটক উপন্যাসে হালের বিখ্যাত সমরের স্ত্রী সাধনাকে তো তুমি চেন?'
'আমাদের ইয়ারেইতো সাধনা এম.এ পড়েছে—চিনব না কেন? সাধনা ভালবেসে সমরকে বিয়ে করেছে এ খবরতো সকলের জানা।'
'সাধনার সঙ্গে হঠাৎ একদিন নিউ মার্কেটে দেখা হয়েছিল। অনেক ক্ষোভ দুঃখ শোনাল। সমর নাকি সংসারের কোন খোঁজ রাখে না। শুধু টাকা দিয়েই খালাস। ঠিকঠাক ঘরে পর্যন্ত ফেরে না। যেটুকু সময় ঘরে থাকে তো ওই লেখালেখি নিয়ে কাটায়। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম, তুমি কিছু বল না? কি উত্তর দিল শুনলে অবাক হবে তুমি।'
'কি বলল?'
'বলে কিনা, না ছাড়লে বড় হবে কেমন করে?'
নীলাঞ্জন লক্ষ্য করল, মুক্তি মোটেই অবাক হল না। ও এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যা দেখে নীলাঞ্জনই অবাক অস্বস্তিতে পড়ল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, 'সেবার সমরের পুরস্কার পাওয়ার খবরটা পড়ে দারুণ আনন্দ হয়েছিল। ফোনে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে সমরকে পেলাম না। সাধনা ফোন তুলেছিল। বললাম, অভিনন্দন তোমাকেও।'
'আমাকে কেন?'
'সাধনার গলায় বেশ বিস্ময় কৌতূহল টের পেয়ে বললাম, তোমার প্রেরণা ছাড়া সমরের এই পুরস্কার পাওয়া সম্ভব ছিল না।'
'তাই বুঝি?' মুক্তির ঠোঁটে এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল।
'অবাক হচ্ছো! সৃষ্টির নাভিমূলে থাকে রোমাণ্টিকতা। সীমাবদ্ধতার মধ্যে কোন অভিজ্ঞতা জন্মায় না। মুক্ত ডানা মেলে উড়তে হয়। সংসারকে বঞ্চনা আর নারীর প্রেরণা ছাড়া মহৎ সৃষ্টিকার হওয়া যায় না।'
'এতো তুমি নতুন কিছু শোনাচ্ছ না নীল। তোমাকে মহৎ সৃষ্টিকার হতে দিতে চেয়েছিলাম বলেইতো অসম্ভব কষ্ট বুকে ধরে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলাম।'
মুক্তির চোখের কোণে বিকেলের বিষণ্ণতা নেমে এল।
বোবা বোকার মতো উদাসী দৃষ্টিতে পিছন ফিরে তাকাল। টকটকে লাল যৌবনের স্মৃতি নড়েচড়ে উঠল। চড়াই পাখির মত ওড়াউড়ি শুরু করল।

।। দুই ।।

তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র জীবন।
মধ্যবিত্ত অভাবী সংগ্রামী সংসারের কর্তব্যের বোঝা কাঁধে নীলাঞ্জন। মফস্বল কলেজ থেকে পাশ করে কলকাতায় পড়তে এসেছে। পরিমিত লম্বা শীর্ণ শরীর। আপনভোলা উদাসীন। পোশাকে চরম অযত্ন ঔদাসীন্য। পরনে খদ্দরের পায়জামা আর গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলন্ত। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। প্রশস্ত কপালের ওপর দিয়ে দু'ভুরুর আড়াআড়ি আগোছোলো চুলের কিছুটা অংশ।

প্রেম ভালবাসা সম্পর্কে নীলাঞ্জনের ধারণা তখন অন্যরকম। ভাবত, ওসবের জন্য রূপ গুণ অর্থ আর অফুরন্ত বেহিসেবি সময় হাতে থাকা দরকার। দরকার, কিছুটা বেহায়াপনাও। নীলাঞ্জনের এসব কিছুই ছিল না। নীলাঞ্জন তখন নিয়ম-নীতিনিষ্ঠ। শান্ত প্রসারিত দৃষ্টি। হিসেব করা বাচনভঙ্গী। সর্বক্ষণ মুখে আঁটা থাকত দুর্বোধ্য হাসি। ব্যস্ত থাকত, দেয়াল পত্রিকা লিটল ম্যাগাজিন আর ছাত্র ইউনিয়ন নিয়ে।

ক্লাশে দ্বিতীয় সারির কোণের দিকে বসত নীলাঞ্জন। সামনের সারিটা ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মুক্তি বসত ঠিক ওর সামনে। উজ্জ্বল চোখ টিকালো নাক আর টানা টানা ভুরু নিয়ে মুক্তি। পিঠের ওপর ঝুলত দীর্ঘ চুলের বেণী। শিউলি ফুলের মত স্নিগ্ধ মুক্তি। ওর সলজ্জ বিনয়ী নম্রতা ছিল নজরে পড়ার মতো।

এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রার মতো মেয়েদের সঙ্গে মুক্তি সময় কাটাত। ক্লাসের অধিকাংশ ছেলেরাই ওর কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করত। কফি হাউসের সমস্ত ভিড় ভেদ করে অনেকেরই দৃষ্টি মুক্তির দিকে ঘুরপাক খেত।

মুক্তিকে নীলাঞ্জনেরও ভাল লাগত। দু'জনে দৃষ্টি বিনিময় হলে লাজুক লতার মতো কুঁকড়ে যেত মুক্তি। পরক্ষণেই চোর চোখে তাকাত।

বলতে গেলে সেই থেকেই নীলাঞ্জন বুঝতে শিখেছে, চোখেরও ভাষা আছে। চোখ কথা বলে। সেই কথার মর্মার্থ হালকা ভাসা ভাসা নয়। অনেক গভীরে নরম আঁচড় কাটার মতো। নীলাঞ্জনের বুকের ভেতরকার সবুজ পাতার গাছে লাল গোলাপটা দোল খেয়ে যেত। যার নাম বোধহয় ভালবাসা। ভালবাসা এক আশ্চর্যরকম অনুভূতির নাম।

নীলাঞ্জনের পাশেই বসত বাগবাজারের অতীন দত্ত। অতীন বনেদী বাড়ির একমাত্র উত্তরাধিকারী নাদুস নুদুস ছেলে। নিজেদের গাড়িতে ইউনিভার্সিটি যাতায়াত করত। দু'হাতে দেদার টাকা ছড়িয়ে অনেক বন্ধু জুটিয়েছে অতীন।

ক্লাশ চলাকালীন সময়ে মুক্তি হঠাৎ হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাত। সঙ্কোচহীন হাসত। অতীনের সঙ্গে টুকটাক কথা বলত। তাতেই অতীন খুশিতে ডগমগ। আহ্লাদে আটখানা। বুকে বেজায় গর্ব।

অতীন ছিল মুখচোরা লাজুক প্রকৃতির। ভীতুও। ক্লাশের বাইরে মুক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সহজ আলাপ জমাতে সাহসে কুলতো না।

কিছু বন্ধু অতীনকে বুঝিয়েছিল, 'মুক্তি তোকে মনে হচ্ছে ভালবাসে। মেয়েদের বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না। প্রথম তোকেই এগিয়ে যেতে হবে।'

ফর্সা অতীন লজ্জায় লাল হয়ে যেত। মনে মনে হয়তবা নানা বর্ণালী স্বপ্নও দেখত। কিন্তু কিছুতেই মুক্তির মুখোমুখি হওয়ার সাহস পেত না।

সব কিছু জেনেশুনে অতীনের হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল নীলাঞ্জন। অতীনকে মুক্তির বাড়ির ফোন নম্বর এনে দিয়েছিল। তাতেও কোন কাজ হল না।

তারপর একদিন পাবলিক ফোন গুমটিতে নীলাঞ্জনের পাশে দাঁড়িয়েছিল অতীন। নীলাঞ্জন বার বার ডায়াল ঘোরাচ্ছিল। অনেক পরে লাইন পাওয়া যেতে ওপার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যালো।'

'মুক্তিকে একবার ডেকে দেবেন?'

'কথা বলছি। আপনি?'

হাতের মুঠিতে রিসিভারটা চেপে ধরল নীলাঞ্জন। তারপর অতীনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'পেয়েছি। যা খুশি প্রাণ খুলে বল। নো প্রব্লেম, নো রিসক। আমি বাইরে যাচ্ছি।'
অতীন ততক্ষণে ঘামতে শুরু করেছে। অল্প অল্প কাঁপছে। রিসিভার ধরবে কী! একরকম ছুটে গুমটির বাইরে চলে গেল।
মুক্তি তখনও লাইন কাটেনি। নীলাঞ্জনও রিসিভার ছাড়ল না।
'হ্যালো আমি নীলাঞ্জন বলছি।'
'ব্যাপার কি?'
'জরুরি কথা ছিল।'
'কি কথা?'
'ফোনে বলা যাবে না।'
'আমিতো আসছিলামই। তা'হলে ফোন করতে গেলে কেন?'
'ইউনিভার্সিটিতে সকলের সামনে বলা যাবে না তাই—'
'বেশতো, কোথায় কখন বল।'
'একটায় অফ পিরিয়ড আছে। বসন্ততে একা চলে এসো।'
অনেক করে বোঝানো সত্ত্বেও মুক্তির মুখোমুখি হতে অতীন সাহস পেল না। অগত্যা নীলাঞ্জন একাই বসেছিল। ঠিক সময়ে মুক্তি এল। দ্বিধাহীন সপ্রতিভ।
নীলাঞ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুক্তিকে নিয়ে ঢাকা বারান্দায় দেয়ালের আড়ালে টেবিলটাতে বসল।
'এতই গোপনীয়!' অবাক মুক্তি আঁচলে মুখ মুছে বলল, 'এবার বলে ফেল, কি এমন জরুরী কথা?'
নীলাঞ্জন সমস্যায় পড়ল। কিছুতেই সহজ হতে পারছিল না। মুক্তির দিকে তাকাতে গিয়ে বুকের ভেতর ভয়ের শিরশিরানি অনুভব করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে উদ্ভ্রান্ত ধোঁয়া ছেড়ে চলল।
'সত্যিই কী তোমার কিছু বলার আছে?' নির্বাক নীলাঞ্জনের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে মুক্তি বলল, 'তোমার হাবভাব কিন্তু ভাল ঠেকছে'না।'
'বলার আছে এবং বলবও। তার আগে চা আসুক।'
নীলাঞ্জন দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে মুক্তি ব্যস্ততা দেখাল।
'এবার তাহলে বল।'
'অতীনকেতো চেন?'
'তোমার পাশে বসেতো?'
'হ্যাঁ। অতীন খুব ভাল ছেলে। কিন্তু ভীষণ মুখচোরা। তোমাকে ওর দারুণ পছন্দ। মনে মনে ভালবাসলেও মুখ ফুটে বলতে পারছে না।'
'তাই তুমি ওর হয়ে সুপারিশ করছো?'
'ঠিক তা নয়। ওর হয়ে প্রস্তাবটা রাখছি বলতে পার।'
এত সহজেই যে মুক্তি গূঢ় অর্থটা ধরতে পেরেছে তাতে নীলাঞ্জন উৎসাহিত হতে গিয়ে আত্কে চোখ সরিয়ে নিল। একি দেখছে? মুক্তির চোখ থেকে যেন আগুন বের হচ্ছে। মুখের আদল ভয়ঙ্কর লাগছে। তীব্র উত্তেজনা আয়ত্তে এনে মুক্তি ক্ষোভ জানাল, 'ছিঃ নীলাঞ্জন

ছিঃ। আমাকে তুমি কতটুকু জান যে এরকম একটা প্রস্তাব জানাতে ডেকেছো। অতীন কি রসগোল্লা যে তুমি বললে আর আমি গিলে ফেলব!'
'অতীনতো ভাল ছেলে। ওদের ফ্যামিলিও যথেষ্ট রেসপেকটেবল। তোমার অযোগ্য হলে নিশ্চয়ই বলতাম না। পছন্দ অপছন্দ তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেটা বলে দিলেই তো মিটে যায়। আমার অপরাধটা কোথায়?'
'প্রেম ভালবাসা বলে কয়ে জুড়ে দেয়ার ব্যাপার না নীলাঞ্জন। সেই কাজটাই তুমি করতে এগিয়ে এসেছো। এটাই তোমার মস্তবড় ভুল হয়েছে। অপরাধ বলছি না।'
ওর অনুরোধেই তোমাকে ফোন করেছিলাম। রিসিভারটা এগিয়ে দিতে ও পালিয়ে গিয়েছিল। তোমার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম। এখানেও ও আসতে সাহস পেল না। অথচ, আমার কথাতেই তুমি এখানে একা এসে অপেক্ষা করবে। অন্য আর কি উপায় ছিল, বল।'
'বুঝলাম। কিন্তু আমি খুউব খুশি হতাম যদি প্রস্তাবটা তুমি নিজের জন্য দিতে।'
মুক্তি উঠে দাঁড়াল। চায়ের বিলটা নিজে থেকে মিটিয়ে দিয়ে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না।

পরের দিন মহাজাতি সদনে ছিল বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
সকাল থেকেই সেদিন নীলাঞ্জনের মন উচ্ছল খুশি ঝলমল। সারা দুপুর সে যে কি ছটফটানি! চোখের পাতা কিছুতেই এক করতে পারছিল না। পাশের বাড়ির রেডিও থেকে গান ভেসে আসছিল, 'ওগো মোর গীতিময়, ...সেই সাগর বেলায় ঝিনুক খোঁজার ছলে, গান গেয়ে পরিচয়।'
নীলাঞ্জন মনের সুখে সমুদ্র-ফেনা মেখে মিহি মসৃণ বালিতে গড়াগড়ি খেল। স্বপ্ন-সঞ্চারিণী মুক্তির সঙ্গে সমুদ্রের ঝিনুক কুড়িয়ে কাটাল। তারপর বিকেল হতে ধোপ দুরস্ত পায়জামা পাঞ্জাবী পরে পরিপাটি চুলে রওনা হল।
মঞ্চে তখন দুধসাদা আলোর বন্যা।
মুক্তির পরনে চওড়া লাল পাড় সাদা শাড়ি। লাল ব্লাউজ। রেশমী চুলের খোঁপায় জড়ানো যূঁইকুঁড়ি মালা। কাজল টানা চোখে হীরক উজ্জ্বল মণি। কপালে চন্দনের টিপ। মঞ্চে বসে মুক্তি গাইছে, 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না....'
গান গাওয়া শেষ করে মুক্তি কাছে এসে দাঁড়াল। বিমুগ্ধ নীলাঞ্জন মুক্তির সমুদ্র-চোখে চোখ রাখল। মুক্তির আরক্ত ঠোঁট ঈষৎ কেঁপে উঠল। বোবা দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর লাজুক আনত হল। ভীরু পা ফেলে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।
ক'দিন পর অফ পিরিয়ডে একঝাঁক উজ্জ্বল পায়রার মতো বান্ধবীদের মধ্যে মুক্তি বসে আছে। গল্প গুজব চলছে। আচমকা নীলাঞ্জন এসে কাছে দাঁড়াল। মুক্তির দিকে দৃষ্টি রেখে সমবেত সকলের উদ্দেশে বলল, 'স্যরি টু ডিসটার্ব। সামান্য একটু সময় নেব।'
'নীড নট ইন্ট্রোডাকশান প্লীজ।' দলের ভেতর থেকে একজন বলল।
'অফকোর্স নট।' সপ্রতিভ নীলাঞ্জন বলল, 'এবারকার ছাত্র-ইউনিয়ন ইলেকশনে আমি একজন ক্যানডিডেট। তাই—'
'জানি।' বাকিটুকু বলার আগেই মুক্তি বলল, 'দেয়ালে পোস্টার দেখেছি।'
'উই হেট পলিটিকস্। কোনরকম ইজম সম্পর্কে তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।' মুক্তির এক বান্ধবী বিরক্তি প্রকাশ করল।

'আমি ওসবের ধারে কাছেও যাব না।' নীলাঞ্জন ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ধরে বলল, 'এখানে সকলেই ম্যাচিওরড্ বলে আমার বিশ্বাস। সুতরাং, কোন কিছু বোঝাতে যাওয়া অনর্থক তা আমি জানি। আমার একটাই রিকোয়েস্ট, ওই দিনটাতে কারও এ্যাবসেন্ট হওয়া মানেই একটা ভ্যালুয়েবল ভোট নষ্ট হওয়া— সেটা যেন না হয়। ক্যান্‌ডিডেটরা কেউই অপরিচিত না। আশা করি ভোটাররাও কমিটেড হবে না। যথাযথ বিচার বিবেচনা করে যোগ্যকেই নির্বাচিত করবে। ও কে?'

সেদিন প্রচলিত ধারার বাইরে নীলাঞ্জনের ব্যতিক্রম ভোট ভিক্ষা সবাইকে অবাক অভিভূত করেছিল। আর মুক্তি? ওর গহীন গোপন জলাশয়ে শির শির কাঁপন ধরেছিল।

কলকাতার বাঘা বাঘা ছেলেদেরকে বিস্তর ভোটে হারিয়ে দিয়েছিল মফস্বলের নীলাঞ্জন। অতি সাধারণ ছাত্র হয়েও হঠাৎই পাদপ্রদীপের আলোয় এসে পড়েছিল।

কুমারী মনতো এরকম বিজয়ীর প্রতীক্ষাতেই আঁচল পেতে বসে থাকে। সেই থেকে নীলাঞ্জন আর মুক্তির মন দেয়া নেয়া। ভালবাসাবাসি। কাছে আসাআসি। নানা স্বপ্ন দেখাদেখি। অতি অল্প দিনের মধ্যেই মুক্তি আবিষ্কার করে ফেলল, নীলাঞ্জন উগ্র বুর্জোয়া-বিদ্বেষী। নৈরাশ্য বিরোধী। এই জন্মেই যা কিছু পাওয়ার দাবীদার। প্রাপ্য কেড়ে নেয়ার আন্দোলনে আপোষহীন সংগ্রামী। মিছিল শ্লোগান সভা বক্তৃতা নির্ভর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত ওর জীবন।

সকালের দিকে ক্লাস থাকলে প্রায়ই নীলাঞ্জন দিনের খাবার খেয়ে আসতে পারত না। অভুক্ত আছে জানতে পারলে মুক্তি জোর করে নিয়ে গিয়ে ক্যান্টিনে খাওয়াত। রাজনীতির কাজে পরের দিকে এত বেশি জড়িয়ে পড়েছিল যে বাড়ি ফেরার ঠিকঠাক সময় ছিল না। একবার লাস্টট্রেন ধরতে পারেনি বলে বন্ধুর মেসে রাত কাটিয়েছিল। যথারীতি পরের দিন ক্লাসে আসতে মুক্তি বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। করিডোরে একান্তে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙাল, 'কাল বাড়ি যাওনি?'

'না।'

'কেন?'

নীলাঞ্জন কারণ বলল। মুক্তি মেনে নিতে পারল না।

'তুমি জানলে কেমন করে?' নীলাঞ্জন জিগ্যেস করল।

'তোমার ভাই খোঁজ নিতে এসেছিল।'

'কোথায় সে?'

'ক্লাসের দীপা তোমাকে আজ ক্যান্টিনে দেখেছে বলতে চলে গেছে।' কিছুক্ষণ মেঘ থম থম মুখ করে দাঁড়িয়ে থেকে মুক্তি ফের বলল, 'ছিঃ নীলাঞ্জন ছিঃ। বাড়িতে সকলে চিন্তায় থাকবে তা একবারটি ভাবলে না!'

'ভেবেও কোন উপায় ছিল না।'

'ছিল। অন্তত আজ ভোরের ফার্স্ট ট্রেন ধরে ফিরতে পারতে।'

'তাহলে প্রথমদিকের ক্লাস করা যেত না।'

'কেন যে এরকম ছেলেমানুষী খেলায় মেতে আছো বুঝতে পারছি না।'

'আমার জীবনটাই যে এরকম।'

'এটা খুব গর্বের কথা না। এখন থেকে এরকম আর চলবে না।'

মুক্তির বলার মধ্যে যথেষ্ট ঝাঁজ ছিল। ছিল দৃঢ় ব্যক্তিত্ব আর প্রচ্ছন্ন অভিভাবকত্ব। নীলাঞ্জন তাৎক্ষণিক কোন জবাব খুঁজে পেল না। মুক্তিকে টগবগিয়ে ক্লাসে ঢুকে যেতে দেখল।

ক্লাস শেষে মুক্তির কাছে এগিয়ে নীলাঞ্জন নিচু গলায় বলল, 'এখনও খাওয়া হয়নি। বড্ড খিদে পেয়েছে'।
ব্যস্। মুক্তির মুখ থেকে মেঘ উধাও। সব রাগ অভিমান বরফগলা জল হয়ে গেল।
'খাবে চল।'
পর্দাঢাকা কেবিনে পাশাপাশি বসে নীলাঞ্জনের কাঁধে মাথা রাখল মুক্তি। সতৃপ্ত নিঃশ্বাস উড়িয়ে জিগ্যেস কর, 'কি খাবে?'
'যা খেতে চাইব, খাওয়াবে?'
'কি'?
'সামান্যই। কিন্তু তুমি বোধহয় তা খাওয়াতে পারবে না।'
মুক্তি চোখে চোখ রেখে দুষ্টুমিষ্টি হাসল। তারপর প্রশ্রয়ের পাপড়ি মেলে ধরে বলল, 'তোমাকে অন্তত কোন কিছুই দিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু, নিতেতো হবে তোমাকেই।'
সেদিন থেকে পর্দাঢাকা কেবিনে চুমু খাওয়াখায়ি শুরু। তারপর দু'জনে ক্রমশ আরও কাছাকাছি এসে যাওয়া।
মুক্তি একদিন অতৃপ্তির আক্ষেপ শোনাল, 'বাতাসে পর্দা সরে যায়। কৌতূহলী ছোট বেয়ারাগুলি উঁকিঝুঁকি দেয়। এভাবে আর ভাল্লাগে না নীল। আমাদের বাড়িতে আসবে একদিন?'
'সেখানেও তো লোকজন থাকবে।'
'আমার পড়ার ঘরে কেউ আসে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'
'কি পরিচয় দেবে আমার?'
'ক্লাসের বন্ধু। তোমার সম্পর্কে অনেক ইন্ট্রোডাক্শান দেয়া আছে। সবাই তোমাকে পছন্দ করবে। ভাল রিসেপসন পাবে তুমি। কিন্তু একটা কন্ডিশান আছে।'
'সেটা কি?'
'তোমাকে সংযমী পুরুষ বলেই জেনেছি। তোমার ওপর যে শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে তা ভেঙে দেবে না যেন।'
'পেয়ে হারাতে চাই না মুক্তি। দেখে নিও, তোমার বিশ্বাসের অমর্যাদা হবে না।'
তারপর প্রায়ই মুক্তিদের বাড়িতে যেত নীলাঞ্জন। পড়াশুনোর আলোচনাতেই সময় কাটাত। নীলাঞ্জন একসময় আবিষ্কার করল, সে এখন নিয়মিত ক্লাস করছে, লাইব্রেরীতে যাচ্ছে। ঠিকঠাক সময়ে বাসায় ফিরছে। চুলে তেল পড়ছে। কমতি চা সিগারেট খাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন পোশাক পরছে। এরকম হাজারো পরিবর্তন এসে গেছে কবে থেকে।
সবকিছুর মূলে মুক্তি। মুক্তি যেন একটা বনের পাখিকে খাঁচায় বন্দী করে ফেলেছে। নীলাঞ্জন একান্তে ভাবত, মুক্তির প্রচেষ্টায় আন্তরিকতা থাকলেও উদার বিস্তৃতি কোথায়? এযে স্বার্থপরতার মোড়কে মোড়া ভালবাসা। অর্থাৎ কিনা, নিজের মতো করে পাওয়ার উদ্দেশে নীলাঞ্জনকে ওর নিজস্ব চলার পথ থেকে সরিয়ে আনার সুপরিকল্পিত দড়ি টানা ব্যাপার স্যাপার।
নীলাঞ্জন অসীমের তত্ত্ব শোনাত। মুক্তি সীমার গুরুত্ব বোঝাতে চাইত। নীলাঞ্জন ঘর ছাড়ার ফন্দি আঁটত তো মুক্তি সীমায় ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখাত। এই নিয়ে দু'জনের সম্পর্কটা কেমন যেন ঢিলাঢালা হয়ে পড়ছিল।
লিটল ম্যাগাজিন মানেই ঘাম রক্ত চোখের জলের মিশ্রণজাত প্রকাশনা। নীলঞ্জনের সম্পাদনা প্রকাশনায় বের হওয়া প্রথম সংখ্যাটি হাতে পেয়ে মুক্তির সেদিন বুক ভরা আনন্দ। পাখিদের

নিয়ে লেখা নীলাঞ্জনের গল্পটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল। বিষণ্ণ বিষাদে মন ছেয়ে গেল। বুক উজাড় করা মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস ছড়াল।
গল্পটার এক জায়গায় মুক্তির দৃষ্টি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
'জান সীমা, আমি যেন ক্রমশ খাঁচার পাখির মতো হয়ে পড়ছি।'
'তোমার নিস্তেজ বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ অপরাধী মনে হয় অসীম। খুলেই বল না কি চাও তুমি।'
'তোমার ভাবনা ভাবতে গিয়ে আমার ডানা দু'টো ভারী হয়ে যাচ্ছে। গতি হারিয়ে নিষ্প্রভ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। কত যে মূল্যবান সময় বিনা কাজে ভালবাসার অর্থহীন গল্পগুজবে কেটে যাচ্ছে।'
'আমি কিন্তু সমুদ্র চাইনি। একটি খেয়ালি নদীকেই ভালবাসতে চেয়েছি।'
'সেই খেয়ালি নদীটাও যে ভালবাসার বাঁধে থমকে দাঁড়িয়েছে।'
'নৈলে কি করতে তুমি?'
'হয়ত, দেখব এবার জগতটাকে বলে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়তাম। নয়তো কৃষক আন্দোলনে মদত যোগাতে গাঁয়ে চলে যেতাম।'
'এখন আর পারা যায় না?'
'বোধহয় না। আরও একজনের দায় দায়িত্বে জড়িয়ে গেছি যে। সংগ্রাম সংঘর্ষ প্রতিরোধে বন্দী অথবা মৃত্যু হলে ওর হাল কি হবে? এখনতো আর একা নয় যে নিরুদ্দেশে হারিয়ে যেতে নেই মানা।'
নীলাঞ্জনের লেখা গল্পটা পড়ে মুক্তির চোখে জল চিক চিক করে উঠেছিল। সারারাত ঘুমোতে পারেনি। পরের দিন হৃদপিন্ড ছেঁড়া যন্ত্রণা গোপন রেখে বলেছিল, 'তোমাকে মুক্তি দিলাম নীল। তুমি সার্থক হও।'
তারপর আর ইউনিভার্সিটিতে আসেনি মুক্তি। পরীক্ষাতেও বসেনি। তীব্র অভিমান তাড়িত হয়ে বাবা মা-র আনা পাত্রকে বিয়ে করতে আপত্তি করেনি। বন জঙ্গল নদী গ্রামে বদলির চাকরির ইঞ্জিনীয়ার অরিন্দম আচার্যের ঘর করতে অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছিল।

।। তিন ।।

অরিন্দম যথার্থ বলেছিলেন।
মুক্তি ওপরের ঘরে ঘন ঘন চা কফি পাঠিয়ে দেয়। কাছাকাছি দোকান না-থাকায় কার্টুনদরে সিগারেট আনিয়ে রেখেছেন অরিন্দম।
এ ক'দিনেই লেখা অনেকটা এগিয়েছে। বেশ কিছুটা পড়াশুনোও করেছে নীলাঞ্জন।
বাইরের রমণীয় প্রকৃতির স্কেচও এঁকেছে একখানা।
এই ঘরের পর্দা সরালে বহুদূরের পাহাড় জঙ্গল চরাচর আকাশ নজরে আসে। উড়ন্ত শঙ্খচিল শকুন বাজপাখি দেখা যায়। ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে চিলের চিৎকার কানে আসে। বাংলোর সামনে ফুল বাগিচা। প্রজাপতি ফড়িং মৌমাছিদের ওড়াউড়ি। কাঠবিড়ালি লাফায় জারুল গাছের ডালে। চড়ুই ছাতার পাখিদের নাচগানের আসর বসে। কখনও বা কিচির মিচির তর্কযুদ্ধ থেকে ঝগড়াঝাটি মারদাঙ্গা অব্দি গড়ায়। তারপর ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ তুলে একে একে পালিয়ে যায় সকলে।

শ্বেতবসনা সুন্দরী এক যুবতীকে প্রতিদিন ভোরের আলো গায়ে মেখে ফুল তুলতে দেখে নীলাঞ্জন। সূর্যের মতো ওর উজ্জ্বল চোখ। কচিৎ চার চোখের সঙ্গম হয়। ঝিলিক দেয়া পুঁটি মাছের মতো যুবতীটির দাঁত। অভ্রকুচির মতো হাসি ছড়ায়। দোল খেয়ে যায় হাতের ফুলের ডালা। মল পায়ে পাকা ধানের মতো রুমঝুম শব্দ তুলে সে চলে যায়।
নিজেকে সেই মুহূর্তের জন্য বসন্তের পত্রহীন বিষণ্ণরুক্ষ বৃক্ষ মনে হয় নীলাঞ্জনের।
যুবতীটিকে নানাভাবে দেখে। সে কখনও বা জোড়া শিরীষের ফাঁকে খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে ভাসা ভাসা উদাসী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। যেন চৈত্রের আকাশের মতো চাহনি। বৈশাখের মেঘের মতো মুখ। খাঁচা-বন্দী পাখি সে। যুবতীটি প্রতিদিন বেশি রাতে শুতে যায়। শরীরের আবরণ শিথিল করার দৃশ্য জানলার শার্সিতে ছায়ামূর্তি হয়ে ফুটে ওঠে। সে কি ইংগিত ইশারায় শুভরাত্রি জানায়? নীলাঞ্জন কৌতূহলী হয়ে ওঠে।
যুবতীটি একদিন শাওনীয়া বাতাসের মতো মুক্তির কাছে এল। মুক্তি পরিচয় করিয়ে দিল, 'মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ বাসুর মেয়ে মৃত্তিকা। আর ইনি লেখক শিল্পী নীলাঞ্জন নন্দী।
প্রথম পরিচয়েই দু'জনে অনেক কথা হল। মৃত্তিকাকে নীলাঞ্জনের খুব ভাল লাগল। নীলাঞ্জনকে মৃত্তিকারও নিশ্চয়ই পছন্দ। তা নাহলে তারপর থেকে নানা অজুহাতে রোজই অন্তত একবার কেন আসছে?
মুক্তির দিক থেকে বৈশাখি ঝড়ের আশঙ্কায় থাকে নীলাঞ্জন।
কোন পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ পরিচয় অল্প ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছালেই ওরা অনায়াসে দ্বিধাহীন প্রশ্ন করতে পারে, 'বিয়ে করেছেন? কেন করেননি?..... বিয়ের আগে কাউকে ভাল বেসেছেন কখনও?'
মৃত্তিকা আচমকা একদিন প্রায় এরকমই প্রশ্ন করে বসল।
ভালবাসা সবসময়ই সকলের কাছে আলোকিত নয়। অনেকক্ষেত্রেই গভীর অরণ্যে লুকানো মণিমুক্তার মতো। কেউবা সন্ধান পেয়ে তৃপ্ত পরিপূর্ণ অভিভূত। অনেকে আবার আজীবন খুঁজে ফেরে ক্ষ্যাপার মতো। সে বড় করুণ অতৃপ্ত শূন্যতা।
মৃত্তিকার প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না নীলাঞ্জন।
সাময়িক চুপচাপ থেকে বলল, 'না-পাওয়াতেই বোধহয় ভালবাসার সার্থকতা। পেয়ে গেলেই হারিয়ে যাওয়ার ভয়। সীমাবদ্ধ চারদেয়ালে শুধুই দ্বন্দ্ব সংঘাত। স্বার্থপরতায় ডানা ঝাপটায় বন্দী উদার হৃদয়। সংসার মানেই ত্যাগের বিনিময়ে কতটুকু কি পেলাম তার নিরন্তর হিসেব নিকেশ জটিলতা।'
মৃত্তিকা খুশি হল না, 'এতো কাব্য কথা হল! কিছুই মগজে ঢুকল না। আমার প্রশ্নের উত্তর কোথায় পেলাম?'
'চেষ্টা করে দেখ। উত্তর ঠিক খুঁজে পাবে।'
'অত বুদ্ধি কি আর ঘটে আছে? তারচেয়ে সোজাসুজিই বলুন, আপনি বিয়ে করেছেন?'
'তোমার কি মনে হয়?'
'মনেতো হচ্ছে অনেক কিছুই। এই যেমন, আপনি বোধহয় বিয়ে করেও সংসার-ত্যাগী। কিন্তু তাতো নয়।'
'তাহলে কি?'
'খুব সম্ভবত বিয়ে করেননি।'
'যদি সত্যিই তা হয়?'

'তার আগে বলুনতো, কেন বিয়ে করেননি? ভালবাসতেন কাউকে?'
'অহিংস প্রেমে 'ভালবাসতাম' বলে কিছু থাকে না। সবসময়ই 'ভালবাসি'। অবশ্য যদি ভালবাসার ব্যক্তি বা বস্তুটির গুণগত কোন অবনতি না ঘটে থাকে তবেই। অনেকেরই নানা কারণে হয়ত প্রেম ভালবাসার পরিণতিতে বিয়ে হয় না। তাই বলে 'ভালবাসতাম' হবে কেন?'
রক্তজমা মুখে চতুর চোখের পাখনা মেলে ধরে মৃত্তিকা বলল, 'এবার বুঝতে পেরেছি।'
কি যে বুঝল কে জানে! ঘুঙুর পরা ঝর্ণার মতো শব্দ তুলে হাসল। তারপর চকিত চপল হরিণীর মতো চরণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
ভাগ্যিস এই সময়টুকুতে মুক্তি উপস্থিত ছিল না। প্রয়োজনে ভেতরঘরে গিয়েছিল।
নীলাঞ্জন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

আজ চকচকে থালার মতো চাঁদ উঠেছে। নিষ্পাপ নির্মেঘ আকাশ জুড়ে শিউলির মতো অজস্র তারা যেন জামদানী ঢাকাই শাড়ি। জ্যোৎস্না ভেজা বন পাহাড় প্রকৃতি। তরল রুপোর মতো এক নদী চিক চিক জল। সজনে তেঁতুল কৃষ্ণচূড়ার চিরুনীপাতার আলোছায়ায় নকশা কাটা জাফরি। চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিনঝিনানি। রাতপাখির ছন্দযতি। পেঁচার পরোয়ানা। জোনাকি জ্বলছে পিট পিট। সবকিছু মিলিয়ে চাঁদের আলোয় রাতের প্রকৃতি মোহময়ী। নারীচরিত্রের মত দুর্বোধ্য রহস্যময়ী।
নীলাঞ্জন বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে আধশোয়া বসে আছে।
অতীতের রঙীন স্মৃতির দিনগুলিতে মুক্তি একদিন ওর স্বপ্নের অভিলাষ জানিয়েছিল। স্বপ্নের জায়গাটা ছিল, নদীতীর হ্রদের সন্নিকট অথবা গহীন কোন ঝিলের আশপাশ।
নিকটেই গাছের নিচে শালখুঁটিতে মাচার মতো উঁচুতে ছোট্ট চালাঘর। বাঁশ-বাখাড়ির মেঝেতে বিছানো খড়। তার ওপর তালপাতার চাটাই পাতা। নির্জনতায় পিঁপড়ের বাসার মতো সেই ছোট্ট নীড়ে নগ্ন প্রকৃতির মতো দু'টি মানুষ মানুষী। স্বর্ণলতা কিংবা সাপ-শঙ্খের মতো একাত্ম দু'টি শরীর। খইছড়ানো আকাশের চাঁদ ধোয়া দুধে স্নান করবে ওরা। জল ছোঁয়া বরফ হাওয়া এসে বাতাস করে যাবে। সারারাত গান শোনাবে রাতপাখি আর ঝর্ণা।
বিপুল বিস্ময়ে নীলাঞ্জন প্রশ্ন করেছিল, 'শুধুই শুয়ে থাকা?'
'হ্যাঁ।' মুক্তি কল্পনায় ডুব দিয়ে বলল, 'শুয়ে থেকে শুধু উপলব্ধি আর অনুভব। কল্পনার স্বর্গসৌন্দর্যে ভেসে বেড়াব।'
'অসম্ভব। তা কী হয় কখনও।'
'হয় না কেন?' মুক্তি ভুরু কোঁচকালো।
'শৈত্য শরীর ঘর্ষণে তপ্ত হবেই। গাছে গাছে ঘর্ষণে দাবানল জ্বলে। আমরা কী গাছেদের চেয়েও শীতল?'
'তাই বলে কী জ্বলে পুড়ে ফুরিয়ে যেতে চাও তুমি?'
'বসন্তে অশোক পলাশ শিমূল কি জ্বলে না? সুরভিত আগুনে জ্বলেও আনন্দ। আমি আগুনের উষ্ণ স্পর্শ পেতে চাই।'
'ভুল ভাবনা তোমার। বড় বেশি করে পেয়ে গেলে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ভালবাসা স্থায়ী হয় না নীল।'

'দেহমন নিয়েইতো ভালবাসা। ভালবাসা আর প্রেম এক নয়। আমরা ঈশ্বর ঈশ্বরী নয় বলেই শরীর মনকে উপেক্ষা করে পূজার্চনায় দিন কাটাতে পারব না মুক্তি।'
তন্দ্রালু নীলাঞ্জন ভাবছে, তখন বলেছিলাম বটে। কিন্তু, এখন এই যে অফিসের কাজে অরিন্দম দিল্লী গেছেন তবুতো ঠিকঠাক আছি। অরিন্দম থাকলেই বা কী? সে যে কথায় আছে, গাইবাছুরে বোঝাপড়া থাকলে বনে গিয়েও দুধ দেয়ানেয়া করে।
আসলে আজকাল আর এসব অনুভূতির পোকাগুলি খুব একটা নড়াচড়া করে না। সুড়সুড়ি দেয় না। নীলাঞ্জনের চোখে প্রকৃতিই এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণী। এই রমণীটি ঋতুময়ী গর্ভিনী। কখনও যৌবনবতী কুমারী। কখনও নগ্না। বিগতা যৌবনার মত রুক্ষ মেজাজী। আবার ঋতুভেদে নানা বর্ণালী পোশাক সুগন্ধী বনোজ প্রসাধনে রূপরস গন্ধেভরা অপরূপা প্রিয়তমা। প্রিয়তমা প্রকৃতির সঙ্গে নীলাঞ্জন যেসময় একাত্ম হয়ে যায়, গৃহিনী সানন্দা আর প্রেয়সী মুক্তি তখন উপেক্ষিতা মাত্র।
অরিন্দম অফিসের কাজে দিল্লি গেছেন ক'দিন হল। মুক্তি ওর নিঃসঙ্গ শূন্যভূমিতে ঋতুবৈচিত্র্যে ভরিয়ে তুলতে তৎপর। প্রতিদিন নানা সাজে নানাভাবে নীলাঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক মূহূর্তের জন্য নিজের মতো করে কাছে না পেলেও হাল ছাড়ছে না।
মুক্তি কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে নীলাঞ্জন খেয়াল করেনি। অথচ, এমন একটা সময় ছিল যখন ওর শরীর থেকে ছুটে আসা সুরভিত গন্ধটা দারুণ পরিচিত ছিল। বন্ধ-কপাট চোখে বুক ভরা বাতাসের ঘ্রাণে নিশ্চিত ধরতে পারত মুক্তির শ্বাস প্রশ্বাস।
নীলাঞ্জন নানা কল্পকথার ফুল দিয়ে মুক্তিকে সাজাত। বলত, 'তুমি আমার চিত্ত জাগরণের উৎসভূমি। জাগতিক আনন্দযজ্ঞের আহ্বায়িকা। মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানোর সঙ্গিনী। তুমি আমার সত্যিকার মুক্তি। তোমার নীলাঞ্জন চোখে অথবা চুলের অরণ্যে হারিয়ে যাওয়ার হাতছানি। নারীতো পুরুষকে উজ্জীবিত করে, বাঁচতে শেখায়। তুমি আমার বেঁচে থাকার অর্থ। মুক্তির পরম আনন্দ।'
আরও কত কী যে কাব্যময় সংলাপ!
আর এখন বলতে ইচ্ছে হয়, 'তুমি আমার কাছে সবুজ ঘাসের শয্যা। ঢলকলমি অথবা নিস্তরঙ্গ নদীর ওপর কোন শালতি নৌকা যেন।'
হঠাৎ মুক্তির দিকে নজর পড়তে নীলাঞ্জন বলল, 'কখন এসেছ বুঝতেই পারিনি।'
আন্তরিক দু'হাত ধরে কাছে বসাল, 'ডাকনি কেন?'
'তাতে হয়ত তোমার কল্পনায় বাধা পড়ত।'
'ধ্যেৎ। তুমিই তো আমার কল্পনা প্রেরণা মুক্তি আনন্দ ভালবাসা—সবকিছু।'
'তাই বুঝি?'
'তাইতো যখন যেখান থেকে ডাক, ছুটে চলে আসি। আমি যে তোমার নীল পাখি।'
'এককালে বলতাম বটে, অচিন নীল পাখির পালক আমার চাই-ই-ই। পালক চেয়ে চেয়ে নীল পাখিটাই প্রায় পেয়ে গিয়েছিলাম।'
মুক্তি সাগরমুখি উদাসী দীর্ঘশ্বাস ছড়াল।
'আর এখন?' নীলাঞ্জন বিষণ্ণ প্রশ্ন করল।
'এখন দূর প্রবাস থেকে যেভাবে যতটুকু পারি প্রেরণা দিতে চেষ্টা করি মাত্র। এখনতো

সংসারকে বঞ্চনা করছ। নারীর প্রেরণাও পাচ্ছ। এবার আমি দেখতে চাই, কতবড় মহৎ সৃষ্টিকার তুমি হতে পার।'

মুক্তির গলা থেকে শ্লেষ অভিমান আঘাত ঠিকরে পড়লেও নীলাঞ্জন গায়ে মাখল না। সহজভাবে নিল, 'প্রেরণা কী শুধু উপদেশ আর শাসনেই? আদর ভালবাসাও তো মিশিয়ে দিতে হয়।'

'শাসন যদি মেনে নেয়া না যায়তো আদর পাওয়ার অধিকারও হারাতে হয়। তাছাড়া, দূর থেকে কতটুকু কি আর সম্ভব। কোন বিষণ্ণ বিকেলের সূর্যের সঙ্গে এলেতো হঠাৎ একদিন সোনারোদ্দুর ডানায় মেখে ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে যাবে। কতটুকু পাই?'

'এবার নিয়ে এই যে কতবার দেখা হল, কিছুই কি পাওনি?'

'হয়ত পাই। কিন্তু, তুমি চলে যাওয়ার পর জমাট অন্ধকারের পাথর এসে বুকে বসে। তখন, সূর্যোদয়ের নীল পাখিটাকে আবার কবে দেখব বলে প্রতীক্ষায় থাকার মধ্যে যে কী নিষ্ঠুর কষ্ট হয় তা তুমি বুঝবে না নীল।'

বোবা মেয়ের চোখের ভেতরকার যন্ত্রণায় মুক্তি তলিয়ে গেল।

ইউক্যালিপটাস শিরীষ নিমগাছের ডালপাতায় সোঁ সোঁ শব্দ ভাসছে। কালো বোরখার মেঘে আকাশের চাঁদ ঢাকা পড়ল। আবার কিশোরী বধূর মতো ঘোমটার ফাঁকে লাজুক উঁকি দিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মুক্তির চুলগুলি এলোমেলো উড়ছে।

'মুক্তি।'

'উঃ।'

'নীল পাখিটা বড় বেশি পাল্টে গেছে তাই না?'

'বুঝি না।'

'আগেকার সেই শিমূল তুলোর মতো উড়তে উড়তে সজনে ডালে এসে বসি না। দোল খাওয়া পাখিটার মতো ডাকি না—তাই না?'

'জানি না।'

'হারিয়ে যাবে মুক্তি?'

'কোথায়?'

'বনজ্যোৎস্নায়।'

'তারপর?'

'কিশোর কিশোরীর মতো হাত ধরাধরি করে নদীতীরে মিহিমসৃণ উপত্যকায় ছুটে বেড়াব। জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটব। ক্লান্তি এলে ছাতিম গাছের তলায় শিশির ভেজা ঘাসের গালিচায় গড়াগড়ি যাব। শুয়ে থাকব। তুমি বুকে মাথা রাখবে। বনজ্যোৎস্নায় ভিজে সারারাত নদী উপত্যকা তীরভূমি আকাশ দেখব। টুপ টুপ শিশির ঝরবে। ফুর ফুরে হাওয়ায় গাছের পাতায় শব্দ উঠবে শির শির। রাত পাখি ডাকবে। তির তির ফল্গুধারার ঝর্ণার কুল্‌লু কুল্‌লু শব্দ শুনব।'

'তেমন শব্দতো আমার বুকের ভেতর নিরন্তর বয়ে যায়। বড় ক্লান্ত লাগে নীল।'

'তাই!'

'বিশ্বাস না হলে কান পেতে দেখ।'

নীলাঞ্জনের বুকের উঠোন জুড়ে কয়েক লক্ষ মৌমাছি গুনগুন করে উঠল। রঙীন প্রজাপতি ফড়িং উড়ে গেল পত্ পত্ ফর্ ফর্। মহুয়া ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। মাতোয়ারা নীলাঞ্জন মুক্তির বুকের টিলা গিরি উপত্যকায় মুখ রাখল।

আহ্, কী যে শান্তি। কী মিষ্টি গন্ধ। কীসের যেন শব্দকথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে! সেকি তলিয়ে যাওয়ার আহ্বান, নাকি নীল যমুনার জলে অবগাহন স্নানের আমন্ত্রণ? নীলাঞ্জন ঠিকঠাক কিছু বুঝে উঠতে পারল না।

পরদিন বিকেল পর্যন্ত ধারে কাছে এল না মুক্তি।
আষাঢ়ে উদ্বেগের মেঘভয় নীলাঞ্জনের মনকে ক্রমশ গ্রাস করে ফেলছে। ভাবছে, নিজে কী নির্মম নির্দয় নির্বোধ? অতটা অনাগ্রহ অনীহা উদাসীনতা উচিত ছিল কী? শরীরের প্রার্থিত পার্থিব প্রত্যাশার প্রতি অবজ্ঞায় নারীরা অনেক সময় ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে। তখন আচার আচরণে আরণ্যক সরীসৃপ বেরিয়ে পড়ে। অথচ, মুক্তিতো তেমন কিছু আচরণ করেনি! তাহলে?
ভয়মন্থনজাত ভালবাসা আগ্রহে মুক্তির আগমন প্রতীক্ষায় নীলাঞ্জন। যথাসময়ে ওপরের ঘরে বিকেলের চা এল। মুক্তি সম্পর্কে নীলাঞ্জন কোন প্রশ্ন করল না।
শালবন পাহাড় ডিঙিয়ে শকুনের ডানায় দিনের শেষ আলো চলে গেল। ধুম্রনীল পাহাড় অরণ্যের প্রকৃতি বর্ণ বদলে যেতে লাগল। আরও অনেক পরে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কুটিরে খই ছড়ানো আলো জ্বলে উঠল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার পাহাড়ের গায় আলোগুলিকে জড়ি বসানো শাড়ির মতো মনে হচ্ছে এখন।
নীলাঞ্জনের তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। চোখ খুলে তাকাতেই চমকে উঠল। বোবা বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ বিবশ তাকিয়ে রইল।
এ কী সর্বনেশে কান্ড! মৃত্তিকা কখন যে অন্ধকারে চুপিসারে এসে দাঁড়িয়েছে কে জানে। মুক্তি যদি জানতে পারে?
মৃত্তিকা আলো জ্বালল। তারপর আকর্ষণীয় পাছায় ঢেউ তুলে জানলার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। চোখের ভাষা দুর্বোধ্য।
'তুমি?' নীলাঞ্জন নিচু গলায় জিগ্যেস করল।
'আসতে নেই বুঝি।' দুষ্টুমিষ্টি খিল খিল হেসে উঠল মৃত্তিকা।
'তাতো বলিনি।' নীলাঞ্জন সপ্রতিভ হয়ে উঠল, 'তুমি যে এখানে—মুক্তি কী জানে?'
'বৌদির খোঁজেইতো এলাম। নিচে দেখতে না পেয়ে ভাবলাম, এখানে আছে।'
'ওঃ।'
নীলাঞ্জনের ঔদাসীন্যে মৃত্তিকা বলল, 'আপনি ভীষণ অভব্যতো।'
'তেমন কি করলাম?'
'বসতে বলছেন নাতো।'
দৃষ্টি ঘুরিয়ে নীলাঞ্জন দেখল, দরজাটা আগের মতোই ভেজানো। বন্ধ ঘরে দু'জনকে আবিষ্কার করতে পারলে মুক্তি কী সহজভাবে নিতে পারবে? তাই বলে সত্যিইতো আর অভব্য হওয়া যায় না। ভয়ে কুঁকড়ে থেকেও বলল, 'বস। না বললে বসতে নেই বুঝি। তুমি কি অতিথি?'
মৃত্তিকা সপ্রতিভ সহজ সরল মনেই টুল টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসল।
নীলাঞ্জন এই প্রথম দ্বিধাহীন চোখে মৃত্তিকাকে নিষ্পলক জরীপ করল। ছিমছাম চেহারা গড়ন। সাধারণ নাক মুখ চোখ। ফুটন্ত পাপড়ি ঠোঁটের একটিতে ছোট্ট তিল স্পষ্ট। এই চিহ্ন কামাতুরা নারীদের থাকে। এছাড়াও পুংশ্চালী রমণীদের সার্বিক লক্ষণগুলিই প্রকট দৃশ্যমান। সুমুখে শীতল বনবীথির মোহিনী মায়া ছড়িয়ে মৃত্তিকা বসে আছে। পায়ের ওপর পা রেখে

উৎসস্থল সংযুক্ত করে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। ঠোঁটের পাতায় পাখিমারা শিকারীর ফাঁদপাতা আড়কাঠি।
শ্মশান নিস্তব্ধতার অস্বস্তি ভাঙতে মৃত্তিকা মুখ খুলল, 'আপনি বিবাহিত কিনা তা কিন্তু সেদিন বলেননি।'
অন্যমনস্ক নীলাঞ্জন নরম হাসল। সহজ হবার চেষ্টা করল, 'যদি বলি, না?'
'তাহলে মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ গভীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গল্প লেখেন কেমন করে?'
'আর যদি বলি, আমি বিবাহিত?'
'তাহলেও প্রশ্ন, একটি নারীর মধ্যে নানা বৈচিত্র্যময় ভিন্নপ্রকৃতির চরিত্রগুলির সুলুক সন্ধান পান কেমন করে? একাধিক নারীর সংস্পর্শে এলে তবেই তো সম্ভব।'
'যারা কলমের আঁচড়ে চরিত্র গড়েন তাদের সম্পর্কে তোমার ধারণা তাহলে এরকমই?'
'ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কেমন যেন ধন্দ লাগে।'
'তোমার সম্পর্কেও আমার ধন্দ বাড়ছে।'
'কিসের ধন্দ?'
নীলাঞ্জন উত্তর এড়িয়ে গিয়ে সত্যিই অভব্য হয়ে উঠল, 'বদনামের ভয়েই বলছি, দোষ নিও না। আমার মনে হয়, এখন তোমার ঘরে ফেরা উচিত।'
মৃত্তিকা আরক্ত হল না। টান হয়ে বসল। রোখা মেজাজে বলল, 'না, যাব না। আমার অতশত বদনামের ভয় হয় না।'
'আমার কিন্তু ভয় ভীতি আছে।'
'আপনি ভীতু কাপুরুষ।' মৃত্তিকা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।
'দাঁড়াও।' নীলাঞ্জন তর্জনী তুলে দৃঢ়তা দেখাল, 'তোমাকে কিছুই যে বুঝতে পারিনি তা বোধহয় সত্যি নয়।'
'কতটুকু কি বুঝেছেন শুনি।' মৃত্তিকা যথেষ্ট কৌতূহলী চোখ মেলে তাকাল।
'অনুমান, প্রত্যাশিত বিয়ে হচ্ছে না বলে তুমি অতৃপ্ত অসুখী। খাঁচায় বন্দিনী পাখির পরাধীনতার কষ্ট বুকে নিয়ে বিদ্রোহিনী হয়ে উঠতে চাইছ। কিন্তু আমার ওপর অহেতুক রাগ ক্ষোভ কেন?'
'না না আপনার ওপর রাগ করতে যাব কেন?' মৃত্তিকা রোদতাপে ঢলে পড়া লতার মতো ফের বসে পড়ল। আনত হয়ে নিস্তেজ গলায় বলল, 'বিয়ের আগে আমি কিন্তু হুটহাট মাথা গরম করে ফেলতাম না। আপনার অনুমান হয়ত কিছুটা সত্যি। বিয়ের মাত্র পাঁচ মাস পরে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছি আমি। সেই থেকে এখানেই আছি।'
আচমকা নীলাঞ্জনের হাঁটুর ওপর মৃত্তিকা ঝুঁকে পড়ল। পা ছুঁয়ে অনুরোধ জানাল, 'আমাকে ক্ষমা করুন।'
বর্ষার নদীর ম তো মৃত্তিকার চোখে বানভাসি। কান্না মেয়েদের সবচেয়ে বড় শক্তি। মহাশক্তিমান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সংযমী অথবা হৃদয়হীন পুরুষেরাও কান্না দেখে দুর্বল হয়ে পড়ে।
নীলাঞ্জনের ভেতরকার বরফ গলছিল।
পাহাড়ি নদীতে ঢল নামলে সে বড় ভয়ঙ্কর হতে পারে। নীলাঞ্জন তার আগেই মৃত্তিকার মাথায় স্নেহের হাত রাখল, 'দেহের সুপ্ত ঘুম ভাঙলে বিপদের ভয় থাকে। মনের ক্ষুধা মিটলে পরম তৃপ্তি আর শান্তি। প্রেয় আর শ্রেয় কোনটা কাম্য তোমার?'

মৃত্তিকা কোন জবাব খুঁজে পেল না। বর্ষা ভেজা কচি পাতার মতো থর থর কাঁপছে। নাক টানছে কান্না-ক্লান্ত শিশুর মতো। অল্প পরে ভীরু বুকে অস্ফুট বলল, 'যদি নিজেকে সমর্পণ নিবেদন করি তাহলেও নির্দয়ভাবে ফিরিয়ে দেবেন?'
'তা কেমন করে সম্ভব!'
'অসহায়া নারীকে গ্রহণ স্বীকৃতি দানইতো পুরুষের ধর্ম হওয়া উচিত। শরণাগতাকে আশ্রয় দান করাতেও আপনার আপত্তি?'
'আমি যে বিবাহিত। স্ত্রী সন্তান আছে।'
'তাতে কী ভালবাসা দিতে বাধে? আমি যে ভালবাসার কাঙাল। শুধু ভালবাসা টুকুই চাইছি। পারবেন না দিতে?'
'ভালবাসা হল অন্তহীন আকাশের মতো। সেই আকাশ কখনও উড়ে পার হওয়া যায় না। প্রেম ভালবাসা আকস্মিক এবং অপ্রতিরোধ্য। নিয়মের বাইরে অস্বাভাবিকতায় অন্তঃসলিলা। তোমাকে ভালবেসে ফেললাম মৃত্তিকা।'
'সত্যি!' মৃত্তিকার ঠোঁটে মেঘজল ঝড়ের পর ঝিলিক দেয়া রোদ্দুর-হাসি ফুটে উঠল, 'আমাকে ভালবেসে আপনাকে পাপের ভাগী হতে হবে নাতো?'
'পাগলি মেয়ে।' নীলাঞ্জন কৃতাঞ্জলিপুটে মৃত্তিকার চিবুক ধরে স্নিগ্ধ হাসল, 'কিসের পাপ? যা সত্য তাই পবিত্র। প্রেম ভালবাসার ওপর কারও হাত নেই। সে নিয়মনীতি শাসনকে পরোয়া করে না। জ্বলে জ্বালে আবার নিভেও যায়।'
মৃত্তিকা কতটা কি বুঝল কে জানে। বর্ষায় পরিপূর্ণ উপোসী বুক। ভেজা পাতার মতো ঠোঁট। ঝিলমিল চোখ। কাপড়ের আঁচল ঘুরিয়ে এনে বুকের ওপর ঝুলিয়ে নীলাঞ্জনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

মৃত্তিকা চলে যাওয়ার পরেই বুড়ো পরিচারক বুধুয়া এসেছিল। টেবিলে চা জলখাবার রেখে গেছে। নীলাঞ্জন চা টুকুই খেল। জলখাবারে হাত দিল না।
আজ আর লেখার টেবিলে বসল না নীলাঞ্জন। অশান্ত পায়চারী করল কিছুক্ষণ। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ওড়াল অনেকটা সময়। তারপর হঠাৎ দরজার অর্গল বন্ধ করে আলো নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।
এখন শব্দহীন অন্ধকারে জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনকে চিতার আগুনের মতো লাগছে কী? চিতা কী শুধু আগুনেই? নীলাঞ্জন বুক উজাড় করা মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস ওড়াল। বুকের ভেতর চিতার আগুন জ্বেলেছিল মুক্তি। সেই যখন ডাকযোগে হলুদ কার্ড হাতে এসেছিল তখন। নিমন্ত্রণ পত্রের ভেতর শাদা কাগজে দু'কলম লেখা ছিল, নীল পাখিটা এবার থেকে বন্ধন মুক্ত। তুমি যথার্থ বড় হও। তোমার স্বপ্ন সার্থক হোক। বিয়ের দিন একবারটি চোখে দেখতে পেলে খুশি হব।'
হৃৎপিন্ড ক্ষত করা মুক্তির সেই আনন্দ উৎসবে যাওয়ার মতো বুকের জোর ছিল না নীলাঞ্জনের। যায়নি। দু'দিন পরেই ঘটেছিল মাথার ওপর থেকে ছাদ সরে যাওয়া দুর্ঘটনা। অসময়ে জীবন থেকে অবসর নিয়ে বাবা চোখের আড়ালে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে কানের কাছে দীক্ষামন্ত্র শুনিয়েছিলেন, 'বেঁচে থাক। সংগ্রামী হও। দেখলে তো সারা জীবন কেমন সংগ্রাম করে গেলাম।'

একই দীক্ষামন্ত্র শুনে বাবা তাঁর বাবার কাছ থেকে একগন্ডা ভাইবোনের দায় দায়িত্বের বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ট্রাডিশান বজায় রেখে নীলাঞ্জনও বেকার ভাই সোমত্ত দু'বোন আর গর্ভধারিণীর দায়িত্ব নেয়ার শপথ বাক্য পাঠ করেছিল। শুনে বাবা পরম নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করেছিলেন।

সেই থেকে নীলাঞ্জনের সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি জনসংগ্রামের ইতি। পরিবর্তে গৃহমুখী সংগ্রামের যাত্রা শুরু। কর্ম কর্তব্য দায় দায়িত্বে গাঁথা জীবনটা হয়ে গেল ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা। সকাল সন্ধ্যা-রাতে ট্যুইশানি, দিনে সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ বৃত্তিতে ক্লান্তিহীন পাখিদের গতিতত্ত্ব। অবসর পেলেই বুকের ভেতর শূন্যতার হাহাকার। ধিকি ধিকি চিতার আগুনে তিলে তিলে ক্ষয়।

ডবল ডেকার বাসের ওপর তলায় জানলার ধারে বিশেষ একটা সীট মুক্তির পছন্দ ছিল। ফাঁকা পেলে সেই সীটটাতে বসত। তারপর ফুটন্ত ফুলের মতো মুখটা জানলা থেকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ত। নিচ থেকে ওপর দিকে তাকিয়ে থাকত নীলাঞ্জন। যেন ফ্রেমে আঁটা হাফবাস একখানা সুন্দর মুখের ফটো দেখতে পেত। মুক্তির বিয়ের দীর্ঘ কয়েকবছর পর পর্যন্ত পথ চলতে বিশেষ সেই সীটটার দিকে হঠাৎই নীলাঞ্জনের অবুঝ সন্ধানী চোখ চলে যেত। নিরাশ হতাশ মন বলত, ওই জানলা থেকে যে মুখটা হারিয়ে গেছে তাকে আর কোন দিন ফিরে পাওয়া যাবে না।

।। চার ।।

মুক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। পরিবর্তিত পরিবেশ জীবন থেকে খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল পাক্কা সতেরো বছর পর। অজ্ঞাতবাস থেকে ধরা দিয়েছিল মুক্তি নিজেকে।

প্রতিদিন ঘরে ফিরে নীলাঞ্জনের প্রথম জিজ্ঞাস্য, 'কোন চিঠি আছে?'

সেই যখন সভা সমিতিতে যুক্ত ছিল, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করত অভ্যেসটা তখন থেকে। এখন চিঠি দেয়ার মধ্যে বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত ভাই আর বর্ধমান ধানবাদে থাকা বোন ভগ্নিপতিরা। কখনও সখনও শ্বশুর কুলের দু'একজন। তবু ঘরে ঢুকেই চিঠির খবর জানতে চাইলে বিরক্ত সানন্দা প্রথম দিকে জবাব দিত, 'রোজ রোজ কে এত তোমাকে চিঠি পাঠাবে!' পরবর্তীকালে ছোট্ট 'না' জবাবে ক্ষান্ত থাকে। অনেক সময় কোন উত্তরই দেয় না। নীলাঞ্জন বুঝে নেয়, নেই।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে সানন্দার হাতে কোন কাজ থাকে না। টি ভি দেখে। নয়ত বই ম্যাগাজিন জার্নাল পড়ে। ডিভানে আধশোয়া অবস্থায় জার্নাল পড়ছে সানন্দা।

নীলাঞ্জন ঘরে ফিরে যথারীতি জিগ্যেস করল, 'কোন চিঠি আছে?'

জার্নাল থেকে মুখ না তুলে সানন্দা বলল, 'টেবিলের ওপর রাখা আছে দেখগে।'

চিঠি থাকলেও নীলাঞ্জন সাধারণত আগে পোশাক পাল্টায়। হাতমুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে সোফায় বসে। তারপর জলখাবার চা খেতে খেতে চিঠি পড়ে। আজ সানন্দার উন্নাসিক জবাব শুনে অবাক হল। পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে জিগ্যেস করল, 'কে লিখেছে?'

সানন্দা মুখ না-তুলে নিরাসক্ত জবাব দিল, 'তোমার কোনও এক বান্ধবী। ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়তে।'

নীলাঞ্জনের চোখের সামনে ঘরময় যেন এক ঝিলিক আকাশ-বিদ্যুৎ চমকাল। টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেয়া ইনল্যান্ড লেটারে প্রেরকের নাম নেই। নীলাঞ্জনের নাম ঠিকানায় হাতের লেখাটা চেনা চেনা লাগল। কার চিঠি হতে পারে?
প্রবল ইচ্ছে হলেও নীলাঞ্জন এখনই পড়ল না। আগে পরিচ্ছন্ন হয়ে সোফায় বসে চিঠিটা হাতে নিল।
চিঠির ভেতর কি লেখা আছে তা না জেনে সানন্দা স্থির থাকতে পারে না। নীলাঞ্জনের অনুপস্থিতিতে খাম ইনল্যাণ্ড খুলে পড়া ওর অভ্যেস। স্বামীর চিঠি পড়ার অধিকারতো স্ত্রীর থাকতেই পারে। সেজন্য নীলাঞ্জন কিছু মনে করে না। আজকের চিঠিটাও সানন্দা কৌতূহলী অভ্যাসে খুলে পড়েছে। নীলাঞ্জন খোলা ইনল্যান্ডখানা মেলে ধরে প্রথমেই প্রেরকের নাম পড়ল, 'ইতি—মুক্তি।'
মুক্তির চিঠি এতকাল পরে! অবাক হল। গোটা চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল। তারপর বিশেষ ক'টি লাইন বারবার পড়ল।
'কোথায় আছ, কেমন আছ, কি করছ? জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে। দীর্ঘকাল আগেকার পুরনো ডায়রীর পাতায় তোমার হাতে লেখা ঠিকানাতেই চিঠি দিলাম। পাবে কিনা জানিনা। পেলে ফোন করো। অথবা, চলে এসো। সস্ত্রীক এলে বেশি খুশি হব। সামান্য কিছুদিনের জন্য এখানে এসেছি। ওঁর জরুরি কাজ চুকে গেলেই আবার চলে যাব। মন চাইলে তাড়াতাড়িই এসো।'
ঠিকানা ফোন নম্বর জানিয়েছে মুক্তি। যাওয়ার পথ নির্দেশ দিয়েছে। ব্রাকেটে আন্ডার লাইন করে লেখা, 'নদীর ধারে মোদীদের বাংলো বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে।'
সানন্দা চা জলখাবার নিয়ে এসে পাশে বসল। আজ নিজেও এককাপ চা নিয়েছে। ওর কৌতূহল কতক্ষণ চাপা থাকে যাচাই করতে নীলাঞ্জন চিঠি সম্পর্কে কিছু বলল না। একটু পরেই সানন্দা উশখুশ করে উঠল। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'হঠাৎ এত বছর পর তোমাকে মনে পড়ার কারণ?'
মনে মনে হাসলেও নীলাঞ্জন ব্যক্তিত্ব গাম্ভীর্যে বলল, 'সেটাইতো ভাবাচ্ছে।'
'তোমার ঠিকানা পেল কোত্থেকে?'
'খেয়াল করনি বোধহয়, চিঠিটা রি-ডাইরেক্ট হয়ে এসেছে। ভেতরেতো স্পষ্ট লেখা আছে, আগেকার ডায়রীর পাতায় আমার লেখা ঠিকানায় চিঠি লিখেছে।'
'এরকম আর কতজনের ডায়রীর পাতায় ঠিকানা লিখে দেয়া আছে?'
'অনেক। মুক্তিতো মফস্বলে আমাদের ঠিকানাতেও গিয়েছিল।'
'কেন?'
'সেবার নিজের হাতে গড়া সরস্বতী প্রতিমা দেখতে ক্লাসের অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছিলাম। একা মুক্তিই গিয়েছিল। শুধু যাওয়া নয়, সকলের সঙ্গে সহজেই মিলেমিশে গিয়ে সবার মন কেড়ে নিয়েছিল।'
'সকলে যখন এতই পছন্দ করেছিলেন, বিয়ে করলেই পারতে।'
'পারতামতো বটেই। তবু করলাম না। অথবা হয়ত হল না।'
'কেন?'
'তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়া লেখা ছিল বলে।'
সানন্দা প্রাণখুলে হেসে উঠল। মুক্তি প্রসঙ্গে ফের আর কোন উৎসাহ দেখাল না।

চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই নীলাঞ্জনের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি মারছিল। মুক্তির স্বামীটি কেমন কে জানে। মুক্তি কী কোন বিপদে পড়ে চিঠি লিখেছে? খবরের কাগজে আজকাল আকছার বধু নির্যাতন আর খুনের খবর থাকছে। অনেকেরই বিবাহিত জীবনে আজকাল নানা জটিলতা। বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

একরাশ ভাবনা চিন্তার কাটাকুটি খেলতে খেলতে নীলাঞ্জন একদিন মুক্তির দেয়া ঠিকানায় পৌঁছাল। বাংলোটা নদীর ধার ঘেঁষা জমির ওপর। দূরগামী চওড়া সড়ক থেকে চায়ের জমির ভেতর দিয়ে মসৃণ পাকা রাস্তা গেছে বাংলোর দিকে। দু'ধারে নারকেল গাছের সারি। সময় এখন বাসন্তী বিকেল। অস্তগামী সূর্যের আলোয় দূর থেকে বাংলোটাকে উজ্জ্বল গোলাপী দেখাচ্ছে। বাংলোটা সরু কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা। নুড়ি বিছানো পথ। সবুজ গালিচার মতো লন। বর্ণালী ফুলের কেয়ারী। আছে সুইমিং পুল দোলনা টেনিস কোর্ট। অজস্র গাছপালা। পাখিদের কিচির মিচির। নিরিবিলি নিস্তব্ধতার আঁচল বিছানো পরিবেশ।

নীলাঞ্জন ডোর বেল টিপতে ডিং ডং শব্দ হল। কিছুক্ষণ পর পর্দার আড়াল থেকে নারী কণ্ঠ শোনা গেল, 'কাকে চাইছেন?'

'ইঞ্জিনিয়ার আচার্য সাহেব এসে এখানে উঠেছিলেন। উনি এখনও আছেন কী?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখনতো নেই। আপনি?'

'ওঁর স্ত্রী থাকেনতো বলুন, নীলাঞ্জন নন্দী।'

পর্দার আড়াল থেকে মুক্তি তীরবেগে সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে আগোছালো কাপড়ে মালিন্য। ধূসর চোখে উদ্ভ্রান্ত চাহনি। তবে কী মুক্তি নির্জনে নিঃসঙ্গ বন্দিনী?

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে নীলাঞ্জন বলল, 'এ কি চেহারা করেছ তুমি?'

'প্রশ্নতো আমারও।' উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে মুক্তি বলল, 'এ কি চেহারা করেছ তুমি?'

'সেইতো আবার কাছে এলে।'

'এসো এসো আমার ঘরে এসো।' মুক্তি উচ্ছল হয়ে উঠল। ভেতরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে বলল, 'তুমি তাহলে সত্যিই এলে। নজর লাগার মতো দারুণ চেহারা করেছ।'

'আর যখন খুবই রোগা ছিলাম?'

'তখনও নজর লাগত—গুণের জন্য।'

সৌখিন আসবাব পত্রে সাজানো দু'খানা বড় ঘর পেরিয়ে দু'জনে বেডরুমে পৌঁছাল। বিছানার কভার পরিপাটি ঝেড়ে দিয়ে মুক্তি বলল, 'পা গুটিয়ে আরাম করে বসো।'

নীলাঞ্জন পা ঝুলিয়ে আড়ষ্টভাবে বসল। নির্ভয়ে দৃষ্টি মেলে মুক্তিকে জরীপ করল। মুক্তির হাতে এখন শুভ্র শঙ্খবালা। সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর। শীর্ণ হলেও সুঠাম নিতম্ব পাছা সরু কোমর। ডালিমের মত স্তনযুগল এখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

বড় বড় জানলাগুলি ভারী পেলমেট পর্দায় ঢাকা। মুক্তি একে একে সরিয়ে দিতে হুড়মুড়িয়ে একদঙ্গল বাতাস এসে ঢুকল। নীলাঞ্জন অন্যমুখী হল।

জানলা দিয়ে এখন গাছগাছালি নদী নৌকো লঞ্চ গাদাবোট দেখা যাচ্ছে। ওপারে মেটিয়াব্রুজে জাহাজ তৈরির কারখানা। জলে জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে একখানা। ম্লান আলোয় যেন জানলার ফ্রেমে আঁটা স্বপ্নময় চিত্র আঁকা। আরও কত কী!

সামনে টুল টেনে বসে মুক্তি নীরবতা ভাঙল, 'বল, কেমন আছ?'

'অন্তত এই মুহূর্তে খু-উ-ব ভাল। তুমি?'

'তুমি এলে, অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এল।' মুক্তি সপ্রতিভ হয়ে উঠল, 'মনে হচ্ছে, অনেক দিন পর বৃষ্টিতে ভিজছি। তোমার বউকে নিয়ে এলে না কেন?'
'বিয়ে যে করেছি তা তোমাকে কে বলল?'
'তোমার পোশাক চেহারা চোখ মুখ আচরণই বলে দিচ্ছে। কি বলে এসেছ ওকে?'
'তোমার লেখা চিঠিটা আমার আগে সেইতো পড়েছে। ফোন করেছি কিনা রোজ খোঁজ নিত। ফোনে লাইন পাচ্ছিলাম না। তাই চলে এলাম।
'ভাগ্যিস ফোনটা খারাপ ছিল, তাই তোমার দেখা পেলাম।'
'তা না হলেও আসতাম। এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে।'
'ভালবেসে বিয়ে করেছ?'
'না। বিয়ে করে ভালবাসছি।'
'কাজটাজ করে কিছু?'
'হ্যাঁ।'
'অফিস না স্কুল কলেজে?'
'বাসায়। যাবতীয় ঘরোয়া কাজ।'
'তুমি ভালবেসে বিয়ে করনি, ভাবতে অবাক লাগছে।'
'কেন?'
'তোমার মধ্যে প্রেমে পড়ার মতো সবকিছুইতো ছিল।'
'তবু তো তোমাকে পেলাম না।'
'পেয়েছিলে। খাঁচায় বন্দী হওয়ার অজুহাত দেখাতে হারিয়েছ।'
'অজুহাত বলছ কেন?'
'পুরুষরাতো বন্যই থাকে। তাকে ভালবাসার খাঁচায় ধরে নারীরা সংসার গড়ে। যথার্থ গভীর ভালবাসা যে একস্থানে স্থিতি সীমাবদ্ধতায়। পুরুষদের সৌন্দর্যপ্রিয় ভালবাসায় গভীরতা কোথায়? তাইতো তুমি কত অনায়াস অনাদরে আমার ভালবাসাকে পিছিয়ে পড়ার বন্ধন মনে করে ক্ষোভ জানিয়েছিলে।'
'আমাকে তুমি ভুল বুঝেছিলে সীমা। আমি হয়ত আমার দিকটাই বেশি করে ভাবতে চেয়েছিলাম, অস্বীকার করছি না। কিন্তু বিশ্বাস কর, তুমি যে আমাকে মনেপ্রাণে সত্যিকার ভালবাসতে তাকে আমি এতটুকু অপমান অবজ্ঞা করতে চাইনি।'
'ভালবাসতাম বলছ কেন? এখনও ভালবাসি। তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে হয়ত ব্যক্তি তোমাকেই বেশি করে পেতাম। বিরহের মধ্য দিয়ে প্রতি মূহূর্তে তোমার ভালবাসা পাই। মানুষের এমন কিছু দুর্বল আবেগ অনুভূতি থাকে যা প্রাণ থাকতে মরে না। এমন কিছু স্মৃতি গেঁথে থাকে যা মুছেও মোছে না। অদর্শন ব্যবধানে কিছু এসে যায় না। সত্যিকার ভালবাসায় প্রেমিক তবু সঙ্গ দিয়ে যায়।'
'তোমার এই ভালবাসার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। সত্যি করে বলতো আচমকা বিচ্ছেদের জন্য আমাকে কতটা দায়ী করা যায়?'
'এতটুকুও না। ভুলটা ছিল আমারই। প্রেমে পড়ার জন্য স্থিতি থাকা দরকার হয়। সেইসময় তোমার ভেতর তা ছিল না। যখন বুঝলাম তখন বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছিল।'
'একটু আগেই কিন্তু তুমি বলেছিলে, প্রেমে পড়ার মতো প্রায় সবকিছুই নাকি আমার ছিল।

সেটা বোধহয় সঠিক না। আসলে আসল জিনিসটাই যে আমার ছিল না। বড্ড ভীতু আর নীতিবাগীশ ছিলাম আমি। ভয় বিপদ ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করতে না জানলে কিসের প্রেম ভালবাসা?'
'এখন পাল্টেছে কিছু?'
'মানুষের মন মানসিকতাতো প্রতিনিয়তই পাল্টায়। তুমি কি কিছুই বদলাও নি?'
'আমিও তো মানুষ—অস্বীকার করি কেমন করে? তা নাহলে এতবছর পর শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখব বলে চিঠি লিখলাম কেন!'
'এতবছর অজ্ঞাতবাসে কোথায় ছিলে?'
'ওর বদলির চাকরিতে জলের ধারে পাহাড় জঙ্গলে। অনেক জায়গায়।'
নীলাঞ্জন নতুন করে কোন প্রশ্ন জুড়ল না। দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক অতীত স্মৃতিচারণ করল। এই বয়সটাইতো পিছন ফিরে তাকাবার। নস্টালজিয়া নতুন কিছু নয়।
নীলাঞ্জন ঘন ঘন কব্জি ঘড়িতে সময় দেখছিল। মুক্তি ম্লান গলায় বলল, 'এক্ষুণি যেতে চাইছ? দেরী হয়ে যাচ্ছে?'
'ঠিক তা নয়। অফিস পালিয়ে এসেছিতো।'
'তুমি যে সেই সকালে খেয়ে বেরিয়েছ, ভুলেই বসে আছি।' মুক্তি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কি খাবে বল।'
'যা খাওয়াবে তাই!'
'সলিড কিছু খাও।'
নীলাঞ্জনের মনে পড়ল, ইউনিভার্সিটি জীবনে মুক্তি ঠিক এমনি হৃদয় ছোঁয়া কথা বলত। মফস্বল থেকে ট্রেনে এসে ফার্স্ট ক্লাস এ্যাটেন্ড করতে হলে অনেকদিন ট্যুইশানির পর হাতে সময় থাকত না। না খেয়ে এলে মুখ দেখে মুক্তি ঠিক টের পেয়ে যেত। তখন জোর করে হোটেল ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। নিজের পার্শ থেকে বিল মিটিয়ে দিত।
নীলাঞ্জন সাময়িক অন্যমনস্কতা কাটিয়ে বলল, 'অতীতে কোন এক বৃষ্টিঝরা দিনে রেস্ট্ুরেন্টের কেবিনে বসে তোমার এই 'কী খাবে?' প্রশ্ন শুনে কেমন মজা করেছিলাম মনে পড়ে?'
'অতীত সবসময়ই স্মৃতিচারণে মধুময়। তা সে সুখ দুঃখ যেকোন স্মৃতিবহনকারীই হোক না কেন।'
'যদি সেদিনের মতো আজও বলি, সামান্যই খেতে চাই। পারবে খাওয়াতে?'
ইংগিতটা ধরতে আজ আর সময় লাগল না। সূর্যমুখীর মতো মুক্তি মুখ তুলে তাকাল। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে বাসি হাসি দেখা গেল, 'অন্য এক জীবনে দাঁড়িয়ে আমি আজও রাজী আছি। কিন্তু তুমি আজ পারবে কী?'
নীলাঞ্জন যেন টলটল নিস্তরঙ্গ ভালবাসার গহীন গোপন জলাশয়ে অবগাহন স্নানের আস্বাদ পেল। মুক্তির কপালে জবাকুসুম সূর্য দেখে আনত হল, 'হার মানছি।'
কথায় কথায় সময় গড়িয়ে যায়। বদলে যায় প্রকৃতি। জানলার ফ্রেমে আঁটা নিসর্গচিত্রটার ওপর তুলির টানে অন্ধকার নামে।
ড্রাইভার মালি প্রহরী পাচক চাকর চাকরাণী কি নেই এখানে? মুক্তি নিজের হাতে তৈরী গরম লুচি এনে দিল। সঙ্গে বেগুন ভাজা আর চিলি ফিস। ফ্রিজে রাখা রাবড়ি মিষ্টি।
দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচে খাওয়া শেষ করে নীলাঞ্জন বলল, 'এরকম একটা বিকেল-সন্ধ্যা জীবনে আসতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনওদিন।

'তোমার ভাল লাগছে?'
'খু-উ-ব।'
'এখানে এখনও বেশ কিছুদিন থাকব। সারাদিনের জন্য আসবে একদিন? তোমার মনের মতো রান্না করে খাওয়াব।'
'তোমার স্বামী যদি—।'
'আগের মতোই ভীতু আছ দেখছি। আলাপ হলে দেখবে, শিশুর মতো সরল মন ওর। কত অল্প সময়ে আপন করে নেবে। তুমি থাকতে যদি এসে পড়ে যেতেই দেবে না তোমাকে।'
'তোমার বাবা মা কেমন আছেন?'
'কেউ বেঁচে নেই। ভাই আমেরিকায়। কলকাতার বাড়িটা বিক্রী হয়ে গেছে। আর কারও কথা জানতে চাইবে না?'
মুক্তির ঠোঁটে রহস্যময় হাসি লক্ষ্য করে নীলাঞ্জন ধন্দে পড়ল, কাকে বোঝাতে চাইছে? হঠাৎই মনে হ'ল, ওর সন্তানদের সম্পর্কে কিছুই জানা হয়নিতো। অপরাধবোধের সঙ্কোচ ঝেড়ে বলল, 'রিয়েলি স্যরি। তোমার ছেলেমেয়েদের কোন খোঁজই নেয়া হয়নি এখনও।'
মুক্তি কিছু জবাব দেয়ার আগেই ডোর বেল বেজে উঠল। হর্ণ শুনে বুঝতে পারল, গাড়িটা এবার অরিন্দমকে আনতে যাচ্ছে।
মুক্তি কারও প্রতীক্ষায় দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমার মেয়ে বোধহয় এল। কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়ে। আমরা আসায় কিছুদিন এখান থেকেই যাতায়াত করছে। কাল আবার ওকে হোস্টেলে ফিরে যেতে হবে।'
মুক্তির অনুমান সত্যি। কেউ একজন সদর দরজা খুলে দিতে বছর পনেরো বয়সের একটি সুশ্রী মেয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌ল। চেহারা মুখের আদল প্রায় মুক্তির মতো। মেয়েটি একঝলক নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে টগবগ হেঁটে ওর নিজস্ব ঘরের দিকে চলে গেল।
মুক্তি আবার চোখ ফেরাল, 'এই আমার একমাত্র সন্তান, সীমা। আমার দেয়া নাম। ওই নামেই তুমি আমাকে ডাকতে।'
'ইমোশনে মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছ।' নীলাঞ্জন কারণ ব্যাখ্যা করে বলল, 'ওকে আমি কি নামে ডাকব এখন?'
'তখন কে আর জানত যে, দু'জনে আবার কোনদিন দেখাসাক্ষাৎ হবে! তাইতো অতটা তলিয়ে দেখিনি।' গোলমেলে জটিলতা এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি অন্য প্রসঙ্গে গেল, 'মিছিল শ্লোগান আন্দোলন বিপ্লবীঅনা ছেড়েছ তাতো বুঝতেই পারছি। তোমার সম্পাদনায় লিটল ম্যাগাজিনের খবর কি?'
'রক্তশূন্যতায় অনেককাল আগেই মারা গেছে।'
'আর নিজের লেখালেখি? সেটাও ছেড়ে দিয়েছ?'
নীলাঞ্জন বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস ওড়াল। তারপর ফেলে আসা প্রতিকূল পথের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শোনাল। ফের বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।
কৈফিয়ত চাওয়ার ভঙ্গিতে মুক্তি প্রশ্ন করল, 'সেসব কাঁটার পথতো পার হয়ে এসেছ। কিন্তু, এখন কি করছ?'
'কেন সংসারধর্ম করছি।' নীলাঞ্জন আর নিজেকে গুটিয়ে আড়াল রাখতে পারল না,' 'সংসার মানেই দিতে হবে দিতে হবে নিরন্তর শ্লোগান-স্থান। সেখানে সাংসারিক কাজ সন্তান পালন

আর স্ত্রীর সেবাযত্নে নিশিদিন উৎসর্গীকৃত জীবন। পান থেকে চুন খসলেই খিটিমিটি মেজাজ রুক্ষতার মুখোমুখি হওয়া। বয়সের সঙ্গে তাল রেখে স্ত্রীরা শিকড় গেড়ে পোক্ত হয়। ডালপালার অক্টোপাশে স্বামী বেচারার রক্তচাপ বাড়তে থাকে। নাভিশ্বাস ওঠে। গার্জেন স্ত্রীর তরফ থেকে অশান্তি—আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে হয়ে যায় নির্বিরোধী আপোষকামী ভেড়ুয়া।'

'বাহ্ বাহ্ মেয়েদের সম্পর্কে চমৎকার বিশ্লেষণ তোমার!' ব্যঙ্গ করে হাততালি দিল মুক্তি। তারপর সরাসরি অভিযুক্ত করল, 'অসীমে ওড়ার স্বপ্নকথা তাহলে তোমার বাহানা ছিল? আদতে তুমি নারী বিদ্বেষী নাকি নারীর চেয়েও কাপুরুষ? আমাকে কিন্তু অন্যকথা বুঝিয়েছিলে।'

'ওসব পুরনো কথা বাদ থাক মুক্তি।' নীলাঞ্জন তিক্ততা এড়াতে উঠে দাঁড়াল।

'না, থাকবে না।' মুক্তি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দৃঢ়তা দেখাল, 'তোমাকে পালিয়ে বাঁচতে দেব না আমি।'

'কি চাও তুমি?' নীলাঞ্জন বিব্রত অবাক হল।

'আমার স্যাক্রিফাইসের মর্যাদা চাই। তোমাকে আবার লেখা শুরু করতে হবে।'

এরকম প্রেরণা কি সানন্দার কাছ থেকে পাওনা ছিল না? মুক্তির কাছ থেকে বিরাট কিছু প্রাপ্তিযোগের আনন্দে নীলাঞ্জনের হতাশা উবে গেল।

বিদায় জানাতে পায়ে পায়ে বাংলোর ফটক অব্দি এগিয়ে এল মুক্তি। চোখে চোখ রাখল। রাস্তার বাতিস্তম্ভের আলোয় উজ্জ্বল দু'টি মুখ। নিষ্পলক চারচোখের সঙ্গমে দু'টি হৃদয়ের অন্তর্প্রবাহ উথালি পাথালি হয়ে উঠতে চাইছে।

মুক্তির গলায় আকুতি ফুটে উঠল, 'কথা দাও নীল, তুমি আবার লিখতে শুরু করবে।'

রাস্তায় পা বাড়াতে গিয়ে নীলাঞ্জন বলল, 'গল্পতো শুরু হয়ে গেছে তখনি, চিঠিতে ডাক দিয়েছ যখন। কথা দিলাম, আবার কলম ধরব।'

নীলাঞ্জন দূরে মিলিয়ে গেলেও ওর প্রতিশ্রুতি মুক্তির কাছে গান হয়ে রইল।

।। পাঁচ ।।

যথারীতি তরল-অন্ধকার ভোরে কলকাকলি—এ্যালার্ম শুনে নীলাঞ্জনের ঘুম ভাঙল। রাতের স্বপ্নাতুর আলস্য এখনও রমণীর স্বচ্ছ রাত-বস্ত্রের মতো গায়ে জড়ানো। ধূসর কুয়াশায় ঢাকা ফুটন্ত আলোয় পূর্ব দিকটা অপূর্ব। যেন ধূসর কাগজের মলাটে লাল রঙের বেস তৈরী করেছে। তারপর চিকচিক নদী আঁকা হয়ে গেছে। এবার সূর্য আঁকা হবে। জলে লাল হলুদ ঝিকমিক প্রতিফলন পড়বে।

আকাশে এখনও রাতের প্রহরী ক্লান্ত চাঁদ। ভোরের সূর্যকে দিনের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে প্রতীক্ষারত। মাথার ওপর দিয়ে সারি সারি পাখি উড়ে যাচ্ছে অবিরত।

নীলাঞ্জন আজ পায়ে পায়ে অনেক দূর পথ পর্যন্ত এসে পড়েছে।

গজিয়ে ওঠা জনপথ থেকে একটা রাস্তা গেছে দেহাতের দিকে। রাস্তার ধারে ইতস্তত আদিবাসী আবাস। দেহাত অব্দি মুন্ডা বেদিয়া গঞ্জু মাহাতোদের বসবাস। ঝাকা কাঁধে খালকাটার কাজে যাচ্ছে মেয়েরা। সুগঠিত দেহ। পরনে রঙিন শাড়ি। আকর্ষণীয় স্তন কোমর পাছা। চলনে ঠমকি ঠমকি ছন্দ।

শহরের মানুষের জলের চাহিদা মেটানোর জন্য এখানে বাঁধ তৈরী হয়েছে অনেক দিন হল। এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পাওয়ার হাউস হচ্ছে। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সহজ সিধা টানেল পথ গড়ার কাজ চলছে।
পাহাড় নদীর ধার ঘেঁসে লেবার ক্যাম্প। ড্রিলিং ব্লাস্টিং-এর বিকট শব্দ। ওয়েলডিং-এর আলো-ঝিলিক। পেনস্টন ক্রেন হুইসল ট্রানস্‌ফরমার জেনারেটরের দাপাদাপি। শ্রমিকদের হৈ হট্টগোল কর্মব্যস্ততা।
শান্ত নিস্তব্ধতা চূর্ণকারী দাপাদাপি শব্দ নীলাঞ্জনের ভাল লাগল না।
ফিরতি পথে দিলদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দিলদার জীপ চালিয়ে অরিন্দমের বাংলোর দিকে আসছিল। হর্ণ বাজিয়ে ব্রেক কশে দাঁড়াল, 'ইতনে সবেরে কাঁহাসে বাবুসাব?'
'এই এদিকটা একটু ঘুরে দেখতে এসেছিলাম। তুমি কোথায় চল্লে?'
'দপ্তরমে ম্যাসেজ আয়া, কাল সাঁওকো আচারিয়া সহাব লোটেগি। মেমসহাবকা ওহি বলনেকে লিয়ে যারাহাহুঁ। আপ আইয়ে——বৈঠিয়ে।'
'তুমি যাও। আমি বরং ডাইনের ওদিকটা একুটু দেখে যাই।'
'কোই বাত নেহি। আপ বৈঠিয়েতো। হাম দেখলা দেগা।'
সামান্য এ ক'দিনেই দিলদার বেশ বন্ধু হয়ে উঠেছে। নামের সঙ্গে ব্যক্তির এমন মিল সচরাচর দেখা যায় না। অবসর সময় সুযোগ পেলেই নীলাঞ্জনকে নানা শের শোনায়। ভাঙা বাংলায় তর্জমা করে বোঝাতেও পারে। সেজন্যই নীলাঞ্জনের ভাল লাগে।
নীলাঞ্জন আর আপত্তি করল না। দিলদারের পাশে বসল।
জীপ চলছে মন্দগতিতে। আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু পথ ধরে। দু'ধারে শাল পিয়াল ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। পাহাড়ের গায় খাদকাটা সবুজ গালিচার মত শস্যক্ষেত। ধান গম বজরার চাষ। গরু ছাগল ভেড়া মহিষের চারণভূমি। কিছুটা অঞ্চল ধূ ধূ মাঠ।
একটা গরুর গাড়ি লাল ধূলা উড়িয়ে যাচ্ছিল। দিলদার ওভারটেক করল। ঝাঁকুনি সামলে উঠে আচমকা দিলদারের প্রশ্ন শুনে নীলাঞ্জন বিব্রত বোধ করল।
দিলদার অবশ্য সাদা মনেই জিগ্যেস করেছে, 'আপনা মেমসাহেবকে সাথ্ কিউ না আনলেন বাবুসাব?'
প্রত্যুত্তরে দিলদারের কাছ থেকে শুনে শেখা শের শোনাল নীলাঞ্জন, ''জমিকে লালাউ গুল জিনহে খেয়াল নেহি।
ও লোগ চান্দসিতারোঁ কি বাৎ করতে হ্যায়।''
'বহুত আচ্ছা।' বিজ্ঞজনের মতো মৃদু হেসে দিলদার বলল, 'আভি সমঝমে আয়া। আমি বুঝতে পারলাম, কেন আপনি উদাস থাকেন।'
দিলদার নিজে ব্যর্থ প্রেমিক পুরুষ হলেও সে যে এখনও কেন তার প্রেয়সীকে ভালবাসে সে সম্পর্কে একটা শের শুনিয়েছিল।
''জিনহে হাসিল হ্যায় তেরা করিব, খুশ কিসমৎ সহি, লেকিন
তেরি হসরৎ লিয়ে মর জানে বালে ঔর হোতে হ্যায়।''
অর্থাৎ, তোমার সঙ্গ সুধা পান করা পুরুষেরা ভাগ্যবান হতে পারে, কিন্তু তোমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন বুকে নিয়ে ব্যর্থ প্রেমিকের জ্বালা পোড়ায় অনেক বেশি মহত্ব আছে।
দিলদার সেই মহৎ ব্যক্তি পুরুষ।
নীলাঞ্জনও বিশ্বাস করে যে, যে কোন মানুষের জীবনে কষ্টকর কান্নার অংশটুকুই তার

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তবু দিলদারের গোপন কষ্টে সমব্যথী হয়ে মায়ায় জড়িয়ে কৌতূহলী প্রশ্ন করল, 'মরিয়মকে তালাকতো দাওনি। তাহলে ছাড়লে কেন?'
দিলদার শিশু-সারল্যে প্রাণ খুলে হেসে ফেলল। জীপ থামিয়ে উদাসী শের শোনাল,
''তঅল্লুক বোঝ বন্ যায়ে তো উসকী তোড়না আচ্ছা
ওহ্ অফসানা জিসে তকমীল্ তক্ লানা না হো মুসকিন
উসে এক খুবসুরৎ মোড় দেকর ছোড়না আচ্ছা।''
সম্পর্ক যদি বোঝা হয়ে ওঠেতো সে সম্পর্ক ছেদ করাই ভাল। কাহিনী সমাপ্তি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া মুস্কিল হলে মাঝপথে সুন্দর কোন মোড়ে ছেড়ে দেয়াই ভাল।
আশ্চর্যরকম যুতসই জবাব শুনে নীলাঞ্জন অবাক হল। আত্মমগ্ন হয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিখ্যাত কবিতার কয়েকছত্র স্মরণ করল,
''তুমি বলেছিলে, বিচ্ছেদই শেষ কথা।
শেষ কথা কেউ জানে?
কথা যে ছড়িয়ে আছে হৃদয়ের সব গানে, সবখানে
তারও পরে আছে বাঙময় নীরবতা।''
দিলদারকে আপোষকামী হতে পরামর্শ দেবে কিনা নীলাঞ্জন ভাবছিল। জীপের ঝাঁকুনিতে অন্যমনস্কতা ভেঙে গেল।

বাংলোয় ফেরার পর থেকে মুক্তির মুখোমুখি হতে নীলাঞ্জন ভয় পাচ্ছিল। চা জলখাবারের টেবিলে আশ্চর্যরকম গাম্ভীর্যের সঙ্গে খাবার খাচ্ছে। মুক্তির দিকে তাকাচ্ছে না। মনের কোণে এক টুকরো মেঘ জমে থাকার কারণ অনেকগুলি। কাল মৃত্তিকা যে ওপর ঘরে গিয়েছিল তাতে মুক্তি সাত পাঁচ কিছু ভাবছে কি?
শীতল নিস্তব্ধতা ভেঙে মুক্তি সংযত প্রশ্ন করল, 'শরীর ঠিক নেই বুঝি?'
'কই নাতো। ঠিকই আছে।' চায়ে চুমুক দিয়ে নীলাঞ্জন সহজ হতে চেষ্টা করল।
'কাল রাত্রে খাবার খাওনি দেখলাম। অন্য দিনের চেয়ে আজ অনেক ভোরে বেরিয়ে গেছিলে। ভাল ঘুম হয়নি বোধহয়। ফিরলে অনেক দেরী করে। কেমন যেন উদাস উদাস দেখাচ্ছে। এত কী ভাবছ?'
'কিছু না তো।'
'কিছুতো অবশ্যই। হয়ত আমাকে বলতে চাইছ না।'
নীলাঞ্জন কোন উত্তর দিল না। অপরাধ বোধে অজানা ভয় তাড়িত হয়ে চুপসে রইল। তারপর হঠাৎই ওপর ঘরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।
মুক্তির পিছু-ডাক শুনে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াল নীলাঞ্জন। ধরা যখন পড়েই গেছে পালানো অনর্থক মনে করল। ধুকপুক বুকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকাল, 'বলবে কিছু?'
'যদি ভুল না বোঝ তবেই বলব।'
'আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো।'
'বলতো কি?' মুক্তির ঠোঁটের কোণে এক চিলতে কৌতুক হাসি ফুটে উঠল।
'মৃত্তিকা সম্পর্কে কিছু বলবে নিশ্চয়ই?'
'তোমার অনুমান সত্যি। কিন্তু কি বলতে চাই বলতো।'
'তাতো জানিনা।'

‘লেখালেখির সময় তোমাকে কেউ ডিসটার্ব করলে আমার কষ্ট হয়। তুমি যে পিছিয়ে পড়বে নীল। দোহাই তোমাকে, ভুল বুঝে অন্য কোন অর্থ কর না।’
‘ওকে তুমি একটু বুঝিয়ে বললেই তো পার।’
‘তার চেয়ে প্রশ্রয় না দিলেই তো হয়।’
‘সেটা কেমন করে?’
‘একজন লেখক তার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটলে সেটা মুখ ফুটে বলতে পারবে না!’
‘যদি ভুল বোঝে? অপমানিত হয়?’
‘তাতে তোমার কী এমন এসে যাবে? তুমিতো সময় হলেই চলে যাবে।’
‘বেশ, তাই হবে।’
‘রাগ করলে নাতো?’
‘এভাবে বলছ কেন? আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী হিসেবে এটুকু বলার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে।’
‘অধিকার’ শব্দটা শুনে মুক্তির বুকের ভেতরকার গোপন কষ্টটা মোচড় দিয়ে উঠল। একমুঠো দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে বলল, ‘লেখায় বসতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুমি যাও। একটু পরে ফ্লাস্কে চা পাঠিয়ে দেব।’
সিঁড়ি ভেঙে ওপরের দিকে উঠতে নীলাঞ্জন নিচে থেকে মুক্তিকে বলতে শুনল, ‘খুব বেশি সিগারেট খেও না কিন্তু।’

আজ আর দূরে কোথাও বেড়াতে যায়নি নীলাঞ্জন। কাল বেশি রাত জেগে লেখালেখি করায় ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হয়ে গেছে। সামনের লনে কিছুক্ষণ পায়চারী করেছে মাত্র। তারপর ওপর ঘরে যায়নি। বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ছিল। বুধুয়া এসে এখানেই সকালের চা জলখাবার দিয়ে গেছে।
নিম ফুলের গন্ধে শিশুসূর্যের নবীন আলোয় প্রকৃতি হাসছে এখন ঝকমক চকচক। বেলা বাড়তে রুমঝুম শব্দ করে মুক্তি এসে কাছে দাঁড়াল। পরনে লাল পাড় বাসন্তীরঙা শাড়ি। ঘুরিয়ে এনে বুকের ওপর ফেলা ঝুলন্ত ভেজা চুল। গলায় জড়ানো আঁচল। রেকাবিতে সাজানো পূজার অর্ঘ।
সকালের মিঠে রোদ্দুরের হাসি ছড়িয়ে মুক্তি বলল, ‘যাবে নীল?’
‘কোথায়?’
‘হাতে রেকাবি দেখেও বুঝতে পারছ না!’
সুদূরের ডাক শুনে নীলাঞ্জন সাড়া না দিয়ে পারল না।
পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে পাকদন্ডী পথ বেয়ে দু’জনে নিচে নামছে এখন।
সেঁওকুল কাঁটালতা ঘন কেলাউন্দার ছায়াছন্ন ঝোপজঙ্গল পার হয়ে গেল। তারপর ছায়া নিবিড় শীতল পথ ধরল। ঘন গাছ-গাছালির বুনোট পাতার ফাঁক ফোকড় দিয়ে ছিলকে পড়ছে নরম চিকণ রোদ্দুর। অরণ্য যদি মাথার চুলতো সরু বনপথটি তার সিঁথি।
ওরা দু’জনে হাঁটছে। দু’ধারে ইতস্তত ছোটখাট লাল নীল বেগুনি পাহাড়ি ফুল বাতাসে দোল খাচ্ছে। তিড়িং বিড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে চড়ুই টুনটুনি মৌটুসী। আড়াল থেকে শিস দিচ্ছে নাম না জানা পাখি।

নীলাঞ্জনকে নিয়ে একটা পাহাড়ি ঝোরার কাছে এসে মুক্তি দাঁড়াল। সামনে ছোট বড় শাদা পাথর রাশি রাশি। স্বচ্ছ সফেন জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে দুই আদিবাসী রমণী। পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে আঁজলা ভরা জলে স্নান করছে ওরা।

ঝোরার দু'পারে ইউক্যালিপটাস অর্জুন সেগুন শিশু ইত্যাদি গাছেদের গলা জড়াজড়ি। মালার মতো উড়ে যাচ্ছে শাদা বকের সারি। ট্যাঁ ট্যাঁ ডাক দিয়ে গেল একজোড়া টিয়া পাখি। ঝোরার জলে ছোঁ মারল এক বাজপাখি। তারপর পাক খেয়ে চক্রাবর্তে আকাশে উড়তে থাকল। হাঁ করা মুখে তাকিয়ে রইল উপোসী মাছরাঙা পাখি।

মন্দিরটি টিলার ওপর। প্রাচীন বলেই অযত্নে অপরিচ্ছন্ন। দু'একজন গ্রাম্য আদিবাসী পুণ্যার্থী আসছে যাচ্ছে।

মন্দিরটি কোন দেবতার তা বাইরে থেকে বোঝা গেল না। জানার জন্য নীলাঞ্জন উৎসাহী কৌতূহলী হল না।

মন্দিরের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মুক্তি তর্জনী তুলে বলল, 'সামনের ওই চাতালটায় গিয়ে তুমি দাঁড়াও নীল। সুন্দর দৃশ্য দেখে সময় কেটে যাবে। আমি ততক্ষণে পূজা দিয়ে আসছি।'

নির্বাক মালভূমির ওপর থেকে দূরের আদিগন্ত নিসর্গ দেখতে সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। একদিকে পাহাড় জঙ্গল অরণ্যপ্রকৃতি। রোদ ঝলমল উপত্যকা নদীর চরাচর। বাঁধের জলাশয়। এই জলাশয় থেকে খালকাটা পথে বিভিন্ন অঞ্চলে চাযের জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অপরদিকে মাঠ পেরিয়ে দেহাত বসতি। খাপরার চালের কুঁড়েঘর। মসৃণ চিত্রিত মাটির দেয়াল। তকতকে নিকোন উঠোন। মুরগী গরু মহিষ ছাগল বাছুর। দাওয়ায় পাতা ছেঁড়া চাটাই মাদুর। রোদ্দুরে শুকোচ্ছে কাঁথা আচার মকাই ধান বাজরা। কুয়ো থেকে জল তুলছে শীর্ণা এক বৃদ্ধা রমণী।

কাছেই সবুজ ঘাসবনে দুধেল গরু মহিষ চরছে। বাছুরগুলি তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে। সেই ছন্দ-তালে গলার ঘন্টি বাজছে টুং টাং টুং টাং। বধূ কিশোরীর দল মাথায় মেটে কলসী নিয়ে যাচ্ছে। সফেদিয়া ফুলের সুবাসে ওরা খুশি উচ্ছল। বাতাসে জলের শব্দ ভাসছে কুলু কুলু কুলু কুলু। দৃষ্টির অন্তরালে ঝর্ণা ঝরছে ঝরো ঝরো।

মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক হরিয়াল উড়ে যেতে দেখে নীলাঞ্জনের দৃষ্টি মন্দিরমুখী হল। ঘণ্টা বাজিয়ে উবু হয়ে প্রণাম করল মুক্তি। প্রণামী পাত্রে খুচরো পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে পুরোহিতের কাছ থেকে চন্দনটিকা পরল। হাতের পাতার চরণামৃত ঠোঁট ছুঁইয়ে শুষে নিল। তারপর ভেজা চেটো মাথার চুলে মুছল।

মুক্তি কাছে এসে দাঁড়াতে নীলাঞ্জন অভিযুক্ত করল, 'আমার জন্য চরণামৃত আনলে নাতো?'

'তুমি যে এসবে অবিশ্বাসী আমি তা জানি।'

'সেতো সেই যখন মানুষকে অন্ধ বিশ্বাস করতাম আর ধর্মকে আফিং মনে হত তখনকার কথা বলছ।'

'আর এখন?'

'প্রতিনিয়ত প্রতারিত হয়ে এখন ওই একজনের ওপরই সবকিছুর ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরাম বোধ করি।'

'সত্যি!' চোখ ঝিকমিক মুক্তি নীলাঞ্জনের কপালে আশীর্ব্বাদী ফুল ছুঁইয়ে হাতে দিয়ে বলল, 'কাগজ কলমে একবারটি ছুঁইয়ে নিও।' রেকাবী থেকে প্রসাদ দিয়ে জিগ্যেস করল, 'কেমন লাগল, দূরের ওই নিসর্গ দৃশ্য?'

'অপূর্ব সুন্দর।' পথ চলতে নীলাঞ্জন ভাবাবেগে বলল, 'ইচ্ছে হচ্ছে, বাকি জীবনটা এখানেই থেকে যাই।'
'আমার ঘরে আমার কাছে!'
'তা কেমন করে সম্ভব?'
'তবে?'
'মনে কর, যদি কিছু জোতজমি নিয়ে চাষ-আবাদ আর পশুপালন করলাম। যা রুজি রোজগার হবে তাতেই চলে যাবে। তখন মনের আনন্দে আঁকব লিখব গান গাইব। দ্বন্দ্বে ছন্দে মোটামুটি দিন কেটে যাবে।'
'তারপর?'
'মৃত্যুর পর আত্মা নাকি নিখিল ভুবনময় ছড়িয়ে থাকে। আকাশের নিচে গাছের ছায়ায় মাটির গভীরে পরম নিশ্চিন্তে আমার দেহটা থাকবে। আমাকে কবর দেবে তুমি। আমার সমাধিতে মাঝে মাঝে ফুল দিয়ে যাবে। রজনীগন্ধা শিউলি বেল যূঁই—যখন যা পাবে।'
'আর যদি আগে আমি যাই?'
'কি করলে খুশি হবে তুমি?'
'মৃত্যুর পর খুশি হব কেমন করে! বড়জোর আত্মার শান্তি হতে পারে।'
'বেশ তাই। বল, কি চাও তুমি?'
'আমাকে চিতায় তোলার আগে আলতা মেশানো দুধে স্নান করিও। চিতায় কিছু হলুদ গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিও।'
'তেমন সুযোগ কি হবে কখনও?'
'নয় কেন?'
'আমি হয়ত একদিন সব কিছুই ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে চলেই এলাম। খামার না-হলেও শিশুদের জন্য একটা স্কুল গড়লাম। আমরা দু'জনেই সেই স্কুল নিয়ে মহানন্দে মেতেও রইলাম। তারপর হঠাৎ একদিন অরিন্দমের নামে ট্রান্সফার অর্ডার এল। তখন কি হবে?'
মুক্তি ছোট্ট নুড়ি পাথরে হোঁচট খেল। কোন উত্তর খুঁজে পেল না।
নির্বাক দু'জনে নদীর চর পেরিয়ে সহজ সোজা পথ ধরল। কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে এক চিলতে শাখা নদী পার হল। বনস্থলীতে মুক্তি যেন তর তর উড়ে যাচ্ছে এখন। পথের দু'ধারে লিট্‌পিটিয়ার জঙ্গল। মাঝে মাঝে গোল নরম লালচে রাহেলাওলার ফুলের সমারোহ।
খরগোস গতিতে মুক্তিকে ধরে ফেলল নীলাঞ্জন। শালবনের সতেজ সবুজে একটা পাখি দেখে মুক্তি কিশোরীর মত উচ্ছল হয়ে বলল, 'ওই দেখ আমার নীল পাখি।'
নীলাঞ্জন একজন তরুণ প্রেমিকের মত কাব্য করে বলল, 'নীল কী শুধু আকাশ সমুদ্র আর পাখির পালকে? তোমার চোখের তারাতেও।'
মুক্তি পাহাড়ি ঝর্ণার মতো হাসল। গুনগুনিয়ে গান ধরল, 'রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে....'
একসময় বয়সের মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে দু'জনেই কিশোর-কিশোরী হয়ে গেল।
প্রথমে টোপা ফুলের মতো টুকটাক কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। তারপর ঝির ঝির বৃষ্টি এল। সবশেষে অরণ্যের পাতায় অশ্বখুড়ের শব্দ তুলে তেজী বৃষ্টি নামল।
পাইন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তি আর নীলাঞ্জন। দীর্ঘক্ষণ। তেজ কমলেও উদ্‌ভ্রান্ত বাতাসে মিহি বৃষ্টিকণার স্পর্শ এসে দু'জনের গায়েই লাগছে। মাথার ওপর ভেজা পাতা

থেকে জল পড়ছে টপ টপ। সমুদ্র তীরের ঝাউপাতার মতো মুক্তির শরীর কাঁপছে থর থর। নিজের দেয়া অতীতের নাম ধরে নীলাঞ্জন বলল, 'মন্দিরে কি চাইলে সীমা?'
'বলব কেন? সেতো একান্তই গোপনীয়।'
'দু'জনের শ্রেষ্ঠ গোপনীয়তাতো আজও গোপন থেকেই গেল। হয়ত থাকবেও আজীবন।'
'সে তো তোমার অহং অনাগ্রহ উদাসীনতার জন্যই।'
নীলাঞ্জন কোন উত্তর খুঁজে পেল না।
নীল হ্রদের জলে কুঞ্চিত রেখার মতো মুক্তির গোপন স্থানে সাড়া জাগছে। অপরিণামদর্শী কামার্ত জনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া ঝর্ণা হতে ইচ্ছে হচ্ছে। হরিণীর মতো চোখে মিষ্টি দুষ্টুমি উছলে পড়ছে।
মুক্তি ঠোঁটে দাঁত কেটে হাসল।
প্রকৃতি আর মুক্তির ভেজা সৌন্দর্য এখন অন্যরকম। মুক্তির শরীরের আকর্ষণীয় ভাঁজগুলি এখন সুস্পষ্ট রমণীয়। পিঠের ওপর লেপ্টে আছে ভেজা চুল। ভেজা সরু কোমর ভারী পাছা বুকের ডালিম। রামধনু রং আলোয় মিষ্টি মধুর উজ্জ্বল।
প্রকৃতি এখন বেলজ্জ কী? অথবা, বেআব্রু শিশুর মতো স্নিগ্ধ পবিত্র স্বর্গীয় সুন্দর? নীলাঞ্জনের শরীরের সঙ্গে সাপ্টে থাকা মুক্তি কি নরম মসৃণ প্রজাপতি? নাকি ভেজা ইউক্যালিপটাস গাছ কোনও?
অলৌকিক অনুভূতি আবেশে দু'জনকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এখন নীলাঞ্জনের বুকের খোলের মধ্যে ঘুঘু পাখির নরম বুকের মতো মুক্তির স্তনযুগল ওঠানামা করছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। নিঃশ্বাসের বাতাসে আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে। নিমেষে শুকিয়ে যাচ্ছে চুল পোশাক আশাক। কিন্তু ভিজে উঠছে গোপন অংশ।
মুক্তির শরীর জুড়ে সাজানো নরম ফুল ফল পাতায় শক্ত আদরের স্পর্শ দিল নীলাঞ্জন। অসংখ্য চুমু খেল। তারপর চুলের অরণ্যে চিবুক ডুবিয়ে দিল।
মুক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। হাল্কা হাওয়ায় পাতার মতো ভারশূন্য ভাসছে। মুক্তি ডুবে তলিয়ে যাওয়ার আগেকার মানুষের মতো করে নীলাঞ্জনকে আঁকড়ে ধরল। পাহাড়ি অজগর-শক্তিতে শক্ত চাপ দিল। এ যেন এক রমণীয় স্বর্গীয় মুহূর্ত। বাতাসে ভাসছে মহুয়া কেয়া ফুলের 'ম' 'ম' গন্ধ। লজ্জায় পালাল কাঠবিড়ালী তিতির রাজঘুঘু। মেঘের ফাঁক ফোঁকর থেকে সূর্য যেন নিষিদ্ধ কিছু দেখার আনন্দ উপভোগ করছে।
একসময় সূর্য প্রকাশ্যে বেরিয়ে এল বেলজ্জ। আলোকিত নীলাঞ্জন সঙ্কোচে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল। কাপুরুষ ভীতু অপবাদ দিয়ে মুক্তি মুখরা হল, 'তুমি না সৃষ্টির কথা বল নীল? শুধুমাত্র সংসারকে বঞ্চনা করে আর নারীর প্রেরণাতেই মহৎ সৃষ্টিকার হওয়া যায় না। ঝুঁকিও নিতে হয়। সেটা নিতে জানোনা বলেই তুমি অনেক কিছু পেরেও পার না।'
রাগ ক্ষোভ ব্যর্থতা আর নৈরাশ্যে হাঁটতে শুরু করল মুক্তি।
মুক্তির যুক্তির বিরুদ্ধে রা কাড়ল না নীলাঞ্জন। সে নিজেও বিশ্বাস করে, 'আগুন ছাড়া কীসের ভালবাসা?' বেআব্রু প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করতে পারে না, প্রকৃতিই যথার্থ। বাকি সমাজ সংসার সংস্কারের যত বাধা সবই অসাড়। তবু শিক্ষা সভ্যতার পোশাক প্রসাধনের আব্রুতায় আজ অব্দি ভীতুই রয়ে গেল। মুক্তির কাছ থেকে অতল জলের আহ্বান শুনেও দুঃসাহসী স্বর্গচ্যুত হতে পারল না।

বাকি পথ দু'জনে নির্বাক হাঁটল। মুক্তির চোখ মুখে চৈত্রের তামাটে আকাশের বিষণ্ণতা। নীলাঞ্জনের বুকের ভেতর এযাবত মুক্তিকে কিছুই দিতে না পারার গভীর দুঃখবোধ যন্ত্রণা। দু'টি হৃদয় থেকে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে একটু আগেকার আহ্লাদী দিনের সমস্ত মধুর রমণীয় উচ্ছলতা।

।। ছয় ।।

নীলাঞ্জনের অফিসটা কিছুদিন হল নিউ মার্কেটের নিকটে বহুতল বাড়ির ঠিকানায় উঠে এসেছে। নীলাঞ্জনের টেবিলে নিজস্ব কোন রিসিভার নেই। পাশের চেম্বারে চীফ এ্যাডভারটাইজিং অফিসারের টেবিল ফোনে দরকারী কল যায় আসে। অসুবিধাটা জানান সত্ত্বেও রোজ অলস দুপুরে ফোনে মুক্তি একবার ডাকবেই ডাকবে। রিসিভার তুলে পরিচয় জানালে ওপার থেকে মুক্তির প্রথম জিজ্ঞাস্য থাকে, 'আবার কবে আসছো?' তারপর গলা থেকে অনুরোধ গলে পড়ে, 'লক্ষ্মীটি এসো একবার। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছে।'
তেমন কোন দরকারী কথা থাকে না মুক্তির। হাজার রকম ফালতু প্রশ্ন করে ফোনের লাইন ধরে রাখে। এমন অনেক প্রশ্ন থাকে যেগুলির উত্তর সুমুখে বসে থাকা চীফের উপস্থিতিতে দেয়া অসম্ভব। এদিকে হিসেব করা মূল্যবান কাজের সময় নষ্ট করতে বাধে। অথচ, অসুবিধার কথা সোজাসুজি ফোনে বলা মুস্কিল। ফলে, মুক্তির ফোন এখন এক আতঙ্কবিশেষ।
আজও যথারীতি মুক্তির ফোন এলো।
বিব্রত নীলাঞ্জন তড়িঘড়ি বলল, 'ডোন্ট মাইন্ড, দারুণ ব্যস্ত আছি এখন।'
'কবে আসছ? আর মাত্র তিন দিন এখানে আছি। কাল অফিসে যেও না। রোজকার মতো বেরিয়ে সোজা এখানে চলে আসবে। আমি একদম ফ্রি। তোমার জন্য রান্না করে রাখব।'
নীলাঞ্জন কোন জবাব দেয়ার আগেই রিসিভারটা রেখে দিল মুক্তি। নিজের টেবিলে ফিরে এসে মহা ভাবনায় পড়ল নীলাঞ্জন। কাল না গেলে নির্ঘাৎ ফের ফোন আসবে। কাল পরশু--প্রতিদিন। তাতেও সাড়া না দিলে হয়ত আর কোনদিনই দেখা হবে না।
নীলাঞ্জনের ইচ্ছেটা ঘাই দিল। বুকের ভেতর তির তির প্রবাহ ভালবাসা বুদবুদ তুলল।
পরদিন যথাসময়ে অফিস উদ্দেশে বেরিয়ে ধর্মতলা থেকে নীলাঞ্জন একটা ট্যাক্সি নিল। পিছন সিটে মাথা এলিয়ে মুক্তির ডাকে নানা রঙীন জাল বুনে চলল।
নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতায় রবীন্দ্রসঙ্গীত যেকোন মানুষের মন ছুঁয়ে যায়। বাংলোর লনের ভেতর পাথরকুচি পথে পা ফেলে নীলাঞ্জন টেপ ডেকে শুনতে পেল,
"চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষজুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে...."
ডোরবেলের সংকেত শুনে মুক্তি বেরিয়ে এলো। নীলাঞ্জনকে নিয়ে সোজা ডাইনিং টেবিলে বসাল।
কুমড়ো শাক, সরষে দিয়ে কচুবাটা, মোচার ঘন্ট তৈরী করেছে মুক্তি। রেঁধেছে ট্যাংরা মাছের ঝোল আর টকের ডাল। সঙ্গে তপসে ফ্রাই, হাতে পাতা টকদই স্যালাড মিষ্টি।
'নাও আরম্ভ কর।' পারিপাটি সাজিয়ে দিয়ে মুক্তি মুখোমুখি বসে বলল।

'রোজকার মতো খেয়েদেয়ে অফিসের নামে বেরিয়েছি। তারপর এতসব খাব কেমন করে?'
'হেভি কিছুতো করিনি। শুধু তোমার পছন্দের আইটেমগুলিই করেছি।'
'মেয়েদের আশ্চর্য মিলের এক দুর্বলতা। পুরুষদেরকে রান্না করে খাইয়ে তোমাদের যত আনন্দ!'
'বেশতো। সেই আনন্দটুকুই অন্তত পেতে দাও।'
আর না আর না বলেও নীলাঞ্জন মন্দ পরিমাণ খেল না।
মাত্র দু'মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে পনের মিনিটে সেজেগুজে প্রস্তুত হল মুক্তি।
শোফায় গা এলিয়ে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে নিষ্পলক নীলাঞ্জন।
সুমুখে দাঁড়িয়ে ঢল কলমির মতো নম্র মুক্তি যেন মোহময়ী। পরনে হালকা গোলাপী শাড়ি। এক ঢাল ঝুলন্ত চুল। কয়েকটা চুল বাঁচোখ আড়াল করে গাল বেয়ে নেমেছে। মেদহীন শরীর থেকে পারফিউমের খুশবু ভাসছে।
'কোথায় যাবে?' নীলাঞ্জন জানতে চাইল।
'তাতো জানি না। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে হারিয়ে যাব।'
'আমরা দু'জনেই এখন বিবাহিত। চারদিকে পরিচিত জনেরা ছড়িয়ে আছে। সেভাবে হারিয়ে যাওয়ার বয়সেই কি আছি এখন?'
'তবু সব ভয় লজ্জা দু'পায়ে ঠেলে আজ হারিয়ে যাবই।'
'কোথায়?'
'ডায়মন্ডহারবার বোটানিক্যাল গার্ডেন নিকো-পার্ক এয়ারপোর্ট ব্যারাকপুর-গান্ধীঘাট বেলুড় দক্ষিণেশ্বর—যেকোন জায়গায়।'
'কিন্তু আমার যে ভয় করছে মুক্তি।'
'অনিচ্ছাতো নেই?'
'অবশ্যই না।'
'তাহ'লে? কিছু পেতে হলে দুঃসাহসী নাহলে চলে না। চল বেরিয়ে পড়ি।'
তিন দিন অফিসে গেল না নীলাঞ্জন। অফিসের নামে বেরিয়ে মুক্তিকে নিয়ে নানা জায়গায় বেড়ালো। নদীতে নৌকায় চড়ল। জল ছুঁই ছুঁই ঝিলের ধারে ঘনিষ্ঠ বসল। সিনেমা দেখল। রেস্তোরাঁয় খেল। একজোড়া তরুণ প্রেমিকের মতো সবরকম আচরণ করল। শেষ সাক্ষাতের দিন দু'জনে মিলে মার্কেটিং করল।
মুক্তিকে লাল পেড়ে শাদা শাড়ি দামী সেন্ট শ্যাম্পু ধুপকাঠি আর হলুদ গ্যাডুইলাস ফুল কিনে দিল নীলাঞ্জন। মুক্তি দিল, নীল বুশ সার্ট স্বর্ণালি কলম কোয়ার্জ ঘড়ি আর লেখার টেবিলের জন্য ব্যাটারিতে জ্বালা বাতি।
তারপর দু'জনে পূজা দিতে সোজা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেল।
সন্ধ্যার অন্ধকারে বিদায় লগ্নে বিষণ্ণ মুক্তি বলল, 'তিনটে দিন আশ্চর্য সুন্দর কেটে গেল। আর কি আমাদের দেখা হবে নীল?'
'নিশ্চয়ই হবে।'
'কেমন করে?'
'যখন যেখানেই থাক না কেন ঠিকানা জানিয়ে ডাকলেই নীল পাখিটা ঠিক গিয়ে হাজির হবে। দেখে নিও।'

মুক্তির চোখে বন্যা নামল। বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তে শেষ কথা শোনাল, 'লেখা থামিও না নীল। অনেক অনেক লিখবে। তা নাহলে ভীষণ কষ্ট পাব।'

এক দিন যথাসময়ে অফিস-চেম্বারে ঢুকে নীলাঞ্জন টেবিলের সুমুখ চেয়ারে গঙ্গেশকে দেখে অবাক হল।
'সাতসকালে তুই? অফিস যাসনি?'
'না। লম্বা ছুটি নিয়েছি। ভাবছি, কিছুদিনের জন্য বাইরে কোথাও ঘুরতে যাব।'
'কিছু খুশ্ খবর আছে মনে হচ্ছে।'
প্রত্যুত্তরে নির্বাক গঙ্গেশ উজ্জ্বল হাসল।
লেবু চা অর্ডার দিয়ে নীলাঞ্জন টয়লেটে গেল। ফিরে এসে জিগ্যেস করল, 'বাইরে কোথায় যাচ্ছিস?'
'কিছু ঠিক করিনি। বেরিয়ে পড়ে ভাববো।'
গোপন দুঃখের আঁচ পেয়ে নীলাঞ্জন ফের কোনও প্রশ্ন জুড়ল না।
'জয়েন্টলি সেপারেশন ফাইল করেছিলাম।' গঙ্গেশ সগর্বে জানাল, 'আমার জয় হয়েছে। ইটস এ প্রেস্টিজ কেস টু মি।'
প্রিয় পছন্দ লেবু চায়ে চুমুক দিয়ে নীলাঞ্জন তেমন কোনও স্বাদ পেল না। গঙ্গেশকে সিগারেট অফার করে নিজেরটায় আগুন ধরিয়ে বলল, 'সব জয়, জয় না গঙ্গেশ। কুল ব্রেনে একবার চিন্তা করে দেখিস, তুই জিতেছিস নাকি হেরেছিস।'
'একজন অন্য পুরুষের কাছে হয়ত হেরেছি।' সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে গঙ্গেশ বলল, 'কিন্তু একজন জেদী লেডির কাছে জিতেছি নিশ্চয়ই। তাই ভাবছিলাম, পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে কিছুদিন বাইরে কোথাও ঘুরতে যাব। আর জয়ের আনন্দ করতে আজ সন্ধ্যায় তোর ওখানে একবোতল প্রাইড অব ইন্ডিয়া নিয়ে হাজির হব। তোর কি মত?'
'আজ আমার ফিরতে রাত হবে।' নীলাঞ্জন ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে খোঁচা মারল, 'আমি না থাকলেও সানন্দাতো আছেই। তোর কোন অসুবিধা হবে না। ইউ মে গো।'
এককালে আর্মিতে কাজ করা মানুষ গঙ্গেশ। সেকারণে সেন্টিমেন্ট কম স্মার্টনেস বেশি। সানন্দা থাকবে কিনা সেটা জানা আসল উদ্দেশ্য ছিল। নীলাঞ্জনের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে প্রতিক্রিয়াহীন প্রস্থান করল।
ছুটির পর নীলাঞ্জনকে বিষণ্ণ শূন্যতায় পেয়ে বসল। কোথায় যাওয়া যায় সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছিল না। সাম্প্রতিক কালের সিনেমার গল্পে না আছে কোন নতুনত্ব। সবই প্রায় ফর্মুলায় ফেলা কাঁচা প্রডাকশন। অফিসক্লাবে তাসের আড্ডার আড়ালে চলে জুয়া খেলা। বন্ধুদের সঙ্গে মজলিস মদ গেলা। নয়ত অন্যের কেচ্ছা গাওয়া, রাজনীতি আর খেলা নিয়ে কচকচানি। প্রতিষ্ঠিত বন্ধুরা এড়িয়ে চলে। আরও উচ্চাভিলাষীরা যে যার ধান্দায় মেতে থাকে। ঘরেতে সানন্দার কথাবার্তা ছকে বাঁধা। অভাব অভিযোগ রুক্ষতা টেনশান। সব কিছুতেই কেমন যেন যান্ত্রিকতা স্বার্থপরতা বস্তুবাদিতা। একমাত্র সন্তান অভ্র স্কুল হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। কাছে থাকলেই বা কি এমন হতো? কাছে থাকাকালীন তো ধারে কাছেই ঘেঁষত না। সম্মান দিয়ে কথা বলতে শেখেনি। বাবার অসুস্থতায় না ছিল কোন উদ্বেগ। আর এই চাকরিক্ষেত্র শহর কলকাতা? ভীড় হৈ হট্টগোল জ্যামজট শব্দ ধোঁয়া

মিছিল মারদাঙ্গা নোংরা আবর্জনা ধুলো লোডসেডিং ইত্যাদি ইত্যাদিতে ভরা। দুরন্ত ছুটন্ত অসহ্য জীবন।
ইদানিং নীলাঞ্জনের হামেশা নিরুদ্দেশ কোন অজ্ঞাতবাসে যেতে ইচ্ছে হয়, মন চায় বাউন্ডুলে হতে। হঠাৎ বেরিয়ে পড়ায় থাকবে না নির্দিষ্ট কোন নিশানা। রিজার্ভেশান বিহীন কোন রেলবগীতে সারারাত বসে অথবা দাঁড়িয়ে কাটানোর পর?
দূরপাল্লার ট্রেনটা আবছা আলোর ভোরে নিশ্চিত কোনও স্টেশনে দাঁড়াবেই। স্বচ্ছ স্নিগ্ধ আলোয় যেকোনও স্টেশনকেই দেখতে মন্দির প্রাঙ্গণে পূজারিণী রমণীর মতো সুন্দর। অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত সেই স্টেশনটি সমুদ্র পাহাড় নদী খাল বনবাদাড় অথবা গাঁগঞ্জের কোন একজায়গায় হবেই। অল্প বিস্তর মানুষজনও সেখানে থাকবে। ওদের ভাষা বর্ণ পোশাকে ব্যতিক্রম কিছু লক্ষ্য করা যেতেও পারে। আলো বাতাস গাছ-গাছালি পাখ পাখালি অন্ন পানীয় পাওয়া যাবেই। এইতো আমাদের দেশ। সুতরাং, ভাবনা কীসে!
ছোটবেলায় কৈশোর যৌবনে এরকম ভাবনার ছোট ছোট ঢেউ তুলে নীলাঞ্জনের পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হতো। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা' গানটা বড় বেশিরকম ভাল লাগত। অথচ অভাবী সংসার বৃত্তে ডানা ঝাপটানো ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। এখন স্ত্রীসন্তান সংসার পরিবার নিয়ে বন্ধন রজ্জুটা শীর্ণা কিশোরী নয়। বরং ভরাট বয়সী রমণীর মতো। তবু, নিত্যকর্মপদ্ধতিতে হাঁপিয়ে উঠলেই নীলাঞ্জন বলে, 'ভীষণ একঘেয়েমি এসে যাচ্ছে। যাই, নিরিবিলি নির্জন কোথাও কদিন কাটিয়ে আসি।'
একতারা আর বোষ্টমীবিহীন বাউলের মতো নীলাঞ্জন প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে। সানন্দা মেজাজ দেখায়।
'এখনতো তুমি আর একা নও। হঠাৎ হঠাৎ এভাবে সবকিছু ছেড়ে গেলে এদিকে চলবে কেমন করে?'
'সংসারের মায়ায় বেশি জড়িয়ে পড়লে ক্ষতিতো তোমারই হবে।'
'সেটা কেমন করে?'
সানন্দার বুক কেঁপে ওঠে অন্য আশঙ্কা আর অপরাধবোধে।
'আমি নিশ্চিত যে, চিরমুক্তির অনন্ত আনন্দধামে তোমার আগে আমিই যাব। আমার ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়লে তখন একা চলা মুস্কিল হবে।'
অপরাধবোধ আশঙ্কায় বুক ধুকপুকানি উবে গেলেও সানন্দার চোখের কোণে জল চিক চিক করে ওঠে। মুখায়বে বৈশাখী মেঘ স্থির হয়ে দাঁড়ায়।
অফিস থেকে বেরিয়ে নীলাঞ্জন ফুটপাতের ধারে একাধিক বুক স্টলে দাঁড়াল। নানারকম জার্নালের পাতা উল্টেসময় কাটাল। কিছুক্ষণ বাস স্টপে দাঁড়িয়ে মানুষজনের ভীড় চলমান জনস্রোত যাত্রী ওঠানামা দেখল। ময়দানের ক্লাব টেন্টে চা স্ন্যাকস্ খেল। শহীদ মিনারের নিচে জনসভার ভাষণ শুনল। তারপর পায়ে পায়ে আউটরাম ঘাট অব্দি গেল। নদীর ধারে বুড়ো বটগাছের নিচে বসল।
কিছুক্ষণ পর রক্ত ঢেলে সূর্য বিদায় নিল। সন্ধ্যা নামতে দূরে নিওন সাইনের বিজ্ঞাপনগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠল। নীলাঞ্জন দীর্ঘক্ষণ ছই দেয়া নৌকা নোঙর করা বিদেশী জাহাজের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে ছল ছলাৎ শব্দ শুনল। একসময় মনে হল, গঙ্গেশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে চলে গেছে। এবার ঘরে ফেরা যেতে পারে।

ফিরতিপথে নীলাঞ্জনের কেবলই মনে হল, সানন্দা বোধহয় একটু বেশিরকম বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। নৈলে মাথার যন্ত্রণাটা কিছুতেই সারছে না কেন? এসবের মূলে বোধহয় নিঃসঙ্গতা। অথবা, একঘেয়েমির বাইরে নতুন—আস্বাদন তৃষ্ণা। হয়তবা বৈচিত্র্যপিপাসা।
ঢুলু ঢুলু চোখে দরজা খুলে দিল সানন্দা।
'কোন চিঠি আছে?'
প্রতিদিনকার মতো নীলাঞ্জন জিগ্যেস করল।
সুমুখে ঝুলে থাকা চুলগুলি আলতো করে সরিয়ে নিয়ে সানন্দা দাঁতে ঠোঁট কাটল। নিভু নিভু চোখের ইশারায় টেবিলের ওপর রাখা খামটা দেখাল।
নীলাঞ্জনের বুঝতে অসুবিধা হল না, চিঠিটা মুক্তির লেখা। সানন্দা যথারীতি পড়েছে।
'মুক্তি তোমাকে এখনও ভালবাসে। তাই না?'
নীলাঞ্জন চিঠিটা পড়ার আগেই সানন্দা প্রশ্ন করল।
প্রশ্নটা যেন নিস্তরঙ্গ জলে নুড়ি ছুঁড়ে ফেলা ঢেউ তুলল। নীলাঞ্জন ভাবল, মুক্তি কি এমন লিখেছে? এটাতো সত্য, মুক্তি টকটকে লাল যৌবনের টগবগে রক্ত সময়ের প্রেমিকা। ভালবাসলেই কী সবক্ষেত্রে বিয়ে করা যায়? নাকি বিয়ে না-হলে ভালবাসা নিস্তেজ নির্জীব নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে?
'হবে হয়তবা।' নীলাঞ্জন পাল্টা প্রশ্ন তুলল, 'তোমার কি মনে হয়?'
সানন্দা নির্বাক দুর্বোধ্য হাসল। নীল খাম থেকে চিঠিটা বের করে নীলাঞ্জনের সুমুখে ধরল। নীল খামে মুক্তি এক জায়গায় লিখেছে, 'তোমার মনের মতো শান্ত নিরিবিলি অপূর্ব সুন্দর একটা স্পটের সন্ধান পেয়েছি। ওখানে শুধু ভি আই পি-রাই থাকার সুযোগ পায়। অরিন্দমকে অফিসট্যুরে যেতে হয়েছিল। আমিও সঙ্গে ছিলাম। অরিন্দম বার বার তোমার কথা বলছিল। ওর লেখা সুপারিশপত্র পাঠালাম। আগাম বুক করে নিও। ওখানে ধারে কাছে ঘুরে দেখার মতো কিছুই নেই। তবু তোমার ভাল লাগবে। একা বসে লেখার অনেক সময় পাবে।'
হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে সানন্দাকে নিয়ে যাওয়ার কথা লেখেনি মুক্তি। কিন্তু এটাতো কোন আমন্ত্রণলিপি নয়। মুক্তি থাকছে না। অতএব সানন্দাকে অনায়াসেই সঙ্গে নেয়া চলে।
নীলাঞ্জন রাত্রে বিছানায় শুয়ে নানা কথার মাঝে সানন্দাকে একটা শের শোনাল,
''অ্যায় হুসন্, জী খোলকর আজ সতালে মুঝ্‌কো
কাল মেরী ঈশক্‌কা আন্দাজ বদল যায়গা।''
পরে তর্জমা করে সানন্দাকে বলল,
'তোমাকেও বলছি, যত পার আমাকে ব্যথা যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণের সাধ মিটিয়ে নাও। ভবিষ্যতে আমার প্রেমের প্রকৃতি বদলালে তুমি আমার প্রেমিকা না-থাকতেও পার।'
সানন্দার কণ্ঠে বিবাহিত স্ত্রীর অহং উছলে পড়ল,
'ভালবাসে অথচ বিয়ে করে না। ওড়ে কিন্তু ঘর বাঁধে না। খেলাঘর গড়ে অথচ সংসার ধর্ম করে না। ওসব ওদের জন্য লেখা।'
বিবাহিত জীবনে নীলাঞ্জনের উপলব্ধি, স্ত্রীর সঙ্গে ভালবাসা হল স্বার্থ নিয়ে হিসেব কষা। নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত নিঃসন্দিহান হয়ে তবেই কোন নারী অচেনা কোন পুরুষের গলায় মালা ঝুলিয়ে কপাল সিঁথিতে সিঁদুর নিতে সম্মতি জানায়।

‘এতই যদি অহংকারতো বলতে পার, স্বামীর সঙ্গিনী তুমি কতটুকু আর কতদূর পর্যন্ত?’
‘সুখ দুঃখ স্বর্গনরক সর্বত্র।’
‘ভাবাবেগে মিথ্যে বলছো সানন্দা।’ নীলাঞ্জন নিজ যুক্তির স্বপক্ষে রামপ্রসাদী গানের ক’টি লাইন উদ্ধৃত করল,
‘‘যার জন্য মর ভেবে
সেকি তোমার সঙ্গে যাবে
সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া
অমঙ্গল হবে বলে।’’
‘সবাইতো আর একরকম হয় না।’
‘অর্থাৎ তুমি তেমনটি নয়। বেশতো তাহলে মনে কর, আমি অসময়ে মারা গেলাম। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চোখের জলে তোমার বুক বানভাসি হল। আকাশের মেঘ শতছিদ্র হয়ে যাওয়ার মতো শব্দ করে তুমি যদি কাঁদ সেটা কি শুধু আমাকে মনেপ্রাণে ভালবাসতে বলে?’
‘তবে কি ঘেন্না করতাম তাই?’
‘কোনটাই না। আসলে, সন্তান নিয়ে বাকি জীবন কেমন করে কাটাবে সেই ভাবনায়। নিরাপত্তার অভাব বোধে। নানা অশুভ আশঙ্কার ভীতির সুতোয় টান পড়বে তাই।’
‘এই তোমার আবিষ্কার? মেয়েদের মন সম্পর্কে তোমার ধারণা দেখছি আগাগোড়া ভুলে ভরা।’
‘মানলাম। তবু আমার শেষ প্রশ্ন। মনে কর, আমার মৃত্যুর বেশ কিছু দিন পরে যখন তোমার জীবনে ক্রমশ স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে সেই সময়কার কোন এক হিমেল রাত। গাছের পাতায় টুপটুপ বৃষ্টি ঝরা শব্দের অন্ধকার। যদি তোমার বিছানার শিয়রের কাছে জানলায় আমাকে দেখতে পাও? আর আমি যদি নাভির প্রত্যন্ত থেকে নিঃশ্বাস খনন করে বলি, বড় নিঃসঙ্গ আমি। বিরহের দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি সানন্দা। তোমাকে আকাশ রথে উড়িয়ে নিয়ে যাব। একা আমাকে ফিরতে দেবে না তুমি?’
‘জানি না। যতসব আজগুবি অলক্ষুণে কল্পনা।’
নীলাঞ্জনের বুকে মুখ রাখল সানন্দা।
‘জান। কিন্তু চালাকি করে উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি।’
‘তুমিই বল, কি করব তখন আমি?’
‘আর্ত চিৎকার করে উঠবে। দু’গালে থাপ্পড় মারার মতো শব্দ করে জানলার কপাট বন্ধ করে দেবে। পরদিন ভোর হলে স্বামীর প্রেতাত্মা তাড়াতে নানারকম ক্রিয়াচারের প্রস্তুতি নেবে। স্বর্গনরক কোথাও আমার সঙ্গিনী হতে চাইবে না তুমি।’
সানন্দা কোন জবাব খুঁজে পেল না। শরীর শিথিল হয়ে আসছিল। দু’হাতের সাঁড়াশিতে নীলাঞ্জনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। অস্ফুট শব্দ করল।
‘ভগবান যেন আমাকে আগে নিয়ে যায়।’
‘তেমন ভাগ্য ক’জনের কপালে জোটে? দেশে বিপত্নীকদের চাইতে বিধবার সংখ্যা হাজার গুণ বেশি।’
‘এতই যতি জানতো, কতদুর কি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছ অভ্র আর আমার ভবিষ্যতের জন্য?’

'আমার জীবনদর্শন সম্পূর্ণ অন্যরকম। মানুষের দায় দায়িত্ব কর্তব্য শুধু জীবিতকালে। আমার ঘাম রক্ত চোখের জলের সঞ্চয় কোন পরপুরুষ ভোগ করবে আমি তা চাই না।'
সানন্দা গূঢ় অর্থটা ধরতে পেরেও গায়ে মাখল না। কিন্তু কণ্ঠস্বরে ঝাঁজ এড়াতে পারল না। 'আমাকে নাহয় বাদ দিলে। রক্ত সম্পর্কের সন্তান অভ্রর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে জন্মদাতার কর্তব্য কিছু নিশ্চয়ই আছে?'
'যৎসামান্য নিশ্চয়ই পাবে। নয়ত বিনা পরিশ্রমে বেশি কিছু পেয়ে গেলে বিলাসিতার অপব্যয়ে বখে যেতে পারে। আমার বাবা বলতেন, "স্ট্রাগল ছাড়া জীবনের কোন মূল্য নেই। পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকারী হিসাবে পাওয়ার চাইতে নিজের প্রচেষ্টায় সামান্য কিছু করতে পারার মধ্যে আনন্দ গৌরব ঢের বেশি।" আমি চাই না অভ্র সেই আনন্দ গৌরব থেকে বঞ্চিত হোক।'
'এরকম ভাবনা অক্ষম দুর্বল পুরুষদের সান্ত্বনা মাত্র। মিছিমিছি জীবন দর্শনের দোহাই দিয়ে পার পেতে চেও না। তোমার ওই কপালে নেই, ভাগ্যে নেই, ভগবান না দিলে কি করব ইত্যাদি শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগে না।'
নীলাঞ্জন আশঙ্কা করল, সানন্দা এবার নিশ্চিত মেজাজ আরও রুক্ষ করবে। অশালীন গালমন্দ শুরু হতে পারে। তাই আর কোন কথা জুড়ল না। নিশ্চুপ হয়ে বাবাকে স্মরণ করল। তিনি কী অক্ষম পুরুষ ছিলেন? নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যই কী হামেশা বলতেন, "সংগ্রামী হওয়াই সত্যিকার পুরুষের লক্ষণ। তিনিই আদর্শ বাবা যিনি সন্তানের জন্য উপযুক্ত ভিত তৈরীতে সচেষ্ট থাকেন। যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত শক্ত সমর্থ চরিত্রের ভিত। সেই ভিতে প্রাসাদ কিংবা কুটির গড়ার দায়িত্ব কৃতিত্ব সন্তানদের।"

।। সাত ।।

নীলাঞ্জনের জীবনে এখন সানন্দা মুক্তি মৃত্তিকা—ত্রিবিধ নারী। তিনজনের কাছেই সে একজন দুর্বল অক্ষম ভীতু পুরুষ।
গুণের সমষ্টি সংযমী মনের পবিত্রতা সৃষ্টির তৃপ্তি সেবাধর্মের সুখ শরীরের যে সৌন্দর্য বাড়ায় নীলাঞ্জন হয়ত তার অধিকারী নয়; কিন্তু মানুষ মাত্রেরই নিজস্ব বিশেষ কিছু উজ্জ্বল বৈচিত্র্য থাকে যার নাম আমিত্ব। এই আমিত্ব যার ভেতর যত বেশি থাকে সে তত ব্যতিক্রম, অর্থাৎ অসাধারণ।
নীলাঞ্জন অসাধারণ ব্যক্তিপুরুষ। তার কাছে দারিদ্র্য হল অহংকার অলংকার বিশেষ। কষ্টজ্বালা যন্ত্রণা এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা বিলাসিতা স্বরূপ। আর ব্যক্তিত্বে সাধারণ মানুষের চেয়ে ব্যতিক্রম।
নীলাঞ্জনের নিজস্ব একটা জগত আছে। স্বপ্নময় সেই জগতে সানন্দা সংসার সন্তান থাকে না। সে নিঃসঙ্গ একা। মুক্তি মৃত্তিকা-ঢেউ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ করে অনেক কাছে এসেও স্পর্শ করতে পারে না। যদি ইচ্ছে হয়, নীলাঞ্জন নিজের মনের রং রূপ রসে কল্পিত কাউকে কাছে এনে সাজায় হাসায় কাঁদায়। ভাঙে গড়ে পরিতৃপ্ত হয়। সুখী না হোক অন্তত সার্থক হয়ে ওঠে।
নীলাঞ্জন এখন নিরুত্তাপ ব্যথাহীন। সেদিনের পর থেকে মৃত্তিকা আর ধারে কাছে আসে না। ওর জানলায় দেখাও দেয় না। হয়ত মুক্তি কিছু বলেছে বলেই। মুক্তি নিজেও মন্দির থেকে

ফিরে আসার পর কেমন যেন এড়িয়ে চলছে। সলজ্জ চোখ ফিরিয়ে প্রয়োজনীয় কথাটুকুই বলে। আজ অরিন্দমের ফিরে আসার তারিখ বলে কী?
সকালের সোনা রোদ্দুর গায়ে মেখে সামনের বারান্দায় ধূমায়িত চা খাচ্ছে নীলাঞ্জন। খবরের কাগজ হাতে। হিংসা হানাহানি ধর্ষণ আর জাত ধর্ম নিয়ে নানা সংঘর্ষের ঘটনা পড়ছে। বঞ্চনা শোষণ আর অধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনের ওপর একটা রচনা পড়তে পড়তে মন বলছে, সত্যিকার সাম্য হল ফুল সাজানো একঘাটের খাটে। চিতার আগুনে—পঞ্চভূতে। অথবা, কফিনে কবরে মাটিতে মিশে গিয়ে।
জীপের হর্ণ শুনে নীলাঞ্জন দৃষ্টি ফেরাল।
অরিন্দমকে আনতে দিলদার স্টেশনে যাচ্ছে। নিজের সীটে বসেই দিলদার জানাল, 'তো আপনাকে নিয়ে যেতে আস্‌লুম। একেলা বৈঠে থেকে কি আর করবেন। এক দফে ঘুরেফিরে আসবেন চলুন।'
দু'দিন যাবত এখানকার বাতাসটা গুমোট ভারী লাগছে। দিলদারের আন্তরিকতায় নীলাঞ্জন খুশিই হল। একডাকে সাড়া দিয়ে ওর পাশে গিয়ে বসল।
দিলদার যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে বেরিয়েছে বলে জীপ চালাচ্ছে উদাসী বাতাসের মতো। নীলাঞ্জনকে বিষণ্ণ চুপচাপ অন্যমনস্ক দেখে জিগ্যেস করল, 'ওতো কি ভাবছেন বাবুসাব?'
ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে নীলাঞ্জন সপ্রতিভ হতে চাইল, 'কিছু ভাবছি নাতো। দু'দিকের দৃশ্য দেখছি।'
'দেখছেন বটে, লেকিন তবিয়ত মালুম হচ্ছে ঠিকঠাক না আছে।'
'আরে না না শরীর ভালই আছে।'
'তব্ কিউ বিলকুল চুপচাপ বৈঠে আছেন? কুছ্‌তো বলুন।'
দ্বিধাদ্বন্দ্বে কিছু সময় নিয়ে নীলাঞ্জন বলল, 'যদি নারাজ না হও তো এক বাত্ পুছব দিলদার?'
সুমুখ থেকে এক ঝলক মুখ ফেরাল দিলদার। কৌতূহলী চোখের পাতা মেলে বলল, 'হা হা আরামসে পুছুন।'
'তোমাদের বিচ্ছেদ হয়েছে বটে। কিন্তু মরিয়মকে ভুলতে পেরেছ কী?'
নীলাঞ্জনের গলার আঁচ আর বিষণ্ণ শ্বাস দিলদারকে স্পর্শ করল। এমন একটা ভাবান্তর করল যার অর্থ দাঁড়ায়, চতুর চালাকি প্রশ্নের গূঢ় অর্থটা সে ধরতে পেরেছে।
সামনের দিক থেকে দুরন্তগতিতে একটা ট্রাক আসতে দেখে দিলদার তাৎক্ষণিক জবাব দিল না। সাইড নিয়ে পার হয়ে বলল, 'উদাসী বাত্ করছেন কেন বাবুসাব?'
নীলাঞ্জন শিশু সারল্যে নিজেকে উন্মুক্ত করল না। এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু তুমি দাওনি এখনও।'
'কৌনসা?'
'মরিয়মকে কী তুমি ভুলতে পেরেছ?'
দিলদার যুতসই শের শুনিয়ে জবাব দিল,
"সব্‌সে উলফৎ সহি মুঝসেহি মুহব্বৎ না সহি
ম্যায় তুম্‌হারী হুঁ, এহিঁ মেরা লিয়ে কেয়া কম হ্যায়
তুম মেরে হোকে রহো, এ মেরী কিসমৎ না সহি।
তুম মুঝে ভুলভি যাও এ হক্ হ্যায় তুম্‌কো,
মেরি বাৎ ঔর হ্যায় ম্যায়নেতো মুহব্বৎ কি হ্যায়।"

নীলাঞ্জনের সুবিধার জন্য মরিয়মের সঙ্গে এখনকার সম্পর্কটা নিজের মতো তর্জমা করে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'বলব কি বাবুসাব, সবার সাথ্ ওর সম্পর্ক আছে। লেকিন হামার সঙ্গে মুহব্বৎ নেই। আমাকে ভুলে যাওয়ার হক্‌তো আছে। মরিয়মকে পাওয়ার কিসমত্ না থাকলে কি হবে, হামি ওরই আছি। যদি সাচ্ মুহব্বৎ করব তো ভুলব কেমন করে।'

সানন্দা সম্পর্কে নীলাঞ্জনের মনে বাংলা কবিতার ক'টি লাইন গাঁথা আছে,

"...তুমি কোন প্রেমিকের যোগ্য হতে
পারবে না যেহেতু তুমি দু'বাহুর আশ্লেষে জাগাবে
নানা পুরুষের রক্ত অন্ধকারে, উল্লাসে, আলোতে।"

এই মুহূর্তে দিলদারকে অনেক উঁচুমানের মানুষ মনে করল নীলাঞ্জন। ক্ষমায় ভরা ওর হৃদয় মহৎ উদার পবিত্র। কষ্ট-প্রেমের দহনে সোনার মতো উজ্জ্বল। শ্রদ্ধায় আনত নীলাঞ্জন বলল, 'তোমার ভালবাসার তুলনা হয় না দিলদার।'

দিলদার উৎসাহিত হয়ে বলল, 'শুনেছি আপনি কাহানী লেখেন। মরিয়মকে নিয়ে কাহানী লিখবেন তো বহুত শের শোনাব। যদি শের শুনতে পছন্দ হয় তবেই।'

'তোমার মুখ থেকে শের শুনতে আমার খুব পছন্দ।'

'সাচ্!'

খুশিতে দিলদারের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

স্টেশনের বাইরে ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় জীপ থামাল দিলদার। ধারে কাছে কয়েকটি অপরিচ্ছন্ন চা পান বিড়ির দোকান। আর একটা মিষ্টান্ন ভান্ডার।

জীপ ট্রাকের চাকায় ওড়ানো আবীরের মতো ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে দিলদার বলল, 'এট্টু চা খাবেন বাবুসাব?'

'খেলে হয়।'

দিলদার হাঁক দিয়ে দু'গ্লাস চা নিল। সঙ্গে স্থানীয় বেকারীর তৈরী ভারী মোটা বিস্কুট। চায়ে চুমুক দিয়ে দিলদার বলল, 'আপনি ভি মুহব্বৎ করে ঠোক্কর খেয়েছেন কিনা জানি না। হামি জরুর খেয়েছি। পহলে বহুত দুঃখ্ হতো।'

মাথার ওপর দিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করে উড়ে যাওয়া একঝাক টিয়া পাখির দিকে তাকাল দিলদার।

'এখন বুঝি আর দুঃখ নেই?' নীলাঞ্জন জানতে চাইল।

দিলদার কোন উত্তর দিল না। ছোকরা ছেলেটাকে চা বিস্কুটের দাম চুকিয়ে সীটে গা এলিয়ে বসল। কমদামী প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বলল, 'আপনিতো দামী সিগ্রেট খান।'

অর্থটা ধরতে পেরে নীলাঞ্জন হাত বাড়িয়ে ওর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিল। খুশিতে দিলদার আগুন ধরিয়ে দিল। দিল খুশ ধোঁয়া উড়িয়ে শের শোনাল,

"এক উনওমা কা জরুরৎ হ্যায় কাহানীকে লিয়ে,
এক সদ্মা কে জরুরৎ হ্যায় জোয়ানীকে লিয়ে।"

'বলুন বাবুসাব, ই শের শোনকর ঠোক্কর খানেওয়ালা আদমীর কুছ দুঃখ্ থাকতে পারে?'

'মতলবটা যে সমঝে উঠতে পারলাম না, দিলদার ভাই।'

'সিধা মতলব। কাহানীর জন্য এক নামতো লিখতে হবে। জোয়ানী পুরা কোরতে ঠোক্করখানা ভি দরকার হয়।'
নীলাঞ্জন বোবা বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে দিলদারের দিকে তাকিয়ে রইল।
দূর থেকে ট্রেনের ক্ষীণ শব্দ শুনে দিলদার বলল, 'মালুম হচ্ছে ট্রেন আসছে। আপনি বসে থাকুন। হামি প্লাটফর্মে যাচ্ছি। সাহাবের সামান থাকবে।
নীলাঞ্জন জীপে বসে রইল না। ডাল পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কাক পাখিদের ভয়ে ঝাঁকড়া গাছের নিচেও দাঁড়াল না। দু'টি ঝুপড়ি দোকান ঘরের মাঝের ফাঁক দিয়ে সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল। একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসল।
স্বচ্ছ পোশাকের মতো মিঠে রোদ্দুরের সকাল। সামনে প্রসাধনহীন প্রকৃতি। দূরে স্বপ্নালু মালভূমি। নিকটেই সবুজ শস্যক্ষেত। আড়মোড়া ভাঙা আটপৌরে গ্রাম। কলকাকলি মুখর শালবন। নীল আকাশে শাদা বকের সারি।
নীলাঞ্জনের প্রাণের শিরা চঞ্চল হয়ে উঠল। মন উথল হল। স্মৃতিময় যৌবন কাছে এসে দাঁড়াল।
স্বপ্ন ছিল, একান্ত নিজস্ব একখানা ঘর। সেই ঘর হয়ে উঠবে রেকর্ড মিউজিয়াম বইয়ের লাইব্রেরী। থাকবে, লেখা আঁকার সামগ্রী। সেই বন্দনা ঘরে অন্য কারও প্রবেশাধিকার থাকবে না। স্বপ্ন ছিল, ফুল বাগিচা সবুজ লন ছোট্ট কুটির। থাকবে, শাদা বেতের চেয়ার। শরতের ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্নায় হিম হিম সন্ধ্যায় নীল আকাশ থেকে গাছের ওপর ঝুলবে চকচকে থালার মতো চাঁদ। সেই থালা থেকে দুধ ঝরে ভিজিয়ে দেবে প্রকৃতি। বাতাসে ভাসবে শিউলি ফুলের সুবাস। নিজের পরনে থাকবে গরম চাদর জড়ানো ফর্সা ফিনফিনে কুর্তা পায়জামা। একের পর এক গেয়ে যাবে রবীন্দ্রগীতি। সেই গান শুনে অন্দর থেকে অ্যাকশান রিপ্লের মতো আধা উড়ন্ত ছন্দভঙ্গিতে ভাসতে ভাসতে প্রাণ-প্রেয়সী বেরিয়ে আসবে। উড়ন্ত নিশানের মতো তার রেশমি আঁচল। রহস্যঘন রাত্রির মতো এলো চুল। ঈষৎ সুর্মা কাজল টানা সলজ্জ চোখ। উষ্ণতায় উজ্জ্বল ঠোঁট। শিরায় শিরায় রক্তদৌড়। উদ্বেলিত বাসনায় পায়ের বাজুতে বাজবে রুম ঝুম রুম ঝুম। সুগন্ধী পারফিউমের সুবাস ছড়িয়ে সে কাছে আসবে। পিছন থেকে কলমিলতা হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরবে। এক সুরের গানে গলা মেলাবে।
এসবতো স্বপ্ন কল্পনা মাত্র। যে ভালবাসায় আত্মসুখ বিসর্জন, আঘাত-যন্ত্রণা, ভুল বোঝাবুঝি-ক্ষতি, অহেতুক কষ্টশাস্তি নেই—সে কেমন ভালবাসা! সে শুধু বিস্বাদ বিবর্ণ বৈচিত্র্যহীন।
নীলাঞ্জনের পছন্দ শিউলি বেল রজনীগন্ধা। মুক্তির ভাল লাগে হলুদ ফুল। টকটকে লাল গোলাপ ভালবাসে সানন্দা।
সানন্দার স্বপ্নটা অন্যরকম। একতলা বাড়ি কোনমতেই নয়। সামর্থে অকুলান হলে অন্তত থামের ওপর দো-তলা বাড়ি চাই-ই-চাই। সেই বাড়িতে থাকতে হবে, সৌখিন কিচেন বিলাসী স্নান ঘর। শার্সি জানলায় চাই দামী চেকনাই পর্দা। মেঝেতে বাদশাহী কার্পেট। আধুনিক আসবাব পত্রে সাজানো হবে সব ঘর। ভিসিআর টেপডেক ওয়াশিং মেশিন এয়ার কুলার ফ্রিজ ইত্যাদি তো রাখতেই হবে। সাজতে ভালবাসে বলে সাজঘরটা সম্পূর্ণ আলাদা হলে ভাল হয়। বিলিতি কাঁচের আয়না গাঁথা সাজার টেবিল জুড়ে থাকবে দিশি বিদেশি কস্‌মেটিকস্

ওডিকোলন সেন্স এসেন্স পারফিউম। কাজল সুর্মা আতর। আইলাইনার আইশ্যাডো মাস্‌কারা। রুজ লিপস্টিক লিপ গ্লস মেহেন্দি বিন্দি কুমকুম রোলি ইত্যাদি ইত্যাদি কত যে কী!
'বাবু সাব।'
দিলদারের ডাক শুনে নীলাঞ্জন চমকে উঠল। জীপের ধারে কাছে অরিন্দমকে দেখতে না পেয়ে জিগ্যেস করল, 'সাহাব কোথায়?'
'আয়া নাহি। হো স্যাক্‌তা দপ্তরমে ফের কুছ নয়া ম্যাসেজ আয়া হোগা।'

ঠিক তাই। অরিন্দম এলেন আরও দু'দিন পর। ট্রেন থেকে নেমে ভায়া অফিস হয়ে বাংলোয় ফিরলেন। ট্রেন জার্নি আর অফিসের কাজে ক্লান্ত বিধ্বস্ত থাকায় নীলাঞ্জনের সঙ্গে তেমন আন্তরিক হতে পারলেন না। সৌজন্যমূলক বাক্যবিনিময়ের সময় মুক্তিকে যে সংবাদটা শোনালেন নীলাঞ্জন তাতে খুশি হতে পারল না।
অরিন্দম নাকি ওর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সপরিবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন, ভীড়ভাট্টা হৈ হট্টগোল থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার জন্য এই জায়গাটা আইডিয়াল। বুকভরা বাতাস পাওয়া যাবে।
আমন্ত্রিত সেই বন্ধু সপরিবারে আসছেন। খবরটা শোনার পর থেকেই নীলাঞ্জন বিমর্ষবোধ করছে। আজ সেই দিন, যেন কালাপাহাড় বা বর্গী আসবে আজ। নয়ত কী?
বিকেলে লনে পায়চারী করছে নীলাঞ্জন। ভাবছে, বিশেষ আদর যত্ন আপ্যায়নে একচ্ছত্র রাজত্বে বেশতো কেটে যাচ্ছিল। সকালে শুকতারা বিকেল গড়ালে সন্ধ্যা তারা দেখা। সুন্দর গড়িয়ে যাচ্ছিল, স্নিগ্ধ সকাল প্রশান্ত দুপুর বিষণ্ণ বিকেল নির্জন রূপোসী রাতের অন্ধকার। ওরা আসার পর সবকিছু ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে। অরিন্দম হয়ত ওদেরকে নিয়েই মেতে থাকবেন। আর মুক্তি?
অরিন্দম এলেন। একসঙ্গে চা জলখাবার খেলেন।
নীলাঞ্জন যে ট্রেনটাতে এখানে এসেছিল ওরাও ওই একই ট্রেনে আসবেন। ট্রেনটা আজ লেটে রান করছে বলে খবর আছে। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলেন অরিন্দম।
মুক্তি স্টেশনে গেল না। অরিন্দমের অনুরোধে নীলাঞ্জনকে যেতে হল। আজ কোম্পানীর স্টেশন ওয়াগনের চালক অরিন্দম নিজে।
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ রাতের অন্ধকারের চাদর ঢাকা স্টেশনে ট্রেন ঢুকল। অরিন্দম পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ নিয়ে এসেছিলেন। সেই আলোর পথ ধরে বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে কাছে এসে দাঁড়াল। পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'আঙ্কেল, আমি নীতু। চিনতে পারছেন?'
'অফকোর্স। কিন্তু ওরা কোথায়?'
'প্লাটফর্মে আলো নেই বলে দেরী হচ্ছে।'
নীলাঞ্জন মৃদু আলোর বাতিস্তম্ভের নিচে একা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা টর্চের আলোর সিগন্যাল অনুসরণ করে এগিয়ে এল। অরিন্দম ওদের সকলকে নীলাঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় করালেন, 'আমার বন্ধু প্রীতিন। ওর স্ত্রী তণিমা। ওদের ছেলে নীতিন আর মেয়ে তিস্তা।'
ওরা একে একে উইস করল।

তিস্তার বয়কট শ্যাম্পু চুলে অরিন্দম আদর করলেন, 'তুইতো রীতিমতো লেডি হয়ে গেছিস তিতু!'
তিস্তা ফিক করে এক ঝিলিক হাসল।
সকলের নজরই ঘুরে ফিরে নীলাঞ্জনের দিকে। চোখের কোণে প্রশ্ন, ইনি কে?
প্রশ্নটা অরিন্দম ধরতে পারলেন। নিজের ত্রুটি স্বীকার করে বললেন, 'ইনি নীলাঞ্জন নন্দী। বিখ্যাত নাহলেও শক্তিমান লেখক। ভাল শিল্পীও বটে। মুক্তির পুরনো বন্ধু হলেও এখন আমার বেশি কাছের। প্রিয় বন্ধু সখা আমার।'

উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মুক্তি। ওরা সকলে হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকে গেল।
বুধুয়া একে একে ভি আই পি স্যুটকেশ ডাকব্যাকের এয়ার ব্যাগ এটাচিকেসগুলি ভেতরে নিল। একা নীলাঞ্জন শুধু বাইরে রইল।
উচ্চকিত হাসি আনন্দ চিৎকার শুনে নিজেকে নীলাঞ্জনের এখন নিঃসঙ্গ নির্বাসিত মনে হচ্ছে। এক্ষুণি দোতলায় কাঁচঘরে চলে যেতে মন চাইছে। কিন্তু সেটা দৃষ্টিকটু অভব্যতা হবে ভেবে বারান্দার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল।
ওরা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন হয়ে পোশাক পাল্টাতে বেশি সময় নিল না। অল্পক্ষণ পরেই ফের হৈ হৈ করে বাইরে বেরিয়ে এলো। আলোময় লনে বৃত্তাকারে বসানো বেতের চেয়ারগুলিতে গিয়ে বসল। চা জলখাবার খেল। তারপর হাসি ঠাট্টা গল্প গুজবে মেতে উঠল।
নীতু তিতু এখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো। দৌড়ঝাঁপ ছোটাছুটি করছে। তণিমা বাগিচায় হরেক ফুলের গাছ দেখে উচ্ছ্বসিত। কিশোরী চাপল্যে একটা ফুল ছিঁড়ে চুলে গুঁজল।
প্রীতিন মন্তব্য ছুঁড়লেন, 'গাছ থেকে ছিঁড়ে নেয়া ফুলের সৌন্দর্য থাকে না। ফুল ছিঁড়লে খুনী খুনী মনে হয় আমার।'
তণিমা তাৎক্ষণিক জবাব দিল, 'রোজ যেভাবে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাও তাতে তোমার মুখে ওসব কাব্যকথা মানায় না।'
অরিন্দম হো হো করে উচ্চকিত হেসে উঠলেন।
রাতের গাছেদের মতো গম্ভীর নীরব মুক্তি মুখ খুলল, 'সকলের সামনে এভাবে লজ্জা দেয়া উচিত মনে হচ্ছে না।'
হঠাৎ তণিমার খেয়াল হ'ল, অদূরে বারান্দায় তৃতীয় একজন ব্যক্তিও আছেন। ওঁর কানে পৌঁচেছে কি?
তণিমা দাঁতে জিভ কেটে মুক্তিকে ফিসফিসিয়ে কিছু কথা বলল। মুক্তি চিৎকার করে ডাকল, 'নীলাঞ্জন তুমি একা বসে আছ কেন? এখানে এসো।'
অরিন্দম রীতিমতো শাসনের গলায় বললেন, 'আচ্ছা বেরসিক মানুষতো আপনি! লিখতে বলেছি বলে কি সবসময় মাথায় শুধু লেখা নিয়ে একা একা থাকবেন? এক্ষুণি চলে আসুন। নয়ত সবাই মিলে তুলে নিয়ে আসব।'
নীলাঞ্জন দ্বিধা সঙ্কোচে গুটিয়ে ছিল। আর একা বসে থাকা নিরাপদ মনে করল না। ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে এসে বসল।

প্রীতিন জিগ্যেস করলেন, 'কি লেখেন আপনি, নভেল?'
নীলাঞ্জন জবাব দেয়ার আগে তণিমা মুখিয়ে উঠল, 'তোমার যত হাঁদার মতো প্রশ্ন। নভেলিস্টদের চাইতে লেখক পরিচয়টা অনেক বড়। স্টেশনেই তো শুনলে, উঁনি একজন শক্তিমান লেখক। ভাল শিল্পীও। তোমার মতো হার্টলেস সার্জিক্যাল ডাক্তার না।'
প্রীতিন কোন প্রতিবাদ করলেন না। তণিমা ঝুঁকে পড়ে মুক্তিকে কিছু একটা বলল। তারপর হঠাৎই দু'জনে আবেদন অনুমোদন করিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আসর ছেড়ে ঘরের দিকে গেল। সুযোগ বুঝে প্রীতিন বললেন, 'আগাম আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল, মিসেসের কিছু কিছু আচরণ হয়ত আপনাকে অবাক করবে। আপনি ডিসটার্ব ফিল করতে পারেন। কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। মোটেই সিরিয়াসলি নেবেন না যেন।'
'কিছু কিছু আচরণ বলতে?' নীলাঞ্জন কাহিনীর চরিত্র সন্ধানী হয়ে উঠল।
'এই ধরুন যেমন, হঠাৎ হঠাৎ মাথা গরম করে ফেলল। কখনও বা একটা ঘোরের মধ্যে থেকে বড্ড বেশিরকম চাটুকারিতা শুরু করল। আর যদি বুঝল, কেউ ওকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে নাতো হুটহাট বেঁফাস গালমন্দ করে বসল। যদি নিজের ভুল বুঝতে পারল তো পরক্ষণেই অনুশোচনায় কেঁদেও ফেলল। বেসিক্যালি ওর মনটা কিন্তু ভাল। যথেষ্ট উদার উপকারী। অন্যকে খুশি করতে বা তার মন রাখতে এত অস্বাভাবিক ব্যস্ত হয়ে ওঠে যা সচরাচর দুর্লভ।'
এই পর্যন্ত সানন্দার মানসিকতার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়ে নীলাঞ্জন কৌতূহলী প্রশ্ন করল, 'আপনি একজন ডাক্তার বলেই যদি জিগ্যেস করি, এটা কী এক ধরণের মানসিক রোগ?'
'অফকোর্স। আমার মনস্তাত্বিক ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছি, রোগটার নাম হল 'মিথোম্যানিয়া।' সাধারণত যারা ছোট বয়সে কাজের কোন প্রশংসা পায় না, বকুনি খেয়ে অনাদরে অবহেলায় বড় হয়ে ওঠে তারাই এই রোগের স্বীকার হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আমার মিসেসের ক্ষেত্রেও কারণটা ঠিক তাই।'
নীলাঞ্জন যতদূর শুনেছে জেনেছে, অকালে মা মারা যাওয়ার পর সানন্দা ছোট বেলায় কিছুদিন নাকি ওরকম কষ্টের মধ্য দিয়েই কাকাদের কাছে বড় হয়েছে। তাই উৎসাহিত হয়ে ফের জিগ্যেস করল, 'এতক্ষণ যা কিছু বললেন তা ছাড়াও আর কোনও সিমটম আপনার জানা আছে?'
'আছে। বাট আই এ্যাম লাকি এনাফ যে, আমার মিসেসের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর মারাত্মক দোষগুলি নেই। থাকলে যে কি হতো কে জানে?'
'তাহলেতো আপনার বলতে বাধাও নেই? জাস্ট জানতে চাইছি। অন্য কোন মোটিভ নেই।'
'মোটিভ মোটেই নেই ভাবব কেমন করে? রাইটাররা গল্পচ্ছলে অনেক কিছু জেনে নেয়। তারপর লেখার ভেতর এমনভাবে ঢুকিয়ে দেয় যে পাঠকরা মনে করে, দারুণ পান্ডিত্য অসাধারণ অভিজ্ঞতার অধিকারী।'
'অস্বীকার করছি না। ধরে নিন এক্ষেত্রেও আমার উদ্দেশ্য তাই। তাহলে কী বলবেন না?'
'বলব না কেন? মগজে যখন একবার ঢুকেছে তখন অন্য কাউকে ধরে বা বই পড়ে ঠিকই জেনে যাবেন।'
'তাহলে বলুন।'

'মিথোম্যানিয়াকেরা নিজেদের বানানো ইমেজ দিতে ভালবাসে। অন্যের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য রাইট এ্যান্ড লেফট্ মিথ্যা কথা বলে। অত্যন্ত চাটুকারিতা অভিলাষী হয়। নিজের প্রশংসা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এমনিতে নোংরা আগোছালো হলেও বাইরের সাজগোজে দারুণ ফিটফাট থাকে। এগুলি অবশ্য অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই কম বেশি থাকেই। টলারেবল লিমিটের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু যেটা জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারে তা'হল, মিথোম্যানিয়াকেরা এত বেশি কামুক প্রকৃতির হয় যে অনেক সময় বিকৃতকামী হয়ে পড়ে।'
নীলাঞ্জন আর কোন প্রশ্নে গেল না। সানন্দা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে বিমর্ষ উদাসী হয়ে পড়ল। তণিমা টগবগিয়ে ফিরে এল। হাতে এক বোতল হোয়াইট হর্স। বোতলটা অরিন্দমের সামনে টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'আপনার জন্য এনেছিলাম। এখন একা আপনাকে নয় লেখককেও প্রেজেন্ট করলাম।'
'আমিতো এরসে বঞ্চিত।' অরিন্দম ফের সংশোধন করে বললেন, 'প্রীতিন হয়ত জানে না, অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। এখনতো আমার ঘরে সিগারেট এ্যাসট্রে পর্যন্ত থাকে না।'
নীলাঞ্জনের দিকে চোর চোখে তণিমা তাকাচ্ছে। দুষ্টুমিষ্টি হাসছে। লাইটারের ফুয়েলের মতো স্নিগ্ধ হলেও সেই হাসিতে দহন ক্ষমতা আছে।
নীলাঞ্জনের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে তণিমা শ্রাগ করে বলল, 'লেখকও এরসে বঞ্চিত নয়ত?'
'সুন্দর পরিবেশ গুড কম্প্যানী পেলে চলে। সব কিছুই স্থান কাল পাত্র নির্ভর।'
'পরিবেশতো এখানে ফ্যানটাসটিক।' ফের শ্রাগ করে তণিমা বলল, 'রোমান্টিক অলসো।'
মুক্তি ফিরে এল। সঙ্গে বুধুয়ার হাতে ট্রের ওপর জল গেলাস আইস-স্যালাড স্ন্যাক্স। টেবিলে নামিয়ে রেখে মুক্তি বলল, 'এবার তুমি ফ্রাইড চিকেনের ডিসটা নিয়ে এস।'
প্রীতিন উচ্ছ্বসিত। নীলাঞ্জনকে উৎসাহিত করে তুলতে বললেন, 'কম্প্যানী হিসেবে আমরা মোটেই খারাপ নয়। কলকাতায় ফিরে গিয়ে যোগযোগ রাখবেন। আমার বাড়িতে প্রাইভেট বার আছে। তণিমা এমন ডেকরেশন করে দেয় যে, পরিবেশটা চটকদার রোমান্টিক হয়ে ওঠে। ওর সার্ভতো রীতিমতো সুপার্ব।'
আসরে অল্পক্ষণের আলোচনাতেই নীলাঞ্জন বুঝতে পারল, প্রীতিন দম্ভহীন পান্ডিত্যে ভরপুর। চাতুর্যহীন বুদ্ধি দীপ্ত খোলা মনের মানুষ। তণিমা সম্পূর্ণ বিপরীত। অনর্গল কথা বলতে অভ্যস্ত। শূন্য কলসির মতো শব্দ ছড়ায়। ফড়িং-এর মতো ফরফরায়। সপ্রতিভ চঞ্চলা পঞ্চদশীর মতো স্বপ্নের পাপড়ি মেলতে ভালবাসে।
এসবতো বটেই তণিমার আকর্ষণীয় ঠোঁট চটকদার সাজপোশাক প্রসাধন আর কথা বলার ভঙ্গীর সঙ্গে সানন্দার আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পাচ্ছে নীলাঞ্জন। এই শ্রেণীর রমণীরা যেকোন পুরুষকে সহজে কাছে টানতে সক্ষম, নীলাঞ্জন তা টের পাচ্ছে।
দোলনা থেকে নেমে নীতু তিতু কাছে এসে বসল। নীতু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এখানকার জলে নিশ্চয়ই হাই ডাইজেস্টিং পাওয়ার আছে। তা নাহলে এক্ষুণি আবার খিদে পেয়ে গেল কেন।'
রাতের খাওয়া সেরে নীতু তিতু শুতে গেলেও নীলাঞ্জন ছাড় পেল না। তাসের আড্ডায় বসতে বাধ্য হল।

তণিমা অংশ নিল না বটে, কিন্তু নীলাঞ্জনের গা ঘেঁষে হারজিৎ-এর উষ্ণ উত্তেজনার ভাগ নিচ্ছে।
মুক্তি অল্প কিছু হেরে যাওয়ার পর থিতু দিল। কিছুক্ষণ পর অরিন্দমও সরে দাঁড়ালেন। নীলাঞ্জন বেশ কিছুটা এগিয়ে। কিন্তু, প্রীতিন নাছোড়বান্দা। বিস্তর হারের বোঝা কাঁধে নিয়েও লড়ে যাচ্ছেন। উত্তেজনায় সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন লাগাতার।
তণিমা একসময় প্রীতিনের সিগারেট প্যাকেটটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'ট্রেনে আজ অনেক খেয়েছ। বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'
প্রীতিন কোন প্রতিবাদ করলেন না। কারণ জানেন, কিছু বলতে যাওয়া মানেই অশান্তি ডেকে আনার পথ খুলে দেয়া। খেলা পন্ড। বিপুল অংকের টাকা লোকসান। দু'জনের লাভ লোকসানের অংকটা যখন সমপর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তখন রাতের টহলদারের ঘণ্টা জানাল, বারোটা বাজল।
হাই তুলে অরিন্দম অনুরোধ জানাতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই বন্ধ হল।
নিজের ঘরে ফিরে নীলাঞ্জন কাগজ কলম নিয়ে বসল। কলমের ডগায় মুক্তি আর সানন্দা চরিত্র দু'টিই বারবার ঘুরে ফিরে এলো।

।। আট ।।

বাংলোটা একটা টিলার ওপর। নিচে জনপদ থেকে খাঁড়াই সিঁড়িটি বাংলোয় পৌঁছানোর জন্য সহজ সোজা সংক্ষিপ্ত পথ। গাড়িতে যাওয়ার জন্য ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে পাকদন্ডী মসৃণ প্রশস্ত পথও আছে।
স্টেশন থেকে ভাড়া করা প্রাইভেট গাড়িটা বাংলোর চৌহদ্দির মূল ফটকে দাঁড়াতে দারওয়ান এসে সুমুখে সেলাম ঠুকল। নীলাঞ্জন পরিচয়পত্র দেখাতে ফটক খুলে দিল।
ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর বাংলো। চারদিকে হরেক রকম বর্ণালী ফুলের সমারোহ। বাহারী পাতার গাছ অজস্র। কৃত্রিম জলাশয়ে পদ্ম ফুল ফুটেছে কয়েকটি। ফোয়ারায় জল ঝরছে ঝির ঝির ঝির। প্রজাপতি ফড়িং উড়ছে পতপত্ ফর ফর্। ছোট্ট পাখি উড়ছে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ। কিচির মিচির ডাকছে। মৌমাছি গাইছে গুন গুন্ গুন গুন্। অদূরে গাছপালার সবুজ আলোর আঁচলের ভেতর থেকে পাখিরা ডাকছে টি ট্রি টি ট্রি। টুঁই টুঁই। কটর্ কটর্। অসময়ে কোকিল-কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, কু-উ-উ কু-উ-উ। কাকের কর্কশ কলার শব্দ ঝরছে কা-আঁ-আঁ- কা-আঁ-আঁ।
নিচের দৃশ্য আরও রমণীয়। চারদিকে ঘেরা দূরের পাহাড়ি টিলা। যেন আয়েসী রমণীর চোখমুখের মতো ঝিমন্ত ঘুমন্ত।
সামনে বাঁধে ধরে রাখা জলাশয়। মাঝে ইতস্তত দাবার ঘুঁটির মতো লাল মাটি পাথরের টিপি অনেক। একাধিক গাছ দাঁড়িয়ে আছে নাঙা সাধুর মতো।
চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। অসচেতন গ্রাম্য রমণীর মতো প্রকৃতি। নির্দিষ্ট ঘরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে নীলাঞ্জন। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বর্ণালী বৈচিত্র্যে দৃষ্টি মেলে বিভোর। সানন্দা টয়লেট থেকে ফিরে এসে পাশের চেয়ারে বসল।
হালকা স্ন্যাকস সহ দু'কাপ চা নিয়ে খিদমদগার এলো।

সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারার তরুণটির সবল সুগঠিত পা হাত। গায়ের রং রোদপোড়া তামাটে। উদ্ধত চিবুক। চওড়া শক্ত চোয়াল। বেআব্রু বুকে একরাশ কালো চুল।
'নাম কি তোমার?'
চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নীলাঞ্জন জিগ্যেস করল।
'মংলু মাহাতো।'
'খানাউনা কা ক্যায়া বন্দোবস্ত্ হোগা?'
'য্যায়সা অর্ডার ত্যায়সা। কি খাবেন বলুন।'
'তুমি বাংলা জান দেখছি!'
ঠোঁটের কোণে হিসেবি হাসি খরচ করে মংলু নির্বাক হাসল।
'দুপুরে কি খাবে সানন্দা?'
'বলে দাও যা খুশি।'
সানন্দা নিস্পৃহ জবাব দিল।
'এবেলা তোমাদের পছন্দমতো খাওয়াও। ওবেলা দেখা যাবে।'
'ঠিক আছে। কুছ দিন থাকবেন নিশ্চয়?'
'এখনই বলতে পারছি না। য্যায়সা বিবিকা মর্জি।'
'ওকে ওভাবে বললে কেন? 'শূন্য কাপ ডিস নিয়ে মংলু ফিরে গেলে সানন্দা বিরক্তি প্রকাশ করল।
'তোমার মর্জিমতেইতো আমি এসেছি।'
'শুধু কি আমার মর্জিমতেই?'
নীলাঞ্জন রহস্যময় হাসল।
সানন্দা কোন জবাব খুঁজে পেল না। কেননা, আজকাল একা নীলাঞ্জনকে কোথায় বেড়াতে যেতে দিতে নানা আশঙ্কা হয়। মনে ধন্দ জাগে, কি জানি কোথায় কার আকর্ষণে হঠাৎ হঠাৎ বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে। সংসার সম্পর্কে ক্রমশ ঔদাসীন্য বাড়ছে সেকি অন্য কোন নারীর টানে?'
'তোমার কি এই জায়গাটা ভাল লাগছে না সানন্দা?'
নীলাঞ্জন গুমোট নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে নিরুত্তেজ প্রশ্ন করল।
'সুন্দর দৃশ্য পরিবেশ ভাল লাগলেও অলস সময় কাটাতে কষ্ট হবে। এখানে না আছে গতি না প্রাণ। প্রাণস্পন্দনহীন দেহকেতো মৃত বলা হয়।'
'এখানে যে প্রাণ আছে তা অনেক গভীরে। সূক্ষ্ম অনুভূতিশূন্য মনে শুধু ভেসে বেড়ালে সেই প্রাণের স্পর্শসুখ পাওয়া অসম্ভব।'
'গল্পের পটভূমিকা খুঁজতে ফালতু কল্পনার ফানুস ওড়াতে চাইছ তুমি। কিন্তু, জীবন নিশ্চয়ই নিছক গল্প নয়।'
'বাস্তবকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র অবাস্তব নিয়ে জীবন গড়তে চাও বলেই হিসেব মেলাতে পার না তুমি। তাই দুঃখ পাও।'
'আমাকে আমার মতো ভেসে বেড়িয়ে আনন্দে থাকতে দিতে তোমার আপত্তিতেই দুঃখ পাই সবচাইতে বেশি।'

সানন্দা শ্রাগ করে দাঁড়িয়ে চুল উড়িয়ে ভেতরে গেল। সঙ্গে আনা হুইস্কীর বোতল থেকে কিছুটা পান করল। টেপ রেকর্ডারে জ্যাকসনের ক্যাসেট বসাল। তারপর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে স্নানঘরে ঢুকল।

দরজা উন্মুক্ত স্নানঘরে এখন একজন নগ্ন সিক্তা নারী। শরীর মাথা জুড়ে বিলিতি সাবান শ্যাম্পুর সুবাস। উগ্র অর্কেস্ট্রা গানের ফাঁকে ভাসছে সাওয়ারের শব্দ। একজন সুস্থ শরীরের পুরুষকে উত্তেজিত করে কাছে টেনে নিতে এরকম নিশ্চিন্ত নির্বিরোধ সিকোয়েন্সই যথেষ্ট। তবু, নীলাঞ্জন নিরুত্তাপ নিস্পৃহ অনাসক্ত। শান্ত আত্মমগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে রমণীয় প্রকৃতি-রমণীর দিকে।

দূরে অরণ্যে শাদা কুয়াশার মতো স্বচ্ছ ওড়না মেলে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশে ধোঁয়ার কুন্ডলীর মতো একখন্ড মেঘ। সেই মেঘ ছায়ায় টিলাগুলি নীল দেখাচ্ছে। নদীর কিছু অংশের জল উজ্জ্বল সবুজ। দাবার ঘুঁটির মতো দ্বীপগুলিতে দাঁড়িয়ে থাকা ঢ্যাঙা গাছগুলি যেন বিষণ্ণ অভাগী যত।

একসময় কাজলধোঁয়া চোখের মতো আকাশ থেকে মেঘ গলে পড়ে। অরণ্যপাতায় অশ্বখুড়ের শব্দ তুলে বৃষ্টি এগিয়ে আসে। প্রথমে হরিণছাট্ পরে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি নামে। একটু পরে বৃষ্টি থামতেই ঝলমলে সোনা রোদ্দুরে অরণ্য নদী আকাশ হাসিখুশি।

সানন্দা এখন পিংক কালারের স্বচ্ছ নাইটি পরেছে। কোথাও কোন অন্তর্বাস নেই। পায়ে রুম ঝুম রুম ঝুম মল বাজছে। চোখ মুখে উছলে পড়া ঝিলিক ঝিলিক হাসি উচ্ছলতা।

'নীলাঞ্জন—'

যেন গভীর অরণ্যের গোপন নির্জনতা থেকে আমন্ত্রণ এল। বৃষ্টি ধোয়া অরণ্যের মতো সানন্দা এখন কি চাইছে? সঙ্গম তথা দেহমিলন?

নীলাঞ্জন বিব্রতবোধ করল।

বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে আছে সানন্দা। ভেজা এক ঢল এলায়িত চুল। বাঁ দিকের একফালি স্তন উঁকি দিচ্ছে। হাঁটু অব্দি বেআব্রু। পা দু'খানা গোটানো। ঢেউ খেলানো কোমর। আকর্ষণীয় ভারী পাছা। দূরের মালভূমি উপত্যকার মতো। ভোগ আড়ম্বর প্রেমী কামুক রমণী যেন প্রতীক্ষারতা।

'সানন্দা।'

নীলাঞ্জন চুলে হাত রেখে ডাকল।

'উঃ।'

'চল ঘুরে আসি।'

'কোথায়?'

'নদীর উপত্যকায় জলাশয়ের ধারে বাঁধের ওপর—যেখানে তুমি বলবে।'

'কেন যাব? তোমার কাব্য কাহিনী গড়ার প্রেরণা জোগাতে?'

ক্ষুব্ধ সর্পিণীর মতো সানন্দা ফোঁস করে ফণা তুলে হাঁটু ভেঙে বসল।

নীলাঞ্জন ওর আগুন চোখে চোখ রাখতে ভয় পেল। দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে যথেষ্ট সাহসী হয়ে উঠল।

'কি চাও তুমি?'

'আমি চাই সত্যিকার একজন পুরুষ মানুষকে।'

'তাইতো ছিলাম। তোমার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ ধরতে গিয়ে আমার সবকিছু পৌরুষ হারিয়ে বসে আছি। এখনতো আমাকে তোমার নাবালক সন্তানের মতো ট্রিটমেন্ট করতে ভালবাস তুমি।'

'সে শুধু তোমার মুখ চেয়ে ভালোর জন্য। সংসার গড়তে আর সমাজে চলতে গেলে যে সামান্য বুদ্ধিটুকু দরকার তা তোমার নেই বললেই চলে। আমার সাহায্য ছাড়া তুমি যে এক পা এগিয়ে যেতে অক্ষম তাকি অস্বীকার করতে পার ? অথচ আশ্চর্য ! এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই সেজন্য।'

'কিসের জন্য কৃতজ্ঞতা ? অভাবী পরিবার থেকে সংগ্রাম করে বেড়ে ওঠা লড়াকু মানুষটাকে ভেড়ুয়া বানিয়ে রাখার জন্য ?'

'শুধু কি সংগ্রাম করেই আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছ ? আমার বাপের বাড়ি থেকে দু'হাত ভরে কিছুই সাহায্য এনে দেইনি ?'

'অনাবশ্যক এনেছ। আমিতো খোলাখুলিই আগাম আমার সামর্থ সম্পর্কে জানিয়েছিলাম। সবদিক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগও দিয়েছিলাম। জেনে বুঝে তুমি গলায় মালা পরিয়েছিলে। অথচ আমার সামর্থমতে মানিয়ে চলতে পারলে না। ঈপ্সিত ভোগ বিলাসের জন্য বাপের বাড়িতে দিনের পর দিন নির্লজ্জ তোমার হাত পাতা আমার আত্মসম্মানে আঘাত করেছে। অনেক আপত্তি জানিয়েছি। তুমি এতটুকু আমল দাওনি।'

উত্তপ্ত বালিতে খই ফুটিয়ে উত্তেজিত নীলাঞ্জন দ্রুত স্নানঘরে ঢুকল। জবাব দেয়ার সুযোগ না-পেয়ে সানন্দা দাঁতে ঠোঁট কাটল। উগ্র ক্ষোভ উত্তেজনায় দু'হাতের টানে শখের নাইটিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

দু'দিন কেউ কিছুতেই স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারল না। তারপর অবশ্য মুক্ত প্রকৃতি শিশু কিশোর হয়ে যেতে অথবা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আত্মস্থ হয়ে যেতে নীলাঞ্জনের অসুবিধা হল না। সানন্দা ক্রমশ চার দেয়ালের মধ্যে নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কামবিলাসী রোমান্টিক রমণী মত্ত হাতির প্রত্যাশায় প্রত্যাখ্যাত হওয়ার গ্লানি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। প্রতিটি নারী পুরুষের ভেতর বোধহয় কিছু না কিছু অতৃপ্তি থেকে থাকে। 'কোথায় পাব তারে' হু হু উদাসী বাতাস হাহাকার করে। সানন্দার মতে, জীবনে সুখ পেতে হলে সিরিয়াস বা সেন্টিমেন্টাল হয়ে লাভ নেই। বরং কিছুটা বেসরম হওয়া দরকার হয়।

নীলাঞ্জন বয়সে বৃদ্ধ নয়। কেয়ার টেকার মিঃ চৌধুরীকেও কামুক পুরুষ বলা যায় না। তবু ওর সঙ্গে যে সানন্দার এতটা ভাব জমে উঠেছে তার পিছনে অন্য কারণ আছে। সানন্দা সেক্সি গ্লামারাস। ওর চপল দৃষ্টি চটুল কটাক্ষে একধরণের মদির নেশা থাকায় অল্প আলাপের পর যেকোন পুরুষ সহজেই কাছে এসে আপনজন হয়ে পড়ে। সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করে। মিঃ চৌধুরীও তেমনি একজন।

দিনটা হাটবার। কাছেই গ্রাম্য মেলা বসেছে। মিঃ চৌধুরী কিছু কেনাকাটা করতে মংলুকে নিয়ে বেরিয়ে নীলাঞ্জনের বাংলোর সামনে জীপ থামিয়ে দাঁড়ালেন।

'যাবেন নাকি মিঃ নন্দী ?'

'কোথায় ?'

'দেহাতি হাটমেলা দেখতে। মিসেসকেও সঙ্গে নিয়ে নিন।'

ঝটপট পোশাক পাল্টে সানন্দা প্রস্তুত। ফলসা রঙের সিনথেটিক শাড়ি পরেছে। শ্যাম্পু করা রেশমের মতো একঢাল চুল বাতাসে উড়ছে। হাতে সৌখিন পার্শ। চোখে বিলিতি রোদ-চশমা।

'আমি কিন্তু সামনের সীটে বসব চৌধুরীদা।'

সানন্দা আব্দারের ঢঙে বলল।

নীলাঞ্জন আগেই মিঃ চৌধুরীর পাশে বসে সানন্দার প্রতীক্ষায় ছিল। অগত্যা নেমে পিছনে গিয়ে মংলুর মুখোমুখি বসল।

নীলাঞ্জনের টিপিক্যাল বাঙালি পোশাক রুচি শরীর নিয়ে সানন্দার হাসি ঠাট্টা মস্করা গা-সহ্য হলেও আজকের এই আচরণ সহজভাবে নিতে পারল না। বিষণ্ণতায় কুঁকড়ে গেল।

বৃষস্কন্ধ ঋজু সুবাহু প্রশস্ত ললাটের পুরুষ সানন্দার মনপসন্দ্। গুণমুগ্ধ সুপুরুষ সম্পর্কে সে সদা সপ্রশংস। সারা রাস্তা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ক্রিকেট প্লেয়ার ফিল্ম আর্টিস্ট নিয়ে ওর বকবকানি নীলাঞ্জনের অসহ্য লাগল। মিঃ চৌধুরীরও সম্ভবত। তাই হু হা ইত্যাদি জবাবে নিজেকে সংযত রেখে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছিলেন।

দেহাতি হাটমেলা সানন্দার ভাল লাগল না। কিন্তু ফিরতি পথে তীর ধনুক টাঙি হাতে একদল আদিবাসীর সুস্বাস্থ্য যথেষ্ট আকৃষ্ট করল।

রাত্রে চাঁদ লণ্ঠনের আলোয় ঝিকমিক বনবনান্তরের অপার সৌন্দর্যে মুগ্ধ বিছানায় শায়িত নীলাঞ্জন। পাশে শুয়ে সানন্দা বিমর্ষ বিরক্ত। চাঁদের আলোয় বিছানা স্নাত। দূরে কোথাও রাতজাগা পাখি ডাকছে ঘন ঘন।

অধিক রাতে হিম হিম শীতে নীলাঞ্জনের ঘুম ভেঙে গেল। মৃদুনীল আলোয় অবাক দেখল, সানন্দা নেই। বাথরুমে আলো জ্বলছে না। সুমুখ বারান্দা শূন্য। পিছন দরজার অর্গল মুক্ত। নীলাঞ্জন ভয়ে সন্তর্পণে পায়ে পায়ে ফুলবাগিচা পেরিয়ে টিলার কিনারায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঢালের মসৃণ চাতালে বনশিরীষ আমলকি গাছের জড়াজড়ি ছায়া। বুনো গাছেদের পাতায় গাঢ় অন্ধকারের আড়ালে দু'টি মূর্তি। উত্তেজিত সানন্দার জানুর ধনুকে বিদ্ধ হয়ে আছে পাহাড়ের মতো বলিষ্ঠ মংলু। কণ্ঠলগ্না সানন্দা মংলুর রোমশ বুকে ঘন ঘন দংশনরতা।

বুনো ঘামের গন্ধ সানন্দার যে এত বেশি প্রিয় নীলাঞ্জনের তা জানা ছিল না। শহুরে পুংশ্চালী রমণীর কাছে এসব যেন কোন ব্যাপারই না। এ্যাক্সিডেন্টাল এপিসোড মাত্র। ক্ষণিকের রতিতৃপ্তি সুখ আনন্দ যেন শীতল পানীয়তে গলা ভেজানোর মতো। কিছুক্ষণ পরেই আবার যে কে সেই। তৃষ্ণায় নতুন আর একটা বোতল চাই-ই-চাই।

সানন্দার ভেতর ছেলেমানুষী ছোট্ট একটা গোপন ঘর আছে। সেই ঘরে যাকে ওর ভাললাগে তাকে চটজলদি ভালবেসে ফেলে। সেই হঠাৎ প্রিয়জনকে দু'হাত ভরে উজাড় করে দেয়ার মধ্যে দারুণ আনন্দ পেয়ে থাকে। একে কি বলা যায়—পাপী নাকি আপাপবিদ্ধা? নীলাঞ্জন ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারে না।

ঘটনাটা নীলাঞ্জনকে এমন প্রচণ্ডরকম আহত করল যে ভোর হতেই পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলল।

।। নয় ।।

নীলাঞ্জনের ফ্ল্যাটের ডবল চাবি। সানন্দা নিঃসঙ্গবোধ করলে পাতাল রেলে চড়ে হঠাৎ হঠাৎ বাপের বাড়ি যায়। বেহিসেবি সময় কাটিয়ে আসে। অনেক সময় ফিরতে বেশ রাত হয়।

তখন নীলাঞ্জন নিজেই রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে রাখে। দারুণ বোঝাপড়ায় অভ্যাসটা সহজ হয়ে গেছে।
সানন্দা আজও বাপের বাড়ি গেছে। রাত হতে নীলাঞ্জন কিছুতেই সহজ হতে পারল না। ট্যুরে গিয়ে স্বচক্ষে সানন্দার দেহদানের দৃশ্যটা দেখার পর থেকে মেজাজটা বিগড়ে আছে। তাই এতবছর পর হঠাৎই মনে ধন্দ লাগল, সানন্দা হামেশা এই যে দু'হাত ভরা টাকা আর উপহার সামগ্রী নিয়ে ফেরে সেগুলির উৎস সত্যিই কী বাপের বাড়ি?
সানন্দা ফিরতে নীলাঞ্জন চাপা অসন্তোষ প্রকাশ করল।
'এইতো সেদিন ট্যুর থেকে ফিরে গিয়েছিলে, ফের আজ? রোজ রোজ এত রাত করেই বা ফেরা কেন?'
'হঠাৎ আজ এরকম প্রশ্ন কেন?'
সানন্দা অবাক হল।
'এত রাত অব্দি কোথায় কি কর তা জানার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।'
'আমাকে একা ফেলে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে কোথায় কার সঙ্গে কাটাও জানি না। তখনও কি ভাব, আমি কোথায় কি করছি?'
নীলাঞ্জনের ওপর সানন্দার অভিভাবকত্ব শাসন নতুন কিছু না। ওর মেজাজে রুক্ষতা থাকলেও এরকম মুখুরাতো ছিল না! নীলাঞ্জন ভাবনায় পড়ল।
'তুমি খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছ সানন্দা।'
'সেজন্য তুমিই দায়ী। ঘরের বাইরে আজকাল তোমার যতকিছু আনন্দ সুখ। আমাকে তুমি ঘেন্না করতে শিখেছ। তোমার কাছে আমি এখন দুঃসহ।'
'ঘৃণা করলে ভালবাসা হারিয়ে যায়। এখন অব্দি তেমন কোন আচরণ দেখলে তুমি?'
'জানি না। ভালবাসার ভান করে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে কোনও অজুহাতে অন্যবৃত্তে চলে যাওয়ার মানুষ তুমি নও তা বুঝি। তবু দারুণ মানসিক যন্ত্রণা আর হতাশায় মাঝে মাঝে আত্মহননের ইচ্ছে হয় নীলাঞ্জন।'
'কেন তোমার এত যন্ত্রণা হতাশা?'
'তুমি তা জান নীলাঞ্জন। জেনে বুঝেও কেন পুরুষের মতো গর্জে উঠতে পার না! অনেক সময় মনে হয়, তুমি বোধহয় আমাকে করুণা কর।'
'অর্থাৎ, তোমার মনে অবিশ্বাসের ভ্রূণ প্রোথিত হয়েছে। শ্রদ্ধা করতে চেষ্টা কর। শ্রদ্ধাহীন ভালবাসা ভালবাসা নয়। ভালবাসাহীন সংসার কখনও শান্তির হয় না। প্লীজ, তুমি কখনও অবিশ্বাসী হয়ে উঠো না।'
'যদি বলি, তুমিও আর কোনদিন মুক্তির কাছে যেও না। তোমাকে ছেড়ে একা থাকতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়।'
'এবার থেকে তাহলে সর্বত্র সবসময় তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। এমনকি মুক্তির কাছেও।'
'মুক্তির কাছে আমি কোনদিনই যাব না। কথা দিতে হবে তুমিও যাবে না।'
নীলাঞ্জন কোনমতেই তেমন কোনও আশ্বাস প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না।

।। দশ ।।

নীল পাখিটা কচি দুর্বা ঘাসের বুকে শক্ত হয়ে পড়ে আছে। ঘাড় মটকানো। বুকের ওপরে আঘাতের ক্ষত গাঢ় কালচে। চারদিকে বৃত্তাকারে অনেকটা জায়গা নীলাভ। পুঁতির মতো

চোখের কোণে শুকনো জলচিহ্ন। রোজ সকালে পাখিটা সোনালি রোদ্দুরে নিরিবিলি আমলকি গাছের চিকণ ডালে এসে বসত। দোল খেত। ছোট ঠোঁট দিয়ে নরম পালক পরিষ্কার করত। এখন ভোরের সোনা ঝরা উজ্জ্বল রোদ্দুরেও নীল পাখিটার মৃতদেহ বিবর্ণ। পলকহীন নীলাঞ্জন নির্বাক বিষণ্ণ। বিস্তর ভাবনায় নিমগ্ন। নীল আকাশেতে কালো মেঘ থাকে। নীল ফুল শুকিয়ে ঝরে পড়ে। নীলাঞ্জন নামে নীল পাখিটা মরলে এখন কেমন দেখাবে?

আগেভাগে আজ দূর গাঁয়ে ছোটখাটো পিকনিকের সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল। হৈ হৈ করে সকলে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে আসতে নীলাঞ্জন স্বাভাবিক হয়ে উঠল। মন থেকে উৎসাহ না পেলেও সম্মিলিত যাত্রায় সামিল হল।

নির্বাচিত জায়গাটা দারুণ রমণীয়। মালভূমি টিলা আর ছোট ছোট পাহাড় ঘেরা উপত্যকা। বন জঙ্গল জলাশয় শাল পিয়াল মহুয়ায় ভরা প্রকৃতি। দেহাতি গ্রাম। খাপরার চালের ঘর। গোচারণ ভূমি শস্যক্ষেত আর ইঁদারা। সাকুল্যে তিন কাঠা জমির ওপর মাটির ঘর। বুধুয়ার জন্মভূমি।

এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে দেখিয়ে বুধুয়া অরিন্দমের মুখোমুখি দাঁড়াল।

'দেখলেন তো বাবু। এবার বিক্রির একটা বিহিত করে দিন।'

পিকনিকের সঙ্গে জমি দেখার উদ্দেশ্য ছিল অরিন্দমের। অরিন্দম সিদ্ধান্ত নিতে নীলাঞ্জনকে কাছে ডাকলেন।

'কেমন লাগছে এই জায়গাটা?'

নির্জন নিরালায় নির্বাসিত ভূমিটা নীলাঞ্জনের মনপছন্দ। একটিমাত্র শব্দে ভাললাগার উচ্ছ্বাস সীমাবদ্ধ রাখল।'

'দার্উন্।'

'জানতাম, আপনার পছন্দ হবে। আপনিই কিনে নিন।'

মুক্তি ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অরিন্দমের প্রস্তাব শুনে অবাক হল,

'পাগল নাকি! এখানে জমি কিনে ও কি করবে?'

প্রীতিন আলোচনায় যোগ দিলেন,

'লেখক মানুষের উপযুক্ত জায়গা বটে। মাটির ঘরে বসে কল্পনার জাল বুনবেন। কাহিনী লিখবেন।'

তণিমা নিজের অভিমত জানাতে দ্বিধা করলেন না,

'অনায়াসে এখানে আইডিয়াল আশ্রম বা হলিডে হোম করা যায়। যখনি হাঁপিয়ে উঠবেন কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে চলে আসবেন। বুক ভরে বাতাস নেবেন। এ্যালাউ করলে আমরাও আসব।'

মুক্তির মনে হল সকলেই যেন নীলাঞ্জনকে নিয়ে রসিকতা শুরু করেছে। তাই মনক্ষুণ্ণ হয়ে চিৎকার করে উঠল,

'এ্যাবসার্ড। যত্তসব আজগুবি কল্পনা।'

নীলাঞ্জন কোন মন্তব্য করল না। শুধুই হাসল।

দু'দিনের পর্যবেক্ষণেই নীলাঞ্জনের ধারণা জন্মেছে, তণিমা প্রকৃতির মাঝে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। সেইসঙ্গে মনের কোণে আশঙ্কা উঁকি দিতে শুরু করেছে, কিছু কিছু প্রকৃতি -পাগলের পাগলামি অনেক সময় অনভিপ্রেত বিকৃতিতে একাকার হয়ে যায়। তেমন কিছু অঘটন ঘটার সম্ভাবনা আছে?

।। এগার ।।

সেদিন সময় ছিল বাসন্তী বিকেল। সুর্যডোবা ফিকে আলোয় গঞ্জু মেয়েটি ঝাঁকা মাথায় হাট থেকে ফিরছে। তামাটে ওর গায়ের রং। কটা চুল। হরিণীর মতো চোখ। শায়া ব্লাউজবিহীন নিরাবরণ অনম্র বুকের ওপর দিয়ে আঁটসাঁট প্যাঁচানো কমলা রঙের উজ্জ্বল শাড়ির আঁচল। নিচু থেকে হাঁটু অব্দি বেআব্রু। খোপায় গোঁজা ফুলমালা কাঠের কাঁকই।

মেয়েটি মাথা হেলিয়ে গ্রীবা নাচিয়ে পাছায় ভাঁজ তুলে হেঁটে চলেছে। দুষ্টুমিষ্টি চোখ মুখে বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। হাড়িয়া মহুয়া কিছু একটার নেশায় আচ্ছন্ন সে। ওর চিকণ সুরের গুন্ গুন্ গানের কলি ভাসছে বাতাসে।

নীলাঞ্জনের প্রথম মনে হল, সম্ভবত পাহাড়ের দিকে থেকে ভেসে আসা মাদলের শব্দ মেয়েটিকে টানছে। পরক্ষণেই নিজের ভ্রান্ত ধারণা টের পেল। মেয়েটি এতক্ষণ যে পুরুষটিকে বন থেকে থেকে বনান্তরে নিয়ে যাচ্ছিল তিনি হলেন প্রীতিন। যাঁকে তণিমা অপদার্থ ভেড়ুয়া মনে করে থাকে সেই ব্যক্তির এতবড় দুঃসাহস!

অবাক নীলাঞ্জন কৌতূহলে গাছপাতার আড়াল থেকে প্রীতিনকে অনুসরণ করল।

শুকনো পাতায় মচ মচ শব্দ শুনে একসময় প্রীতিন অপরাধবোধে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে নীলাঞ্জন ধরা পড়ে গেল। প্রীতিন বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। ঠোঁটে তর্জনী তুলে ইশারায় নীলাঞ্জনকে সাবধান হয়ে দূরে ঝর্ণার পাশে নীল জলাশয়ের ধারে দু'টি নরনারীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

সূর্য কি ভয় পেল? নাকি আসন্ন মিলনানন্দের জন্য মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করল? ফার্ণ শ্যাওলা লতাপাতায় ভরা জলাশয়ে ছোট ছোট মাছ অথবা পোকা। একধারে পিটিসের ঝোপ অন্যদিকে বিরাট পাথরের আব্রু। মাঝে সাদা মসৃণ বালির ওপর একজোড়া নগ্ন নারীপুরুষ। পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সন্দর্শন করে বিমুগ্ধ অভিভূত।

একটি গাছের ফুল ফল ডালপালা পাতা দেহ নিয়ে ক্রিড়ারত অপর একটি গাছ। অপেক্ষাকৃত কোমল গাছটি নরম সবুজ ঘাস আর মসৃণ বালিতে শুয়ে বিশ্বের ভার নিতে সক্ষম-প্রস্তুত। গাছ পাতা পাথর ঝোপের আড়ালে গঞ্জু মেয়েটি হারিয়ে গেল।

মৃত্তিকার ছট্‌ফটানি হাত পা ছোড়া দর্শনীয়। সূর্যের রূপোলী ইলিশ পুঁটির মতো ঝলমল ঝিলিক দেয়া হাসির সৌন্দর্য রমণীয়। মৃত্তিকা অরিন্দম জুটি প্রথমে হাসাহাসি দাপাদাপি করে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। সমুদ্রগামী সঙ্গম প্রত্যক্ষদর্শী প্রীতিন নীলাঞ্জন বিস্ময়ে নিষ্পলক হতবাক স্পন্দনহীন।

প্রাকৃতিক • প্রভাস ভদ্র

সুবর্ণরেখা

জন্ম ১৯৪৩-এ, অধুনা বাংলা দেশের ফরিদপুরে।
কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশে।
তারপর কিছুদিন উত্তরবঙ্গের চা বাগানে।
পরবর্তী সময় থেকে কলকাতার উপকণ্ঠে বসবাস।
শিক্ষাদীক্ষা এপার বাংলায়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ।
কলেজ ইউনিভার্সিটিতে
ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে
নির্বাচিত প্রতিনিধি।
১৯৬২-তে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ পত্রিকার সম্পাদক।
বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আজকাল পরশু'
দেয়াল পত্রিকা অঙ্কন লিখন সম্পাদনা।
'প্রত্যয়' লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ সম্পাদনা।
বহু পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থের প্রচ্ছদ শিল্পী।
প্রতিমা গড়তেন একসময়।
প্রিয় নেশা ভ্রমণ।
বিশেষ পছন্দ : নির্জন নদীতীর,
গ্রাম্য প্রকৃতি পরিবেশ,
সুগন্ধী ধূপ, নতুন নতুন কলম।
ভালোবাসেন, গান
আর ছাদবাগান নিয়ে সময় কাটাতে।
দারুণ অপছন্দ, হৃদয়হীনতা।

ছোটগল্পের জগতে পরিচিত নাম প্রভাস ভদ্র।
লেখাটা তাঁর কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো জরুরি।
কবিতা নিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু হলেও
আসল জীবনযাপন
গল্পের গার্হস্থ্যে।
তাঁর লেখায় গদ্য ও কবিতার সার্থক সহবাস ঈর্ষণীয়।
প্রিয় নেশা, ভ্রমণ।
বেড়াতে ভালোবাসেন,
গ্রাম অরণ্য
নদ-নদী-সমুদ্র
পর্বত প্রকৃতিময়—সর্বত্র।
দৃষ্টিতে, প্রকৃতি অনেক সময়
হয়ে ওঠে রমণীর চাইতেও রমণীয়।
বক্তব্যধর্মী গল্প লিখতে
অধিক অভ্যস্ত লেখকের কলমে
তখন মানুষের পাশাপাশি
প্রকৃতি সচেতনতা;
মানুষ ও প্রকৃতি একাকার হয়ে যাওয়া।
কী ব্যক্তিজীবনে, কী সাহিত্য কর্মে
প্রকৃতিই তখন হয়ে উঠেছে
বক্তব্যের মূল চরিত্র।
রুক্ষ জীবনের বুকে
তিনি খুঁজে নিয়েছেন
রোমান্টিকতার ঝরণা।
প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত
এমনই ব্যতিক্রমী বর্ণালি চিত্রময়
সাতটি গল্পের সংকলন,
—'প্রাকৃতিক'।

প্রাকৃতিক ● প্রভাস ভদ্র
সুবর্ণরেখা